সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা

ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৩ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ৫০

প্রথম প্রকাশ—জুন ১৯৭৯
৭ম সংস্করণ

রজব	১৪১৯
কার্তিক	১৪০৫
অক্টোবর	১৯৯৮

বিনিময় ঃ ১১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول ومبادی-এর বঙ্গানুবাদ

ISLAMI SONSCRITIR MARMO KATHA by Sayyed Abul A'la Maududi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 110.00 Only.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামী সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মত। এতে আল্লাহর মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিছক একজন উপাস্যের মতো নয়। বরং দুনিয়াবী মত অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। .... রসূল তাঁর প্রতিনিধি। কুরআন তাঁর আইন গ্রন্থ। ... .

এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করা ...। এ হচ্ছে একটি ব্যাপক জীবন ব্যবস্থা যা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপরই পরিব্যাপ্ত।... ....

এ সংস্কৃতি কোন জাতীয়, বংশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি ... ... এ সংস্কৃতির এক বিশ্বব্যাপী উদার জাতীয়তা গঠন করে —যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মত অনন্য যোগ্যতা। ... ... সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সঙ্গে এ সংস্কৃতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এ

সংস্কৃতি নিজের অনুবর্তীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে। ... ...

পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে এবং এক সৎ ও পবিত্র জনসমাজ (Socity) গড়ে তুলতে চায়। ... ... চায় সে সমাজের লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন সত্যপ্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা, উদার-দৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, উচ্চাভিলাস, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, বির্যবত্তা, আত্মতৃপ্তি, নেতৃআনুগত্য, আই-নানুবর্তিতা ইত্যাকার উৎকৃষ্ট গুণরাজির সৃষ্টি করতে। ... ...

এ সংস্কৃতির প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় উৎকৃষ্ট গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচণ্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে। ... ...

সূচীপত্র

মুখবন্ধ ১৩

এক

পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ১৭

মানুষের মূল পরিচয় ১৭
বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষের মর্যাদা ২২
মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি ২৪
প্রতিনিধি পদের গুরুত্ব ২৭
জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ৩০
মানুষ প্রতিনিধি—মালিক নয় ৩১
দুনিয়ার জীবনে সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত ৩৩
দুনিয়া ভোগ-ব্যবহারের জন্যেই ৩৪
দুনিয়াবী জীবনের রহস্য ৩৬
কতৃকর্মের দায়িত্ব ও জবাবদিহি ৩৯
ব্যক্তিগত দায়িত্ব ৪১
জীবনের স্বাভাবিক ধারণা ৪৪
বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের ধারণা ৪৬
ইসলামী ধারণার বৈশিষ্ট্য ৪৯

দুই

জীবনের লক্ষ্য ৫৪

নির্ভুল সামগ্রিক লক্ষ্যের জন্যে আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য ৫৪
মানুষের স্বাভাবিক জীবন লক্ষ্য ৫৫
দু'টি জনপ্রিয় সামগ্রিক লক্ষ্য এবং তার পর্যালোচনা ৫৬
ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও তার বৈশিষ্ট্য ৫৯
পন্থা নিরূপণে লক্ষ্য নির্ধারণের প্রভাব ৭৫
ইসলামী সংস্কৃতির গঠন বিন্যাসে তার মূল লক্ষ্যের ভূমিকা ৭৮

তিন

মৌলিক আকীদা ও চিন্তাধারা ৮২

১.ঈমানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ৮২

চরিত্র ও তার মানসিক ভিত্তি ৮২

কর্ম-শৃংখলার প্রথম শর্ত ৮২

ঈমানের অর্থ ৮৩

সংস্কৃতির ভিত রচনায় ঈমানের স্থান ৮৩

ঈমান দু' প্রকার ৮৪

ধর্মীয় ঈমান ৮৪

পার্থিব ঈমান ৮৭

কতিপয় সাধারণ মূলনীতি ৮৮

২. ইসলামে ঈমানের বিষয় ৯১

যুক্তিবাদী সমালোচনা ৯৬

ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব ১০১

আমলের উপর ঈমানের অগ্রাধিকার ১০৫

সার সংক্ষেপ ১০৭

একটি প্রশ্ন ১০৮

প্রশ্নের সত্যাসত্য নির্ণয় ১০৯

৩. আল্লাহর প্রতি ঈমান ১১৪

আল্লাহর প্রতি ঈমানের গুরুত্ব ১১৪

আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিস্তৃত ধারণা ১১৪

আল্লাহর প্রতি ঈমানের নৈতিক উপকার ১১৭

দৃষ্টির প্রশস্ততা ১১৭

আত্মসম্ভ্রম ১১৮

বিনয় ও নম্রতা ১১৯

অলীক প্রত্যাশার বিলুপ্তি ১২০

আশাবাদ ও মানসিক শান্তি ১২১

ধৈর্য-স্থৈর্য ও নির্ভরতা ১২২

বীরত্ব ১২৪

অল্পে তুষ্টি ও আত্মতৃপ্তি ১২৫

নৈতিকতার সংশোধন ও কর্মের শৃংখলা ১২৬

চার

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান **১৩০**
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের উদ্দেশ্য ১৩০
ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ১৩৩
তৃতীয় উদ্দেশ্য ১৩৫

পাঁচ

রসূলের প্রতি ঈমান **১৩৬**
নবুওয়াতের তাৎপর্য ১৩৬
নবী এবং সাধারণ নেতাদের মধ্যে পার্থক্য ১৩৭
আল্লাহর প্রতি ঈমান ও নবীর প্রতি ঈমানের সম্পর্ক ১৩৯
কালেমার ঐক্য ১৪১
নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ ১৪৩
নবুওয়াত বিশ্বাসের গুরুত্ব ১৪৫
নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর বিশিষ্ট প্রকৃতি ১৪৮
পূর্ববর্তী নবুওয়াত ও নবুওয়াতে মুহাম্মদীর পার্থক্য ১৪৯
সাধারণ দাওয়াত ১৫৪
দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতা ১৫৫
পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহের রহিতকরণ ১৫৬
খতমে নবুওয়াত ১৫৯
নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর প্রতি বিশ্বাসের আবশ্যিক উপাদান ১৫৯

ছয়

কিতাবের প্রতি ঈমান **১৬২**
নবুওয়াত ও কিতাবের সম্পর্ক ১৬৩
আলোকবর্তিকা ও পথপ্রদর্শকের কুরআনী দৃষ্টান্ত ১৬৪
সকল আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান ১৬৭
নিছক কুরআনের অনুসরণ ১৬৯
কুরআন সংক্রান্ত বিস্তৃত প্রত্যয় ১৭২
ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি প্রস্তর ১৭৬

সাত

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান **১৭৭**

কতিপয় স্বাভাবিক প্রশ্ন ১৭৭
পরকালীন জীবনের অস্বীকৃতি ১৭৯
চরিত্রের ওপর পরকাল-অবিশ্বাসের প্রভাব ১৮১
জন্মান্তরবাদ ১৮৩
বুদ্ধি-বৃত্তিক সমালোচনা ১৮৪
সমাজ ও তমদ্দুনের ওপর জন্মান্তরবাদের প্রভাব ১৮৫
পারলৌকিক জীবনের বিশ্বাস ১৮৭
বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের নির্ভুল পন্থা ১৮৮
পরকালীন জীবন সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন ১৯১
কুরআন মজীদের যুক্তিধারা ১৯১
পরকালীন জীবনের সম্ভাবনা ১৯২
বিশ্বব্যবস্থা একটা বিচক্ষণ ব্যবস্থা ১৯৯
বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যহীন ও নিরর্থক হতে পারে না ২০২
প্রজ্ঞার দাবীতে বিশ্বব্যবস্থার কি পরিণতি হওয়া উচিত ২০৪
বিশ্বব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ২০৬
পরকালীন জীবনের ব্যবস্থাপনা কি হবে ? ২০৭
পরকাল বিশ্বাসের আবশ্যকতা ২১৩
দুনিয়ার ওপর পরকালের অগ্রাধিকার ২২১
আমলনামা ও আল্লাহর আদালত ২২৫
পরকাল বিশ্বাসের উপকার ২২৯

আট

ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব ২৩১
ঈমানী বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পর্যালোচনা ২৩১
ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো ২৩৩
ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব ২৩৬
মুনাফেকীর ভয় ২৩৮

নয়

পারলৌকিক জীবন ২৪২

মুখবন্ধ

পাশ্চাত্য লেখকগণ এবং তাঁদের প্রভাবাধীন প্রাচ্য পণ্ডিতদেরও একটি বিরাট দল এই ধারণা পোষণ করে থাকে যে, ইসলামী সংস্কৃতি তার পূর্ববর্তী সংস্কৃতি-সমূহ, বিশেষত গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত এবং যেহেতু আরবীয় মানস এই পুরনো উপাদানগুলোকে এক নতুন ভংগিতে বিন্যস্ত করে এর বহিরাকৃতিকে বদলে দিয়েছে, এ জন্যই এ এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করেছে। এহেন দৃষ্টিভংগির কারণেই এই শ্রেণীর লোকেরা পারসিক, বেবিলনীয়, সারমেনীয়, ফিরিসীয়, মিশরীয় এবং গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির ভেতর ইসলামী সংস্কৃতির উপাদান তালাশ করে থাকে। অতপর যে মানসিকতা এই সংস্কৃতি-গুলো থেকে আপন সুবিধা মত মাল-মশলা নিয়ে তাকে নিজস্ব ভংগিতে বিন্যস্ত করে নিয়েছে, আরবীয় প্রকৃতিতে সেই মানসিকতার উপাদান খুঁজে বেড়ায়।

ভুল ধারণা

কিন্তু এ এক মারাত্মক রকমের ভুল ধারণা। কারণ, একথা যদিও সত্য যে, মানুষের বর্তমানকাল চিরদিনই অতীতকাল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে এবং সেহেতু প্রত্যেক নব রূপায়ণেই পূর্ববর্তী গঠন উপাদান থেকে সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, ইসলামী সংস্কৃতি আপন প্রাণসত্তা ও মৌলিক উপাদানের দিক থেকেই সম্পূর্ণরূপেই ইসলামী এবং এর ওপর কোন অনৈসলামী সংস্কৃতির অণুমাত্রও প্রভাব নেই। অবশ্য এর বাইরের খুঁটিনাটি বিষয়ে আরবীয় মনন, আরবীয় ঐতিহ্য এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংস্কৃতিগুলোর কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই পড়েছে। ইমারতের একটা দিক হচ্ছে তার নক্সা, তার নির্মাণ কৌশল, উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য মোতাবেক তার গড়ে ওঠা ; এটিই হচ্ছে তার আসল ও মূল জিনিস। আর একটি দিক হচ্ছে তার বর্ণ, বৈচিত্র, তার কারুকার্য এবং তার শোভা-সৌন্দর্য, এটি হচ্ছে তার খুঁটিনাটি ও ছোট-খাট ব্যাপার। সুতরাং আসল ও মূল জিনিসের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি সৌধ সম্পূর্ণত ইসলামেরই গঠন ক্রিয়ার ফল। তার নক্সা তার নিজস্ব—অন্য কোন নক্সা থেকে এ ব্যাপারে সাহায্য নেয়া হয়নি। তার নির্মাণ কৌশল তার নিজেরই উদ্ভাবিত, এ ক্ষেত্রে অপর কোন নমুনার অনুকরণ করা হয়নি। তার নির্মাণ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব ; এ উদ্দেশ্যে আর কোন ইমারত না এর আগে নির্মিত হয়েছে, না পরে।

অনুরূপভাবেই এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে যে ধরনের গঠন কার্যের প্রয়োজন ছিল, ইসলামী সংস্কৃতি ঠিক সেইরূপেই রূপায়িত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে

সে যা কিছু নির্মাণ করেছে, তাতে বাইরের কোন প্রকৌশলী না কোন সংস্কার-সংশোধনের ক্ষমতা রাখে, আর না রাখে, কোন সংযোজনের। বাকী থাকে খুঁটিনাটি ও ছোটখাট বিষয়গুলো ; এ ব্যাপারেও ইসলাম অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে খুব কম জিনিসই গ্রহণ করেছে। এমন কি বলা যেতে পারে যে, এরও বেশীর ভাগ ইসলামেরই নিজস্ব জিনিস। অবশ্য মুসলমানরা অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে বর্ণ, বৈচিত্র, কারুকার্য এবং শোভা সৌন্দর্যের উপকরণ নিয়ে এ দিককার সমৃদ্ধি কিছুটা বাড়িয়েছে। আর এটাই দর্শকদের চোখে এতখানি প্রকট হয়ে ওঠেছে যে, গোটা ইমারতের ওপরই তারা অনুকরণের অপবাদ চাপিয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা

এ বিষয়ের মীমাংসা করতে হলে সবার আগেই প্রশ্নের জবাব পেতে হবে যে, সংস্কৃতি কাকে বলে ? লোকেরা মনে করে যে, সংস্কৃতি বলতে বুঝায় কোন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শন, শিল্প-কারিগরী, ললিতকলা, সামাজিক রীতি, জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এগুলো সংস্কৃতির আসল প্রাণবস্তু নয়, তার ফলাফল ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সংস্কৃতি বৃক্ষের মূল ও কাণ্ড নয়, তার শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব মাত্র। এসব বাহ্যিক লক্ষণ ও খোলসের ভিত্তিতে কোন সংস্কৃতির মূল্যমান নির্ধারিত করা যায় না। তাই এগুলো বাদ দিয়ে আমাদেরকে সংস্কৃতির প্রাণবস্তু অবধি পৌঁছা দরকার, তার মূল ভিত্তি ও মৌলিক উপাদানগুলো তালাশ করা প্রয়োজন।

সংস্কৃতির মৌলিক উপাদান

এই দৃষ্টিতে কোন সংস্কৃতির ভেতর সর্বপ্রথম যে জিনিসটি তালাশ করা দরকার তা হচ্ছে এই যে, দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে তার ধারণা কি ? এই দুনিয়ায় সে মানুষকে কি মর্যাদা প্রদান করে ? তার দৃষ্টিতে দুনিয়া বস্তুটা কি ? এ দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক কি ? মানুষ এ দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করবে কিভাবে ? বস্তুত জীবন-দর্শন সম্পর্কিত এই প্রশ্নগুলো এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে, মানব জীবনের তামাম ক্রিয়া-কাণ্ডের ওপরেই এগুলো গভীরভাবে প্রভাবশীল হয়ে থাকে। এই দর্শন বদলে গেলে সংস্কৃতির গোটা স্বরূপ মূলগতভাবেই বদলে যায়।

জীবন দর্শনের সাথে দ্বিতীয় যে প্রশ্ন গভীরভাবে সম্পৃক্ত, তা হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। দুনিয়ায় মানব জীবনের উদ্দেশ্য কি ? মানুষের এতো ব্যবস্তা, এতো প্রয়াস-প্রচেষ্টা, এতো শ্রম-মেহনত, এতো দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম কিসের জন্যে ? কোন্ অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে মানুষের ছুটে চলা উচিত ? কোন্ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার

জন্যে আদম সন্তানের চেষ্টা-সাধনা করা কর্তব্য ? কোন্ পরিণতির কথা মানুষের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি প্রয়াস-প্রচেষ্টায় স্মরণ রাখা উচিত ? বস্তুত এই লক্ষ্য ও আকাংখার প্রশ্নই মানুষের বাস্তব জীবনের গতিধারাকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে আর তার অনুরূপ কর্মপদ্ধতি ও কামিয়াবীর পন্থা জীবনে অবলম্বিত হয়ে থাকে।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, আলোচ্য সংস্কৃতিতে কোন্ বুনিয়াদী আকীদা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে মানবীয় চরিত্র গঠন করা হয় ? মানুষের মন-মানসকে তা কোন্ ছাঁচে ঢালাই করে ? মানুষের মন ও মস্তিষ্কে কি ধরনের চিন্তা সৃষ্টি করে? এবং তার ভেতরে এমন কি কার্যকর শক্তি রয়েছে, যা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে এক বিশেষ ধরনের বাস্তব জীবনধারার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে ? এ ব্যাপারে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই যে, মানুষের কর্মশক্তি তার চিন্তা শক্তিরই প্রভাবাধীন। যে চেতনা তার হাত ও পা-কে ক্রিয়াশীল করে তোলে, তা আসে তার মন ও মস্তিষ্ক থেকে। আর যে আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, তার মন ও মস্তিষ্কের ওপর চেপে বসবে, তার গোটা কর্ম শক্তি ঠিক তারই প্রভাবাধীনে সক্রিয় হয়ে ওঠবে। অন্য কথায় তার মন-মানস যে ছাঁচে গড়ে ওঠবে, তার ভেতর আবেগ-অনুভূতি ও ইচ্ছা স্পৃহাও ঠিক তেমনি পয়দা হবে এবং তারই আজ্ঞাধীনে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কাজ করতে থাকবে। বস্তুত দুনিয়ার কোন সংস্কৃতিই একটি মৌলিক আকীদা এবং একটি বুনিয়াদী চিন্তাধারা ছাড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। এ হিসেবে যে কোন সংস্কৃতিকে বুঝতে এবং তাঁর মূল্যায়ণ করতে হলে প্রথমত তার আকীদা ও চিন্তাধারাকে বোঝা এবং তার উৎকর্ষ-অপকর্ষ পরিমাপ করা প্রয়োজন—যেমন কোন ইমারতের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের কথা জানতে হলে তার ভিত্তির গভীরতা ও দৃঢ়তার কথা জানা আবশ্যক।

চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, আলোচ্য সংস্কৃতি মানুষকে একজন মানুষ হিসেবে কি ধরনের মানুষ রূপে গড়ে তোলে ? অর্থাৎ কি ধরনের নৈতিক ট্রেনিং-এর সাহায্যে সে মানুষকে তার নিজস্ব আদর্শ মোতাবেক স্বার্থক জীবন যাপনের জন্যে তৈরি করে ? কোন্ ধরনের স্বভাব-প্রকৃতি, গুণরাজি ও মন-মানস সে মানুষের মধ্যে পয়দা করে এবং তার বিকাশ বৃদ্ধির চেষ্টা করে ? তার বিশেষ নৈতিক তালিম-এর সাহায্যে মানুষ কি ধরনের মানুষে পরিণত হয় ? সংস্কৃতির আসল উদ্দেশ্য যদিও সমাজ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, কিন্তু ব্যক্তির উপাদান দিয়েই সে সমাজ সৌধ নির্মিত হয়। আর সে সৌধটির দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে তার প্রতিটি পাথরের সঠিকরূপে কাটা, প্রতিটি ইটের পাকা-পোক্ত হওয়া, প্রতিটি কড়ি কাঠের মজবুত হওয়া, কোথাও ঘুণে ধরা কাঠ না লাগানো এবং কোথাও অপক্ক নিকৃষ্ট ও দুর্বল উপকরণ ব্যবহার না করার ওপর।

পঞ্চম প্রশ্ন এই যে, সে সংস্কৃতিতে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষে মানুষে কিভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা হয় ? তার আপন খান্দানের সঙ্গে, তার পাড়া-পড়শীর সঙ্গে, তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, তার সাথে বসবাসকারী লোকদের সঙ্গে, তার অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে, তার উপরস্থ লোকদের সঙ্গে, তার নিজ সংস্কৃতির অনুসারীদের সঙ্গে এবং তার সংস্কৃতি বহির্ভূত লোকদের সঙ্গে কি ধরনের সম্পর্ক রাখা হয়েছে ? অন্যান্য লোকদের ওপর তার কি অধিকার এবং তার ওপর অন্যান্য লোকদের কি অধিকার নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে ? তাকে কোন কোন সীমারেখার অধীন করে দেয়া হয়েছে ? তাকে আযাদী দেয়া হলে কতখানি আযাদী দেয়া হয়েছে আর বন্দী করা হলে কতদূর বন্দী করা হয়েছে ? বস্তুত এ প্রশ্নগুলোর ভেতর নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, আইন-কানুন, রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সকল বিষয়ই এসে যায়। আর আলোচ্য সংস্কৃতি কি ধরনের খান্দান, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করে, তা এ থেকেই জানা যেতে পারে।

এ আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, যে বস্তুটিকে সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়, তা গঠিত হয় পাঁচটি মৌলিক উপাদান দ্বারা ঃ যথা (১) দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে ধারণা, (২) জীবনের চরম লক্ষ্য, (৩) বুনিয়াদী আকীদা ও চিন্তাধারা, (৪) ব্যক্তি প্রশিক্ষণ এবং (৫) সমাজ ব্যবস্থা।

দুনিয়ার প্রত্যেক সংস্কৃতি এই পাঁচটি মৌলিক উপাদান দিয়েই গঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, ইসলামী সংস্কৃতিরও সৃষ্টি হয়েছে এই উপাদানগুলোর সাহায্যেই। বর্তমান গ্রন্থে আমি ইসলামী সংস্কৃতির তিনটি উপাদান পর্যালোচনা করে বলেছি যে, এই সংস্কৃতি জীবন সম্পর্কে কোন্ বিশিষ্ট ধারণা, কোন্ বিশেষ জীবন লক্ষ্য এবং কোন্ মৌলিক প্রত্যয় ও চিন্তাধারার ওপর কায়েম করা হয়েছে এবং এগুলো কিভাবে তাকে দুনিয়ার অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র এক বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির রূপ দিয়েছে। অবশিষ্ট দু'টি উপাদান সম্পর্কে এ গ্রন্থে কোন আলোচনা করা হয়নি। এর ভেতর ব্যক্তি সংগঠন সম্পর্কে আমার লিখিত 'ইসলামী ইবাদত পর এক তাহ্কীকী নযর' এবং 'খোতবাত'[১] (২০ থেকে ২৮ নম্বর খোতবা) নামক পুস্তক দু' খানি উপকারী হবে। বাকী 'সমাজ ব্যবস্থা' সম্পর্কে 'ইসলামকা নেজামে হায়াত' (ইসলামের জীবন পদ্ধতি) নামে প্রকাশিত আমার বেতার বক্তৃতাগুলোয় একটা মোটামুটি চিত্র পাওয়া যাবে।

---

১. এটি লেখকের নয়টি বক্তৃতার সমষ্টি। এটা বিভিন্ন পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। যথা ঃ ইসলামের হাকীকত, ঈমানের হাকীকত, জিহাদের হাকীকত, হজ্জের হাকীকত, যাকাতের হাকীকত ও নামায রোযার হাকীকত।

॥ এক ॥

পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

মানুষ নিজের সম্পর্কে গোড়া থেকেই একটা প্রকাণ্ড রকমের ভুল ধারণা পোষণ করে আসছে এবং আজ পর্যন্তও তার সে ভুল ধারণা বর্তমান রয়েছে। কখনো তাকে বাড়াবাড়ির পথ অবলম্বন করে এবং নিজেকে সে দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত সত্তা বলে মনে করে নেয়। তার মন-মস্তিষ্কে স্পর্ধা, অহংকার ও বিদ্রোহের ভাবধারা পূর্ণ হয়ে যায়। কোন শক্তিকে তার ওপরে তো দূরের কথা, নিজের সমকক্ষ ভাবতেও সে প্রস্তুত হয় না। বরং مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (আমার চেয়েও শক্তিশালী আর কে ?) এবং اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى (আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু)-এর ধ্বনি সে উচ্চারণ করে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন ভেবে জোর-যুলুমের দেবতা এবং অন্যায়-অবিচার ও ধ্বংস-বিপর্যয়ের সাক্ষাৎ মূর্তিরূপে দেখা দেয়। আবার কখনো সে কড়াকড়ির রোগে আক্রান্ত হয় এবং নিজেকে নিজে দুনিয়ার সবচেয়ে নীচ সত্তা বলে ধারণা করে বসে। গাছ, পাথর, দরিয়া, পাহাড়, জানোয়ার, হাওয়া, আগুন, মেঘ, বিজলী, চন্দ্র, সূর্য, তারকা মোটকথা এমন প্রতিটি জিনিসের সামনেই সে মাথা নত করে দেয়, যার ভেতর কোন প্রকার শক্তি কিংবা উপকার-অপকার দেখতে পায়। এমন কি, তার নিজেরই মতো মানুষের মধ্যেও যদি সে কোন শক্তি দেখতে পায়, তাকেও সে দেবতা এবং মাবুদ বলে মানতে এতটুকুও দ্বিধা করে না।

মানুষের মূল পরিচয়

ইসলাম এ দু' চরম ধারণাকে বাতিল করে দিয়ে মানুষের সামনে তার প্রকৃত পরিচয় পেশ করেছে। সে বলে ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝ (الطارق : ٥-٧)

"আপন তত্ত্বের প্রতি মানুষের লক্ষ্য করা উচিত যে, সে কোন্ জিনিস থেকে পয়দা হয়েছে ? সে পয়দা হয়েছে স্ববেগে নির্গত এক পানি থেকে যা পিঠ ও বক্ষ অস্থির মাঝখান থেকে বেরিয়ে আসে।"-(সূরা আত তারিক ঃ ৫-৭)

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ ط (يس : ٧٧-٧٨)

"মানুষ কি লক্ষ্য করে না যে, আমরা তাকে একবিন্দু পানি থেকে সৃষ্টি করেছি ? এখন সে খোলাখুলি দুশমনে পরিণত হয় এবং আমাদের জন্যে দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকে আর নিজের আসলকে ভুলে গেছে।"

وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۝ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ ۝ (السجدة : ٧-٩)

"মানুষের সৃষ্টির সূচনা করেছেন মাটি থেকে ; অতপর মাটির নির্যাস থেকে যা এক অপবিত্র পানি—তার বংশ ধারা চালিয়েছেন। তৎপর তার গঠন কার্য ঠিক করেছেন এবং তার ভেতরে আপন রূহ ফুঁকে দিয়েছেন।"

–(সূরা আস সাজদা ঃ ৭-৯)

فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ

"আমরা তোমাদেরকে মাটি থেকে, তারপর পানি বিন্দু থেকে, অতপর জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে, তৎপর পূর্ণ বা অপূর্ণ মাংসপিণ্ড থেকে পয়দা করেছি, যেন তোমাদেরকে আপন কুদরত দেখাতে পারি এবং আমরা যে শুক্র-বিন্দুকে ইচ্ছা করি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাতৃগর্ভে রেখে দেই, অনন্তর তোমাদেরকে বাচ্চা বানিয়ে বের করি ; অতপর তোমাদেরকে বাড়িয়ে যৌবন পর্যন্ত পৌছিয়ে দেই ; তোমাদের ভেতর থেকে কেউ মৃত্যুবরণ করে, আর কেউ এমন নিকৃষ্টতম বয়স পর্যন্ত গিয়ে পৌছে যে, বোধশক্তি লাভ করার পর আবার অবুঝ হয়ে যায়।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫)

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۝ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِىْٓ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝ (الانفطار : ٦-٨)

"হে মানুষ ! তোমার সেই দয়ালু রব সম্পর্কে কি জিনিস তোমাকে প্রতারিত করেছে ?—যিনি তোমাকে পয়দা করেছেন তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-গুলো ঠিক করেছেন, তোমার শক্তি ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করেছেন এবং যে আকৃতিতে ইচ্ছা করেছেন তোমার উপাদানসমূহ সংযোজিত করেছেন।"–(সূরা ইনফিতার ঃ ৬-৮)

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ (النحل : ٧٨)

"এবং আল্লাহই তোমাদেরকে তোমাদের মায়েদের পেট থেকে বের করেছেন ; যখন তোমরা বের হলে, তখন এমন অবস্থায় ছিলে যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কান দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, অন্তঃকরণ দিয়েছেন, যেন তোমরা শোকর করো।"

اَفَرَءَيْتُمْ مَاتُمْنُوْنَ ○ ءَ اَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُوْنَ ○ نَحْنُ قَدَّرْنَا
بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ○ عَلٰۤى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ
فِيْ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○ اَفَرَءَ
يْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ○ ءَ اَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗۤ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ○ لَوْ نَشَآءُ
لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ○ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُوْمُوْنَ ○ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ○ ءَ اَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ
الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○
اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ○ ءَ اَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَاۤ اَمْ نَحْنُ
الْمُنْشِئُوْنَ ○ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ○ فَسَبِّحْ بِاسْمِ
رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○ (الواقعه :٥٨-٧٤)

"তোমরা কি সেই শুক্রবিন্দু সম্পর্কে চিন্তা করেছ যা তোমরা মেয়েদের গর্ভে নিক্ষেপ করে থাকো ? তা থেকে (বাচ্চা) তোমরা পয়দা করো, না আমরাই তার জন্মদানকারী ? আমরাই তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছি। এবং আমরা তোমাদের দৈহিক আকৃতি বদলে দিতে এবং অন্য এক চেহারায় তোমাদের তৈরী করতে—যা তোমরা জানো না—অপারগ নই। আর তোমরা নিজেদের প্রথম পয়দায়েশের কথা তো জানোই ; তাহলে কেন তোমরা তা থেকে সবক হাসিল করো না ? অনন্তর তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে, তোমরা যে ফসলাদির চাষাবাদ করো, তা কি তোমরা উৎপাদন করো, না আমরা উৎপাদনকারী ? আমরা

যদি ইচ্ছা করি তো তাকে খড়কুটায় পরিণত করতে পারি এবং তোমরা শুধু কথা বানাতে থাকবে যে, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, বরং সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছি। অতপর তোমরা কি সেই পানির প্রতি লক্ষ্য করেছো, যা তোমরা পান করে থাকো ? তা কি তোমরা মেঘ থেকে বর্ষণ করিয়েছো, না বর্ষণকারী আমরা ? আমরা যদি ইচ্ছা করি তো তাকে তিক্ত বানিয়ে দিতে পারি। সুতরাং কেন শোকর আদায় করো না ? তৎপর সেই আগুনের প্রতি কি তোমরা লক্ষ্য করেছো, যা তোমরা প্রজ্জ্বলিত করো ? যে কাঠ দিয়ে জ্বালোনা হয়, তা কি তোমরা পয়দা করেছো, না আমরা জন্মদানকারী ? আমরা তাকে এক স্মারক বস্তু এবং পথিকদের জন্যে জীবনের পাথেয় স্বরূপ সৃষ্টি করেছি। সুতরাং হে মানুষ, তোমার মহিমান্বিত রবের পবিত্রতা ঘোষণা করো।"–(সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৫৮-৭৪)

وَاِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلاَّ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجّٰكُمْ اِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ○ اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لاَتَجِدُوْا لَكُمْ وَكِيْلاً ○ۙ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُّعِيْدَكُمْ فِيْهِ تَارَةً اُخْرٰى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لاَتَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهٖ تَبِيْعًا ○ (بنى اسرائيل : ٦٧-٦٩)

"যখনই সমুদ্রের ভেতর তোমাদের ওপর ঝড়ের বিপদ নেমে এলো তখন তোমরা নিজেদের সমস্ত বাতিল মাবুদকে ভুলে গেলে এবং তখন আল্লাহর কথাই শুধু মনে এলো। তারপর তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে পৌঁছিয়ে দিলেন, তখন তোমরা আবার বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতরণ করলে ; মানুষ বাস্তবিকই বড় অকৃতজ্ঞ। তোমরা কি এ সম্পর্কে নিঃশঙ্ক হয়ে গেলে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মাটির মধ্যে প্রোথিত করতে পারেন কিংবা তোমাদের ওপর বায়ুর ঝড় এমনি প্রবাহিত করতে পারেন এবং তোমরা নিজেদের কোন সাহায্যকারী পাবে না ? তোমরা কি এ ব্যাপারে নিঃশঙ্ক হয়ে গেলে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে পুর্নবার সমুদ্রে নিয়ে যেতে পারেন এবং তোমাদের ওপর বায়ুর এমন প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত করতে পারেন, যা তোমাদের নাফরমানীর ফলে তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে দিতে পারে, অনন্তর তোমরা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করার কোনই সাহায্যকারী পাবে না ?"–(সূরা বনি ইসরাঈল ঃ ৬৭-৬৯)

এ আয়াতসমূহে মানুষের গর্ব ও অহংকারকে একেবারে চূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এতে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, তোমার প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি একটু লক্ষ্য করে দেখ। একবিন্দু নাপাক ও তুচ্ছ পানি মাতৃগর্ভে গিয়ে বিভিন্নরূপ নাপাকীর দ্বারা বর্ধিত হয়ে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সেই মাংসপিণ্ডে প্রাণ-ই না দিতে পারেন এবং তা এমন অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই বেরিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ্ তাঁর আপন ক্ষমতা বলে সেই মাংস-পিণ্ডে প্রাণ সঞ্চার করেন, তার ভেতর অনুভূতি ও চেতনার সৃষ্টি করেন এবং মানুষের পক্ষে দুনিয়ার জীবনে প্রয়োজনীয় শক্তি ও হাতিয়ার দ্বারা সজ্জিত করেন। এভাবে তুমি দুনিয়ায় আগমন করো। কিন্তু তোমার প্রাথমিক অবস্থা হচ্ছে এই যে, তুমি একটি অসহায় শিশুতে পরিণত হয়ে আসো, তোমার ভেতরে নিজের কোন প্রয়োজনই পূরণ করার ক্ষমতা থাকে না। আল্লাহ্ই তাঁর নিজস্ব কুদরত বলে এমন ব্যবস্থা করে দেন যে, তোমার লালন-পালন হতে থাকে, তুমি বড়ো হতে থাকো ; যৌবনে পদার্পণ করো ; শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী হও ; পুনরায় তোমার শক্তি-সামর্থ্যের অবনতি শুরু হয়, তুমি যৌবন থেকে বার্ধক্যে পদার্পণ করো ; এমন কি এক সময় তোমার ওপর শৈশবকালের মতোই অসহায় অবস্থা চেপে বসে। তোমার চেতনা শক্তি তোমায় ত্যাগ করে যায় ; তোমার শক্তি-সামর্থ দুর্বল হয়ে যায়, তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায় ; অবশেষে তোমার জীবন প্রদীপ চিরকালের মতো নিভে যায়। ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ছেড়ে তোমাকে কবরে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালে তুমি নিজেকে নিজে এক মুহূর্তের জন্যেও জিন্দা রাখতে সমর্থ নও। বরং তোমার চেয়ে উচ্চতর এক শক্তি তোমাকে জীবিত রাখেন এবং যখন ইচ্ছা করেন তোমাকে দুনিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। পরন্তু যতদিন তুমি জিন্দা থাকো, প্রাকৃতিক বিধানকেই তোমার আকড়ে থাকতে হয়। এই হাওয়া, এই পানি, এই আলো, এই উত্তাপ, এই জমির ফসল, এই প্রাকৃতিক সাজ-সরঞ্জাম—যার ওপর তোমার জীবন নির্ভরশীল—এর কোনটিই তোমার আওতাধীন নয়। না তুমি এগুলোকে পয়দা করো, আর না এরা তোমার হুকুমের অনুসারী। এই বস্তু-গুলোই যখন তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তখন তুমি এদের মোকাবিলায় অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ো। এক বায়ুর ঝঞ্ঝা তোমাদের জনপদসমূহকে মিসমার করে দেয়। এক বন্যা-তুফান তোমাদেরকে ডুবিয়ে ফেলে। এক ভূমিকম্প তোমাদেরকে ধূলিস্মাৎ করে দেয়। তুমি যতোই অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হও, আপন জ্ঞান-বুদ্ধি (যা তোমার নিজের সৃষ্ট নয়) দ্বারা যতোই উপায় উদ্ভাবন করো, নিজের বিবেকের (যা তোমার অর্জিত নয়) দ্বারা যতোই সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করো না কেন, প্রাকৃতিক শক্তির সামনে এ সবই অকেজো হয়ে

যায়। অথচ এহেন শক্তি নিয়ে তুমি বড়াই করো, আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠো, কাউকে পরোয়া পর্যন্ত করো না, ফেরাউনী ও নমরুদীপনার পরাকাষ্ঠা দেখাও, নির্মম অত্যাচারী, সীমাহীন জালেম কিংবা চরম অহংকারী হও, আল্লাহর সামনে বিদ্রোহ প্রদর্শন করো, আল্লাহর বান্দাদের উপাস্য (মাবুদ) হয়ে বসো এবং আল্লাহর দুনিয়ায় অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করো।

বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানুষের মর্যাদা

এতো গেলো অহংকার নিরসন করার ব্যাপার। অন্যদিকে ইসলাম মানুষকে বলে দিয়েছে যে, সে নিজেকে নিজে যতোটা তুচ্ছ মনে করে নিয়েছে, ততোটা তুচ্ছ সে নয়। সে বলে ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً ○ (بنى اسرائيل : ٧٠)

"আমরা বনী আদমকে ইজ্জত দান করেছি এবং স্থল ও জল পথে যানবাহনের ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং তাদেরকে পবিত্র জিনিস দ্বারা রেযেক দান করেছি এবং বহু জিনিসের ওপর—যা আমরা পয়দা করেছি—তাকে এরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ ـ (الحج : ٦٥)

"(হে মানুষ !) তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে, আল্লাহ তার সবই তোমাদের জন্যে অধীন করে দিয়েছেন ?"
–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৬৫)

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ج لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ○ وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ ○ وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بٰلِغِيْهِ اِلاَّ بِشِقِّ الْاَنْفُسِ ط اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ○ وَّالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ط وَيَخْلُقُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ ○...... هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ○ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ ط اِنَّ فِيْ

ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ ط وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرٰتٌ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○
وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ○
وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُوْنَهَا ج وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○
وَاَلْقٰى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○
.... وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"এবং জানোয়ার পয়দা করেছেন, যার ভেতর তোমাদের জন্যে শীত থেকে বাঁচার সামান এবং লাভজনক বস্তু নিহিত রয়েছে এবং তার ভেতর থেকে কোন কোনটি তোমরা আহার করে থাকো। ঐগুলোর ভেতর তোমাদের জন্যে নিহিত রয়েছে এক প্রকার সৌন্দর্য, যখন প্রত্যুষে তোমরা ঐগুলো নিয়ে যাও এবং সন্ধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে আসো। তারা তোমাদের বোঝা বহন করে এমন স্থানে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর কষ্ট ছাড়া পৌঁছতে পারো না। তোমাদের রব বড় মেহেরবান ও দয়া প্রদর্শনকারী। তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধা তোমাদের সওয়ারির জন্যে এবং জীবনের সৌন্দর্য সামগ্রী আল্লাহ আরো অনেক জিনিস পয়দা করে থাকেন যা তোমাদের জানা পর্যন্ত নেই। ...... তিনিই আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন তার কিছু তোমাদের পান করার জন্যে, আর কিছু গাছ-গাছড়ার প্রতিপালনের কাজে লাগে, যা দ্বারা তোমরা আপন জানোয়ারের আহার্য লাভ করে থাকো। সেই পানি থেকে আল্লাহ তোমাদের জন্যে ফসল, জয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সকল প্রকার ফল উৎপাদন করেন। এ জিনিসগুলোতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে যারা ভেবে-চিন্তে কাজ করে। তিনিই তোমাদের জন্যে রাত দিন এবং চন্দ্র সূর্যকে অধীন করে দিয়েছেন। এবং নক্ষত্ররাজিও সেই আল্লাহর হুকুমের ফলে অধীন হয়ে রয়েছে। এর ভেতরে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে কাজ করে। আরো বহু রঙ্গের জিনিস তিনি তোমাদের জন্যে দুনিয়ায় পয়দা করেছেন, তাতে শিক্ষাগ্রহণকারীদের জন্যে বড়ো নিদর্শন রয়েছে। এবং সেই আল্লাহই সমুদ্রকে অধীন করে দিয়েছেন, যেনো তা থেকে তাজা গোশত (মাছ) বের করে খেতে পারো এবং সৌন্দর্যের উপকরণ (মুক্তা

ইত্যাদি) বের করতে পারো, যা তোমরা পরিধান করো। আর তোমরা দেখে থাকো যে, নৌকা ও জাহাজসমূহ পানি ভেদ করে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলে যায়। তাই সমুদ্রকে এ জন্যে অধীন করা হয়েছে যেনো আল্লাহর ফযল তালাশ করতে পারো (অর্থাৎ ব্যবসায় করতে পারো)। সম্ভবত তোমরা শোকর আদায় করবে। তিনিই দুনিয়ায় পাহাড় লাগিয়ে দিয়েছেন, যেনো পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঝুঁকে না পড়ে এবং দরিয়া ও রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন, যাতে তোমরা গন্তব্য পথের সন্ধান পেতে পারো ; এরূপ আরো বহুবিধ আলামত বানিয়ে দিয়েছেন ; এমনকি, তার তারকারাজি দ্বারা লোকেরা রাস্তা চিনে থাকে। .... আর যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত হিসেব করো, তাহলে তা বেশুমার দেখতে পাবে।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ৫-১৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে মানুষকে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ায় যতো জিনিস রয়েছে, তার সবই তোমার খেদমত ও ফায়দার জন্যে অধীন করে দেয়া হয়েছে এবং আসমানের জিনিস সম্পর্কেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এই গাছ-পালা, এই দরিয়া, এই সমুদ্র, এই পাহাড়, এই জীব-জন্তু, এই রাত দিন, এই আলো-অন্ধকার, এই চন্দ্র-সূর্য, এই তারকারাজি মোটকথা যা কিছুই তুমি দেখতে পাচ্ছো এর সবই তোমার খাদেম, তোমার ফায়দার জন্যে নিয়োজিত এবং তোমার জন্যে কার্যোপযোগী করে বানানো হয়েছে। তুমি এগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছো ; তোমাকে এদের চেয়ে বেশী ইজ্জত দান করা হয়েছে, তোমাকে এদের সেবার যোগ্য রূপে তৈরি করা হয়েছে। তাহলে কেন তুমি তোমার ঐ খাদেমদের সামনে মাথা নত করো ? কেন ওদেরকে তোমার প্রয়োজন পূরণকারী মনে করো ? কেন ওদের সামনে যাঞ্চার হাত প্রসারিত করো ? কেন ওদের কাছে সাহায্য কামনা করো ? কেন ওদেরকে ভয় করো ও শংকিত হও ? কেন ওদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা কীর্তন করো ? এভাবে তো তুমি নিজেই নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করছো। নিজের মর্যাদা নিজেই ক্ষুণ্ন করছো ; নিজেকেই নিজে খাদেমের খাদেম ও গোলামের গোলামে পরিণত করছো !

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি

এ থেকে জানা গেল যে, মানুষ না এতোটা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যতোটা সে অহমিকা বশত নিজেকে নিজে মনে করে আর না এতোটা তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট যতোটা সে নিজেকে বানিয়ে নিয়েছে। এখন প্রশ্ন ওঠে ঃ তাহলে দুনিয়ায় মানুষের সঠিক মর্যাদা কি ? এর জবাবে ইসলাম বলে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ؕ قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ

فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط
قَالَ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلٰٓئِكَةِ لا فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ قَالُوْا
سُبْحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ قَالَ يٰٓاٰدَمُ
اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ج فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ لا قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ
اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لا وَاَعْلَمُ مَاتُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝ وَاِذْ
قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰى وَاسْتَكْبَرَ ق وَكَانَ
مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا ص وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ فَاَزَلَّهُمَا
الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ص

"আর যখন তোমার পরোয়ারদিগার ফেরেশতাদেরকে বললেন যে, আমি দুনিয়ায় এক খলীফা (প্রতিনিধি) পাঠাতে চাই, তখন তারা আরয করলোঃ তুমি কি দুনিয়ায় এমন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে চাও যে সেখানে গিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং খুন-খারাবী করবে ? অথচ আমরা তোমার মহত্ব ঘোষণা করি এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ বললেন ঃ আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না। আর তিনি আদমকে সব জিনিসের নাম শিখিয়ে দিলেন। অতপর তাকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তো ঐ জিনিসগুলোর নাম আমায় বলে দাও। তারা বললো ঃ পবিত্র তোমার সত্তা ! তুমি যা কিছু আমাদেরকে শিখিয়েছো তা ছাড়া আর কিছুই জানি না। তুমিই বিজ্ঞ এবং সর্বজ্ঞ। আল্লাহ বললেন ঃ হে আদম, তুমি ফেরেশতাদেরকে ঐ জিনিসগুলোর নাম বলে দাও। সুতরাং আদম যখন তাদেরকে ঐ বস্তুগুলোর নাম বলে দিলেন, তখন আল্লাহ বললেন ঃ আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও জমিনের সমস্ত গোপন কথাই আমি জানি এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো আর লুকিয়ে রাখো তার সবকিছুরই আমি খবর রাখি। আর যখন আমরা ফেরেশতাদেরকে আদেশ করলাম, আদমকে সেজদা করো, তখন তারা সবাই সেজদা করলো একমাত্র ইবলিস ছাড়া, সে অস্বীকার করলো,

অহংকার প্রকাশ করলো এবং নাফরমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। আর আমরা আদমকে বললাম, হে আদম, তুমি এবং তোমার স্ত্রী উভয়ে জান্নাতে থাকো এবং এখানে যা চাও তৃপ্তি সহকারে খাও ; কিন্তু ঐ গাছটির কাছেও যেও না, তাহলে তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু শয়তান তাদেরকে জান্নাত থেকে পদস্খলিত করলো এবং যে সুখ-সম্পদের মধ্যে ছিলো, তা থেকে বের করে দিলো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩০-৩৬)

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○
فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ○ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ
كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ○ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ط اَبٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○ قَالَ
يٰٓاِبْلِيْسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ ○ قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ
خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ○ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ○
وَّاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ○ قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْٓ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

"আর যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি বিবর্ণ শুষ্ক কর্দম থেকে এক মানুষ বানাতে চাই, অতপর যখন আমি তার সুষ্ঠু অবয়ব দান করবো এবং তার ভেতর আপন রূহ থেকে কিছু ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার জন্যে সেজদায় লুটিয়ে পড়। বস্তুত তামাম ফেরেশতাই সেজদা করলো, শুধু ইবলিস ছাড়া ; সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানালো। আল্লাহ বললেন ঃ হে ইবলিস ! তোর কি হলো যে, তুই সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলি ? ইবলিস বললো ঃ আমি এমন নই যে, সেই মানুষকে সেজদা করবো, যাকে তুমি কালো বিবর্ণ শুষ্ক কর্দম থেকে সৃষ্টি করেছো ? আল্লাহ বললেন ঃ তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা, তুই বিতাড়িত। প্রতিফল দিবস পর্যন্ত তোর ওপর অভিসম্পাত।"–(সূরা আল হিজর ঃ ২৮-৩৫)

এ বিষয়টিকে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে। এর সংক্ষিপ্ত সার হলো এই ঃ আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি (নায়েব) হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাকে ফেরেশতাদের চেয়ে বেশী জ্ঞান দিয়েছেন, তার জ্ঞানকে ফেরেশতাদের তসবিহ্ পাঠ ও পবিত্রতা বর্ণনার ওপরে স্থান দিয়েছেন, ফেরেশতাদেরকে তাঁর সেই প্রতিনিধিকে সেজদা করার আদেশ করেছেন, ফেরেশতাগণ তাকে সেজদা করলো এবং এভাবে সমগ্র ফেরেশতা

তাঁর সামনে নতমস্তক হলো ; কিন্তু ইবলিস এতে অস্বীকৃতি জানালো এবং এভাবে শয়তানী শক্তি তাঁর সামনে মাথা নত করলো না। অবশ্য তখনো সে ছিলো মাটির এক তুচ্ছ পুতুল মাত্র ; কিন্তু আল্লাহ তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়ে এবং তাকে জ্ঞান দান করে তাকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যোগ্য করে দিলেন। ফেরেশতারা তার এই শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নিলো এবং তার সামনে নতমস্তক হলো। কিন্তু শয়তান তাকে স্বীকার করলো না। এই অপরাধে শয়তানের ওপর লা'নত বর্ষিত হলো। কিন্তু সে মানুষকে কুমন্ত্রণা দেবার চেষ্টা করার জন্যে কেয়ামত পর্যন্ত সুযোগ চেয়ে নিলো। তাই মানুষকে সে কুমন্ত্রণা দিলো, জান্নাত থেকে বহিষ্কার করালো আর তখন থেকে মানুষ ও শয়তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলো। আল্লাহ মানুষকে বললেন ঃ আমি তোমাকে যে হেদায়াত পাঠাবো তা মেনে চললে তুমি জান্নাতে যেতে পারবে, আর তোমার আদি দুশমন শয়তানের হুকুম তামিল করলে তোমার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

প্রতিনিধি পদের গুরুত্ব

এই আলোচনা থেকে নিম্নরূপ বিষয়গুলো জানা গেল ঃ এ দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা হচ্ছে এই যে, সে আল্লাহর খলীফা। খলীফা বলা হয় নায়েব বা প্রতিনিধিকে। প্রতিনিধির কাজ হলো ঃ যার সে প্রতিনিধি, তারই আনুগত্য করে চলবে। সে না আর কারো আনুগত্য করতে পারে, আর না আপন মনিবের প্রজা এবং তার চাকর, খাদেম ও গোলামকে নিজেরই প্রজা, নিজেরই চাকর, খাদেম ও গোলামে পরিণত করতে পারে। বরং এরূপ করলে সে বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত হবে এবং উভয় ক্ষেত্রেই শাস্তি লাভ করবে। সে যেখানে প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছে, সেখানে সে আপন মনিবের মাল-মাত্তা ব্যবহার করতে পারে, তাঁর প্রজাদের ওপর শাসন চালাতে পারে, তাদের কাছ থেকে খেদমত নিতে পারে, তাদের তত্ত্বাবধান করতে পারে ; কিন্তু এ হিসেবে নয় যে, সে নিজেই মনিব অথবা এ হিসেবেও নয় যে, উক্ত মনিব ছাড়া সে অন্য কারো অধীনস্থ বরং এই হিসেবে যে, সে আপন মনিবের প্রতিনিধি এবং যতো জিনিস তার কর্তৃত্বাধীন সেগুলোর ওপর সে মনিবের তরফ থেকে নিযুক্ত আমানতদার। এ কারণে সে সাচ্চা, মনঃপুত এবং পুরস্কার লাভের যোগ্য প্রতিনিধি ঠিক তখনই হতে পারে, যখন সে আপন মনিবের আমানতে খেয়ানত না করবে, তার দেয়া হেদায়াত অনুসরণ করে চলবে এবং তার বিধান লংঘন না করবে —তার ধন-সম্পদ, তার প্রজা, তার চাকর, তার খাদেম এবং তার গোলামদের ওপর শাসন চালাতে তাদের কাছ থেকে খেদমত নিতে এবং তাদের সাথে ব্যবহার ও তাদের তত্ত্বাবধান করতে তারই রচিত আইন কানুন মেনে চলবে। সে যদি এরূপ না করে তাহলে সে প্রতিনিধি নয়—বিদ্রোহী হবে, মনঃপুত নয় —মরদুদ হবে, পুরস্কার লাভের যোগ্য নয়—শাস্তির উপযোগী হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَنْ تَبِعَ هُدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَآ اُوْلٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○(البقرة : ٣٨-٣٩)

"যারা আমার দেয়া হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তাদের জন্যে কোনরূপ শাস্তির ভয় এবং কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আর যারা নাফরমানী করবে এবং আমার বাণী ও নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাইবে, তাদের জন্যে রয়েছে দোযখের অগ্নি ; সেখানে তারা চিরকাল থাকেব।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩৮-৩৯)

প্রতিনিধি বা আমানতদার কখনো এরূপ স্বাধীন হয় না যে, সে নিজের মর্জী মোতাবেক যা খুশী তাই করতে পারে ; আপন মনিবের ধন-দৌলত এবং তার প্রজাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে এবং এসব ব্যাপারে তাকে কেউ জিজ্ঞাসাবাদ করার থাকবে না। বরং তাকে আপন মনিবের সামনে জবাবদিহি করতে হয়, প্রতিটি কড়া-ক্রান্তির হিসেব তাকে দিতে হয়, তার মনিব তার প্রতিটি কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এবং তার আমানত, তার মাল-মাত্তা এবং তার প্রজাদের সে যা কিছু করেছে, তার জিম্মাদারী তার ওপর ন্যস্ত করে তাকে শাস্তি কিংবা পুরস্কার দান করতে পারে।

প্রতিনিধির সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো ঃ সে যার প্রতিনিধি তার আজ্ঞানুবর্তিতা, তার শাসন এবং তার সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে মেনে নেয়া। সে যদি এরূপ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে না সে নিজের প্রতিনিধি পদের গুরুত্বকে বুঝতে পারবে, আর না তার আমানতদারীর পদে অভিষিক্ত হওয়া সম্পর্কে তার মনে কোন সুষ্ঠু ধারণা জন্মাবে ; না তার জিম্মাদারী ও জবাবদিহি সম্পর্কে কোন অনুভূতি জাগবে ; আর না তার ওপর ন্যস্ত আমানত সম্পর্কে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার মতো যোগ্যতা লাভ করবে। প্রথমত এই আমানত ও প্রতিনিধিত্বের ধারণা নিয়ে মানুষ যে কর্মনীতি অবলম্বন করবে, এছাড়া অন্য কোন ধারণা নিয়েও ঠিক তাই অনুসরণ করবে, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আর যদি ধরেও নেয়া যায় যে, অসম্ভবটিই তার পক্ষে সম্ভব তবুও তার কোন দাম নেই। কারণ মনিবের আজ্ঞানুবর্তিতা অস্বীকার করে পূর্বেই সে বিদ্রোহী হয়েছে। এখন যদি সে নিজের ইচ্ছে-প্রবৃত্তি কিংবা অন্য কারো আনুগত্য করতে গিয়ে সৎকাজ করেও, তবে যার আনুগত্য সে করেছে, তার কাছেই তার পুরস্কার চাওয়া উচিত। তার মনিবের কাছে সেই সৎকাজ সম্পূর্ণ অর্থহীন।

মানুষ তার মূল সত্তার দিক দিয়ে এক তুচ্ছ সৃষ্টি মাত্র। কিন্তু সে যা কিছু ইজ্জত লাভ করেছে, তা শুধু তার ভেতরে ফুঁকে দেয়া রূহ এবং দুনিয়ায় তাকে

আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব দান করার কারণেই। এখন শয়তানের আনুগত্য করে তার রূহকে কলুষিত না করা এবং নিজেকে প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করে বিদ্রোহের পর্যায়ে অবনমিত না করার ওপরই তার এই ইজ্জতের হেফাজত নির্ভরশীল। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে তাকে সেই তুচ্ছ সৃষ্টিই থেকে যেতে হবে।

মালাকূতী শক্তি (অদৃশ্য জগতের শক্তি) মানুষের আল্লাহর প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবেই তার সামনে মাথা নত করেছে, কিন্তু শয়তানী শক্তি তার প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করে না, বরং তাকে নিজের অনুগত বানাতে চায়। মানুষ যদি এ দুনিয়ায় প্রতিনিধিত্বের কর্তব্য পালন করে এবং আল্লাহরই প্রদর্শিত পথে চলে তাহলে মালাকূতী শক্তি তার সহায়তা করবে। তার জন্যে ফেরেশতাদের সেনাবাহিনী অবতরণ করবে। মালাকূত জগত কখনো তার প্রতি বিমুখ হবে না। এই সকল শক্তির সাহায্যে সে শয়তান এবং তার অনুচরদেরকে পরাজিত করে ফেলবে। কিন্তু সে যদি প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করতে কুণ্ঠিত হয় এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথে না চলে, তাহলে মালাকূতী শক্তি তার সংশ্রব ত্যাগ করবে ; কেননা এর ফলে সে নিজেই নিজের প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হবে। আর যখন তার সহায়তা করার মতো কোন শক্তি বর্তমান থাকবে না এবং সে নিছক মাটির একটি পুতুলে পরিণত হবে, তখন শয়তানী শক্তি তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। অতপর শয়তান এবং তার অনুচরগণই হবে তার একমাত্র সহায়ক ও সাহায্যকারী, তাদের বিধি-বিধানেরই করবে সে আনুগত্য এবং তাদের মতোই হবে তার পরিণাম।

আল্লাহর প্রতিনিধি হবার কারণে মানুষের মর্যাদা হচ্ছে দুনিয়ার সকল জিনিসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত। দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসই তার অধীন, তার ব্যবহারের জন্যে নিয়োজিত এবং আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় তা থেকে সে খেদমত গ্রহণ করার অধিকারী। এই সকল অধীনস্থ জিনিসের সামনে নত হওয়া তার পক্ষে নিতান্তই অপমানকর। এদের সামনে নত হলে সে নিজেই নিজের ওপর যুলুম করে এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হবে। কিন্তু এমন এক সত্তাও রয়েছে, যার সামনে নত হওয়া, যার আনুগত্য করা তার অপরিহার্য কর্তব্য (ফরয) এবং যাকে সেজদা করার ভেতরে নিহিত রয়েছে তার জন্যে ইজ্জত-সম্মান। সেই সত্তাটি কে ?—আল্লাহ তার মনিব, যিনি মানুষকে তার প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন।

মানব জাতির কোন বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণী আল্লাহর প্রতিনিধি নয় বরং গোটা মানব জাতিই প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত আর প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে প্রতিটি মানুষই অন্য মানুষের সমান। এ জন্যেই না কোন মানুষের

অপর কোন মানুষের সামনে নত হওয়া উচিত। আর না কেউ নিজের সামনে অন্য মানুষকে অবনত করানোর অধিকারী। একজন মানুষ শুধু অন্য একজন মানুষের কাছে মনিবের হুকুম এবং তাঁর হেদায়াতের আনুগত্য করারই দাবী জানাতে পারে। এ দিক দিয়ে অনুগত ব্যক্তি হবে 'আমের' (আদেশকারী) আর অনুগত ব্যক্তি 'মামুর' (আদিষ্ট)। কেননা যে ব্যক্তি প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করলো সে হক না আদায়কারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের মানে এ নয় যে, সে নিজেই তার মনিব।

আমানত ও প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা প্রতিটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে লাভ করেছে। এতে কোন যৌথ দায়িত্ব নেই। এ জন্যে প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ স্থানে এই পদমর্যাদার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। না একজনের ওপর অন্যান্যদের কৃতকর্মের জবাবদিহি ন্যস্ত হবে, আর না একজন অন্যজনের কৃতকর্ম থেকে ফায়দা হাসিল করতে পারবে। অনুরূপভাবে না কেউ এই জিম্মাদারী থেকে কাউকে নিষ্কৃতি দিতে পারবে, আর না কারোর দুষ্কৃতির বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপানো হবে।

মানুষ যতদিন পর্যন্ত দুনিয়ায় থাকে আর যতদিন বাকী থাকে মাটির পুতুল (মানব দেহ) এবং আল্লাহর ফুঁকে দেয়া রূহের সম্পর্ক ততদিনই সে থাকে প্রতিনিধি। এই সম্পর্ক ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দুনিয়ার খেলাফতের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। তার এই প্রতিনিধিত্বকালের কীর্তিকলাপের যাচাই-পর্যালোচনা হওয়া উচিত, তার ওপর ন্যস্ত আমানতের হিসেব-নিকেশ হওয়া উচিত, প্রতিনিধি হিসেবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সে কিভাবে পালন করেছে, তার তদন্ত হওয়া উচিত। সে যদি খেয়ানত, বিশ্বাস ভঙ্গ, অবাধ্যতা, বিদ্রোহ এবং দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়ে থাকে তো তার সাজা পাওয়া উচিত। পক্ষান্তরে সে যদি ঈমানদারী, বিশ্বস্ততা, দায়িত্বজ্ঞান ও আনুগত্য পরায়ণতার সাথে কর্তব্য পালন করে থাকে তাহলে তার পুরস্কারও তার পাওয়া দরকার।

জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা

উপরোক্ত 'খেলাফত' ও 'প্রতিনিধিত্ব' শব্দ দু'টি থেকে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রতিনিধির প্রকৃত কর্তব্য এই যে, আপন প্রভুর মাল-মাত্তায় তার প্রতিনিধিত্বের 'হক' পুরোপুরি আদায় করার চেষ্টা করবে এবং প্রকৃত মালিক যেভাবে তার ভোগ-ব্যবহার করে থাকে, যতদূর সম্ভব সে-ও তেমনিভাবে ভোগ-ব্যবহার করবে। বাদশাহ যদি তার প্রজাদের ওপর কাউকে প্রতিনিধি (নায়েব) নিযুক্ত করেন, তবে তার পক্ষে সেই প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা ব্যবহারের প্রকৃষ্ট পন্থা হবে এই যে, প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ,

স্নেহ-মমতা, দয়াশীলতা, নিরাপত্তা, সুবিচার ও ক্ষেত্রবিশেষে কড়াকড়ি করার ব্যাপারে খোদ বাদশাহ যেরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন, সে-ও ঠিক সেরূপ ভূমিকাই গ্রহণ করবে এবং বাদশাহের মাল-মাত্তা ও ধন-সম্পদ তারই মতো বুদ্ধিমত্তা (হিকমত), প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতার সাথে ভোগ-ব্যবহার করবে।

কাজেই মানুষকে আল্লাহর খলীফা—প্রতিনিধি আখ্যা দেয়ার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহর সৃষ্টির সাথে আচরণের বেলায় মানুষের অনুসৃত নীতি যদি স্বয়ং আল্লাহর মতই হয়, কেবল তখনই সে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও খেলাফতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারে। অর্থাৎ যেরূপ প্রতিপালনসুলভ মহত্ত্বের সঙ্গে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করে থাকেন, সেরূপ মহত্ব নিয়েই মানুষ তার সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে, আল্লাহ কর্তৃক তার আয়ত্তাধীন করে দেয়া বস্তুনিচয়ের সংরক্ষণ ও লালন-পালন করবে। অনরূপভাবে যে ধরনের রহমানী মহত্ত্বের সঙ্গে আল্লাহ তার ধন-সম্পদ ব্যবহার করেন, যেরূপ সুবিচার ও নিরপেক্ষতার সাথে তিনি তার সৃষ্টির ভেতর শৃংখলা বজায় রাখেন এবং যে ধরনের দয়া ও অনুকম্পার সঙ্গে তিনি তার 'জবর' ও 'কাহর' (অর্থাৎ দয়াশূন্যতা সূচক)-এর গুণাবলী প্রকাশ করেন, আল্লাহর যে সৃষ্টির ওপর মানুষকে কর্তৃত্ব ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং যাকে করা হয়েছে তার অধীনস্থ তার সাথে এই মানুষ অপেক্ষাকৃত কত মাত্রায় হলেও ঠিক তেমনি ধরনেরই ব্যবহার করবে। تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ-এর প্রজ্ঞাময় বাক্যটিতে এ তাৎপর্যই বিধৃত হয়েছে। কিন্তু মানুষ যখন এ সত্যটি ভালো মত উপলব্ধি করতে পারবে যে, এ দুনিয়ায় সে কোন স্বাধীন শাসক নয়, বরং প্রকৃত শাসকের সে প্রতিনিধি মাত্র। কেবল তখনই সে এ উন্নত নৈতিক মর্যাদা লাভ করতে পারে। এ হচ্ছে প্রতিনিধি পদের প্রকৃত দায়িত্ব। এটাই দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু, এমন কি তার দেহ এবং দৈহিক ও মানসিক শক্তির সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ ও পরিধি সুনির্দিষ্ট করে দেয়।

প্রতিনিধিত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত যা বলা হলো, কুরআন মজীদে তার প্রতিটি কথারই বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এ থেকে দুনিয়া এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিটি দিকই উজ্জ্বল ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মানুষ প্রতিনিধি—মালিক নয়

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰكُمْ ۚ (الانعام : ١٦٥)

"সেই আল্লাহই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের ভেতর থেকে কাউকে কারুর চেয়ে উঁচু মর্যাদা দিয়েছেন, যেন তোমাদেরকে তিনি যা কিছু দান করেছেন, তার ভেতর তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।"-(সূরা আল আন'আম ঃ ১৬৫)

قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ○ (الاعراف : ١٢٩)

"(মূসা বনী ইসরাঈলকে) বললেন ঃ খুব শীগগীরই আল্লাহ তোমাদের দুশমনকে ধ্বংস করে দেবেন এবং দুনিয়ায় তোমাদেরকে খলিফা বানাবেন, যাতে করে তোমরা কিরূপ কাজ করো তা তিনি দেখতে পারেন।"
-(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১২৯)

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ○ (ص : ٢٦)

"হে দাউদ ! আমরা তোমাকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি বানিয়েছি, সুতরাং তুমি লোকদের ভেতর সত্য সহকারে শাসন করো এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না ; কারণ এ তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্যে এই কারণে কঠোর শাস্তি রয়েছে যে, তারা হিসেবের দিনকে ভুলে গিয়েছে।"-(সূরা সাদ ঃ ২৬)

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ○ (التين : ٨)

"আল্লাহ কি সকল শাসকদের শাসক নন ?"-(সূরা আত-তীন ঃ ৮)

اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ○ (الانعام : ٥٧)

"হুকুমত আল্লাহ ছাড়া আর কারুর নয়।"-(সূরা আল আন'আম ঃ ৫৭)

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ط (ال عمران : ٢٦)

"বলো, হে আল্লাহ। সমস্ত রাজ্যের মালিক। তুমি যাকে চাও রাজ্য দান করো, আর যার কাছ থেকে ইচ্ছে করো রাজ্য ছিনিয়ে নাও। যাকে চাও সম্মান দান করো, আবার যাকে চাও অপমানিত করো।"

اِتَّبِعُوْا مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط (الاعراف : ٣)

"তোমাদের প্রতি তোমাদের আল্লাহর তরফ থেকে যাকিছু নাযিল হয়েছে, শুধু তারই আনুগত্য করো এবং তিনি ছাড়া অপর কোন পৃষ্ঠপোষকদের আনুগত্য করো না।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُكِیْ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"বলো, আমার নামায, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্যে।"

–(সূরা আল আন'আম ঃ ১৬২)

এই আয়াতসমূহ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে, দুনিয়ায় যতো জিনিসই মানুষের ভোগ-ব্যবহার ও কর্তৃত্বাধীন রয়েছে, তার কোনটারই—এমন কি তার নিজ সত্তারও—মালিকানা তার নয়। এগুলোর প্রকৃত মালিক, শাসক ও নিয়ামক হচ্ছেন আল্লাহ। এই জিনিসগুলোকে প্রকৃত মালিকের ন্যায় আপন খেয়াল-খুশী মতো ভোগ-ব্যবহার করার কোন অধিকার মানুষের নেই। দুনিয়ায় তার মর্যাদা হচ্ছে নিছক প্রতিনিধির এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলা এবং তাঁর প্রদর্শিত পন্থায় ঐ জিনিসগুলোর ভোগ-ব্যবহার করা পর্যন্তই তার ইখতিয়ার সীমাবদ্ধ। এ নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে আপন প্রবৃত্তির আনুগত্য করা কিংবা প্রকৃত শাসক ছাড়া অন্য কোন শাসকের নির্দেশ মেনে চলা বিদ্রোহ এবং ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুনিয়ার জীবনে সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

"যারা বাতিলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"

–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৫২)

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ج (البقرة : ٢١٧)

"তোমাদের ভেতর থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন (অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য) থেকে ফিরে যায় এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে এমন লোকদের আমল বরবাদ হয়ে যায়।"

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ز وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

"যে কেউ ঈমান আনতে অস্বীকার করে তার যাবতীয় আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"-(সূরা মায়েদা ঃ ৫)

এ আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আপন মনিবের শাসন কর্তৃত্ব স্বীকার করা এবং নিজেকে তার প্রতিনিধি ও আমানতদার মনে করে সকল কাজ সম্পাদন করার ওপরই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের সাফল্য নির্ভর করে। এ স্বীকৃতি ছাড়া আল্লাহর ধন-সম্পদ ও দ্রব্য-সামগ্রী সে যতটুকু ভোগ-ব্যবহার করবে, তা শুধু বিদ্রোহাত্মক ভোগ-ব্যবহারই হবে। আর এটা সাধারণ জ্ঞানের কথা যে, বিদ্রোহী যদি কোন দেশ দখল করে দেশ সেবার উত্তম নজীরও পেশ করে, তবু দেশের আসল বাদশাহ তার এই 'সৎকাজের' আদৌ স্বীকৃতি দেবে না। বাদশাহর কাছে বিদ্রোহী বিদ্রোহীই ; তার ব্যক্তি চরিত্র ভালো হোক আর মন্দ, বিদ্রোহ করে সে দেশকে সুষ্ঠুভাবে চালিত করুক আর নাই করুক তাতে কিছু আসে যায় না।

দুনিয়া ভোগ-ব্যবহারের জন্যেই

কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ز وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○ (البقرة : ١٦٨-١٦٩)

"হে মানুষ ! দুনিয়ায় যেসব হালাল ও পবিত্র দ্রব্যাদি রয়েছে, তা থেকে খাও এবং কোন ব্যাপারে শয়তানের আনুগত্য করো না ; কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। সে তো তোমাদেরকে পাপাচার, নির্লজ্জতা এবং আল্লাহর সম্পর্কে যাহা তোমরা জানো না এমন কথা বলার নির্দেশ দেয়।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮-১৬৯)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○ وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ص وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○ (المائدة : ٨٧-٨٨)

"হে ঈমানদারগণ ! যেসব পবিত্র জিনিস আল্লাহ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন, তাকে নিজেদের জন্যে হারাম করো না এবং সীমালংঘন করো

না ; কারণ, আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র রেযেক দান করেছেন, তা থেকে খাও এবং যে আল্লাহর প্রতি তোমরা ঈমান রাখো, তাঁর নাফরমানী হতে দূরে থাক।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৮৭-৮৮)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِي اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط

"(হে নবী !) বলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্যে যেসব সৌন্দর্য সামগ্রী (জিনাত) বের করেছেন, তাকে কে হারাম করেছে আর কে পবিত্র রিযিককে হারাম করে দিয়েছে ?"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩২)

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط

"(আমাদের পয়গাম্বর) তাদেরকে নেক কাজের আদেশ দেন এবং অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত রাখেন, তাদের জন্যে পবিত্র জিনিস হালাল ও অপবিত্র জিনিস করেন হারাম আর তাদের ওপরকার বোঝা ও বন্ধনসমূহ দূর করে দেন।"–(সূরা আর আরাফ ঃ ১৫৭)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ ط(البقرة : ١٩٨)

"তোমরা আপন প্রভুর ফযল (অর্থাৎ ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা) তালাশ করবে, এর ভেতরে তোমাদের জন্যে কোনই অনিষ্ট নেই।"

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ ـ

"মসীহর অনুগামীগণ নিজেরাই বৈরাগ্যবাদ উদ্ভাবন করে নিয়েছিলো শুধু আল্লাহর সন্তোষ লাভের আশায়, এটা তাদের জন্যে আমরা বিধিবদ্ধ করিনি।"–(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৭)

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّيَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّيُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لاَّيَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ٥(الاعراف : ١٧٩)

"আমরা জাহান্নামের জন্যে বহু জ্বিন ও মানুষ পয়দা করেছি। তাদের কাছে দিল রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা চিন্তা-ভাবনা করে না, তাদের কাছে চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা দেখে না ; তাদের কাছে কান রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা

শোনে না, তারা জানোয়ারের মতো, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। এরাই রয়েছে গাফলতে নিমজ্জিত।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৯)

এই আয়াতগুলোতে একথা সুস্পষ্ট যে, দুনিয়া ত্যাগ করাটা মানুষের কাজ নয়। দুনিয়া এমন কোন জিনিসও নয় যে, তাকে বর্জন করতে হবে, তা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তার কায়-কারবার, বিষয়াদি, ভোগোপকরণ ও সৌন্দর্য সুষমাকে নিজের প্রতি হারাম করে নিতে হবে। এ দুনিয়া মানুষের জন্যেই তৈরী করা হয়েছে ; সুতরাং তার কাজ হচ্ছে, একে ভোগ-ব্যবহার করবে, বিপুলভাবে ভোগ-ব্যবহার করবে। তবে ভালো-মন্দ, পাক-নাপাক ও সমীচীন-অসমীচীনের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভোগ করবে। আল্লাহ তাকে দেখার জন্য চক্ষু দিয়েছেন, শোনার জন্যে কান দিয়েছেন, ভালো-মন্দ বিচারের জন্যে জ্ঞান দিয়েছেন। যদি মানুষ তার দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইন্দ্রিয় নিচয় ও মানসিক শক্তিকে ব্যবহার না করে অথবা ভুল পথে ব্যবহার করে তো তার ও পশুর মধ্যে কোনই প্রভেদ থাকে না।

দুনিয়াবী জীবনের রহস্য

اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ○

"(আখেরাত সম্পর্কে) আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চিতরূপে সত্য ; সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলে না দেয় এবং প্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করে না রাখে।"

–(সূরা ফাতের ঃ ৫)

وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ○ (هود : ١١٦)

"যারা নিজেদের প্রতি নিজেরা যুলুম করেছে, তারাই পার্থিব আনন্দ-উপভোগের—যা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল—পেছনে পড়ে রয়েছে ; এরাই ছিলো অপরাধী।"–(সূরা হূদ ঃ ১১৬)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا○ اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا○ (الكهف : ٤٥ ـ ٤٦)

"তাদের সামনে পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত পেশ করো। তাহলো এই, যেন আসমান থেকে আমরা পানি বর্ষণ করলাম এবং তার ফলে দুনিয়া শস্য-

শ্যামল হয়ে গেলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শস্যাদি ভূষিতে পরিণত হয়ে গেল, যা দমকা হাওয়ায় ইতঃস্তত উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান। ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি হচ্ছে নিছক পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যোপকরণ মাত্র ; কিন্তু তোমার প্রভুর দৃষ্টিতে 'সওয়াব' এবং ভবিষ্যত প্রত্যাশার দিক থেকে স্থায়ী নেকীই হচ্ছে অধিকতর উত্তম।"

–(সূরা আল কাহাফ ঃ ৪৫-৪৬)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ○ وَمَنْ
يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○(المنافقون : ٩)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের ধন-দৌলত ও তোমাদের সন্তানাদি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাদের গাফেল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে, প্রকৃতপক্ষে তারাই হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত।"–(সূরা মুনাফেকুন ঃ ৯)

وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ○(سبا : ٣٧)

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তানাদি এমন জিনিস নয় যা তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী করতে পারে। আমাদের নিকটবর্তী কেবল তারাই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে।"

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى
الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۗ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ
مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۗ(الحديد : ٢٠)

"জেনে রাখ, দুনিয়ার জীবন হচ্ছে একটি খেল, একটি তামাশা, এক বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের একের ওপর অপরের গর্ব করা এবং ধন-সম্পদ ও সন্তানাদিতে একের চেয়ে অন্যের প্রাচুর্য লাভের চেষ্টা করা। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, বৃষ্টি হলো এবং তার থেকে উৎপন্ন ফসল দেখে কৃষক খুব খুশী হলো। তারপর সে ফসল পাকলো এবং তুমি দেখতে পেলে যে, তা বিবর্ণ হয়ে গেলো। অবশেষে তা ভূষিতেই পরিণত হলো।"

–(সূরা আল হাদীদ ঃ ২০)

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ○ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ○

"তোমরা কি প্রতিটি উঁচু জায়গায় নিষ্ফল স্মৃতি স্তম্ভ এবং বড় বড় ইমারত তৈরী করছো ? সম্ভবত এই ধারণায় যে, তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে।"–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১২৮-১২৯)

اَتُتْرَكُوْنَ فِيْ مَاهٰهُنَآ اٰمِنِيْنَ ○ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ○ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ○ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ○ (الشعراء : ١٤٦-١٤٩)

"তোমাদের কি নিশ্চিতভাবে ছেড়ে দেয়া হবে এখানকার এই জিনিস-গুলোর মধ্যে এই বাগ-বাগিচা, এই ঝর্ণাধারা, এই শস্য ক্ষেত এবং মনোহর আবরণযুক্ত খেজুরের বাগানে ? আর তোমরা পাহাড় কেটে বাড়ি তৈয়ার করছো এবং খুশীতে রয়েছো।"–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৪৬-১৪৯)

اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط

"তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের আসবেই—চাই তোমরা খুব সুদৃঢ় কেল্লার মধ্যেই থাকো না কেন।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৮)

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ قف ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○ (العنكبوت : ٥٧)

"প্রত্যেককেই মৃত্যুবরণ করতে হবে ; তারপর তোমাদের সবাইকে আমাদের দিকে নিয়ে আসা হবে।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৫৭)

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ ○ (المؤمنون : ١١٥)

"তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছো যে, আমরা তোমাদেরকে নিষ্ফল পয়দা করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের দিকে ফিরিয়ে আনা হবে না ?"

পূর্বে বলা হয়েছিল যে, দুনিয়া তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ; তোমরা একে খুব উত্তমরূপে ভোগ-ব্যবহার করো। এবার বিষয়টির অপর দিক পেশ করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে, দুনিয়া তোমাদের জন্যে হলেও তোমরা দুনিয়ার জন্যে নও। অথবা দুনিয়া তোমাদের ভোগ-ব্যবহার করবে আর তোমরা তার মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে, এ জন্যেও তাকে সৃষ্টি করা হয়নি। দুনিয়ার জীবনে প্রতারিত হয়ে তোমরা কখনো এ ধারণা পোষণ করো না যে, তোমাদের এখানে চিরকাল থাকতে হবে। খুব ভালোমতো জেনে রাখো এই মাল-মাত্তা, ধন-দৌলত, শান-শওকত, সামানপত্র সবকিছুই অস্থায়ী জিনিস। সবকিছুই হচ্ছে কালের ধোঁকা মাত্র। এর সবারই পরিণাম হচ্ছে ধ্বংস। তোমাদের ন্যায় এর প্রতিটি বস্তুই মাটিতে মিশে যাবে। এ অস্থায়ী জগতের মধ্যে একমাত্র বাকী থাকার মতো জিনিস হচ্ছে মানুষের নেকী ; তার দিল ও আত্মার নেকী ; তার আমল ও আচরণের নেকী।

কৃতকর্মের দায়িত্ব ও জবাবদিহি

এরপর বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ○ (طه : ١٥)

"বিচারের সময়—যাকে আমরা গোপন রাখার ইচ্ছে পোষণ করি—অবশ্যই সমুপস্থিত হবে, যাতে করে প্রত্যেকেই তার চেষ্টানুযায়ী ফল পেতে পারে।"–(সূরা ত্বাহা ঃ ১৫)

هَلْ تُجْزَوْنَ اِلاَّ مَاكُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ (النمل : ٩٠)

"তোমাদের কি তোমাদের আমল ছাড়া অন্য কোন জিনিসের দৃষ্টিতে প্রতিফল দেয়া হবে ?"–(সূরা আন নামল ঃ ৯০)

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَاسَعٰى ○ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ○ ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى ○ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ○ (النجم : ٣٩-٤٢)

"আর মানুষ ততটুকুই ফল লাভ করবে যতটুকু চেষ্টা সে করেছে ; তার প্রচেষ্টা শীগগীরই দেখে নেয়া হবে। অতপর সে পুরোপুরি ফল লাভ করবে। আর পরিশেষে সবাইকে তোমাদের পরোয়ারদেগারের কাছেই পৌঁছতে হবে।"–(সূরা আন নাজম ঃ ৩৯-৪২)

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلاً ○

"যে ব্যক্তি এ দুনিয়ায় অন্ধ থাকে সে আখেরাতেও অন্ধ হবে। আর সে সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে সরে আছে।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭২)

وَمَا تُقَدِّمُوْا لاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○ (البقرة : ١١٠)

"তোমরা নিজেদের জন্যে এ দুনিয়া থেকে যেসব নেকী পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে ঠিক তা-ই পাবে। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সবই দেখেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১১০)

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ قف ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُوَ لاَيُظْلَمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٨١)

"সে দিনকে ভয় করো যে দিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। অতপর প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের বদলা পাবে এবং তাদের প্রতি কখনোই যুলুম করা হবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮১)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ

"সে দিন প্রত্যেকেই তার কৃত নেকী এবং তার কৃত বদীকে উপস্থিত পাবে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩০)

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ ج فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَظْلِمُوْنَ○(الاعراف : ٨-٩)

"সেদিন যাবতীয় কৃতকর্মের (আমলের) পরিমাপ এক ধ্রুব সত্য। যাদের আমলের পাল্লা ভারী হবে, কেবল তারাই কল্যাণ লাভ করবে আর যাদের আমলের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে নিজেদের ক্ষতিসাধনকারী। কেননা তারা আমাদের আয়াতের প্রতি যুলুম করছিলো।"

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ط○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ○

"যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও নেক কাজ করবে তার প্রতিফল সে দেখতে পাবে, আর যে অণু পরিমাণও পাপ করবে, তার প্রতিফলও সে দেখতে পাবে।"–(সূরা আয যিলযাল ঃ ৭-৮)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج○

"আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেছেন এবং বলেছেন, আমি তোমাদের কোন আমলকারীর আমলকেই নষ্ট হতে দেবো না—সে পুরুষই হোক কিংবা নারী।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৫)

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ لا فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ○ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ط-(المنافقون : ١٠-١١)

"আমরা তোমাদেরকে যাকিছু দান করেছি, তা থেকে খরচ করো, তোমাদের ভেতরকার কারো মৃত্যু আসার পূর্বে। যখন সে বলবে ঃ হে আমার প্রভু ! তুমি যদি আমাকে আর কিছুটা সময় দান করতে তাহলে তোমার পথে আমি খরচ করতাম এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। কিন্তু কারোর নির্ধারিত সময় আসার পর আল্লাহ তাকে কখনোই সময় দান করেন না।"–(সূরা মুনাফিকুন ঃ ১০-১১)

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط رَبَّنَا اَبْصَرْنَا
وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوْقِنُوْنَ ○..... فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ج اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"হায় ! সেই সময়টা যদি তুমি দেখতে যখন অপরাধী তার প্রভুর সামনে অবনত মস্তকে দাঁড়াবে এবং বলবে ঃ হে আমাদের পরোয়ারদেগার ! এবার আমরা দেখে নিয়েছি এবং শুনতেও পেয়েছি ; এক্ষণে তুমি আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও, আমরা ভালো কাজ করবো, এবার আমরা প্রত্যয় লাভ করেছি। .... কিন্তু বলা হবে ঃ এবার তোমরা সেই গাফলতের স্বাদ গ্রহণ করো, যে কারণে তোমরা এই দিনে আমাদের সামনে হাযির হওয়ার ব্যাপারকে ভুলে গিয়েছিলে। আজকে আমরাও তোমাদেরকে ভুলে গেছি। সুতরাং তোমরা যে 'আমল' করতে, তার বিনিময়ে আজ চিরস্থায়ী আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।"–(সূরা আস সাজদা ঃ ১২-১৪)

এখানে বলা হয়েছে যে, দুনিয়া হচ্ছে কাজের ক্ষেত্র ; চেষ্টা ও সাধনার স্থান। আর পরকালীন জীবন হচ্ছে প্রতিফল লাভের ক্ষেত্র ; নেকী ও বদীর ফল এবং কৃতকর্মের প্রতিদান পাবার স্থান। মানুষ তার মৃত্যু সময় পর্যন্ত দুনিয়ায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। এরপর সে কখনো আর কাজের সুযোগ পাবে না। সুতরাং এই জীবনে তাকে একথা স্মরণ রেখে কাজ করতে হবে যে, আমার প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ এবং ভালোমন্দ প্রতিটি আমলেরই একটি নিজস্ব প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে এবং সেই প্রভাব ও গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি পরকালীন জীবনে ভালো বা মন্দ ফল লাভ করব। আমি যা কিছু পাবো তা তার এই জীবনের প্রয়াস-প্রচেষ্টা এবং এখানকার কাজেরই প্রতিফল হিসেবে পাবো ; আমার কোন নেকী না বিনষ্ট হবে আর না কোন পাপকে ছেড়ে দেয়া হবে।

ব্যক্তিগত দায়িত্ব

এই দায়িত্বানুভূতিকে অধিকতর জোরদার করে তোলার জন্যে এ-ও বলে দেয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব কাজের জন্যে দায়িত্বশীল। তার এই দায়িত্বের ব্যাপারে না অন্য কেউ অংশীদার রয়েছে, আর না কেউ কাউকে তার কাজের ফল হতে বাঁচাতে পারে।

عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ ط (المائدة : ١٠٥)

"তোমাদের ওপর তোমাদের আপন সত্তার দায়িত্ব রয়েছে। তোমরা যদি হেদায়াত পাও তাহলে অপর কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি তোমাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে না।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১০৫)

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلاَّ عَلَيْهَا ج وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ج

"প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু অর্জন করে, তার বোঝা তারই ওপর ন্যস্ত ; কেউ কারো বোঝা বহন করে না।"–(সূরা আল আন'আম ঃ ১৬৪)

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلاَ اَوْلاَدُكُمْ ج يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ط
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○(الممتحنة : ٣)

"কেয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং তোমাদের সন্তানাদি কোনই আজে আসবে না। সেদিন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করবেন, আর তাঁর দৃষ্টি রয়েছে তোমাদের আমলের প্রতি।"
–(সূরা মুমতাহিনা ঃ ৩)

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ قف وَاِنْ اَسَاْتُمْ فَلَهَا ط

"তোমরা নেক কাজ করলে নিজেদের জন্যেই করবে আর দুষ্কর্ম করলে তাও নিজেদের জন্যে।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭)

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لاَيُحْمَلْ مِنْهُ
شَىْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى ط -(فاطر : ١٨)

"কোন ব্যক্তি অন্য কারোর গোনাহর বোঝা মাথায় নিবে না ; যদি কারোর ওপর গোনাহর বড়ো বোঝা চেপে থাকে এবং সে সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্যে কাউকে ডাকে, তবে সে তার বোঝার কোন অংশই নিজের মাথায় তুলে নিবে না—সে আত্মীয়-স্বজনই হোক না কেন।"
–(সূরা আল ফাতের ঃ ১৮)

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لاَّيَجْزِىْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلاَ
مَوْلُوْدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ط

"হে মানব জাতি! আপন প্রভুকে ভয় করো আর সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন না কোন পিতা তার পুত্রের কাজে আসবে আর না পুত্র তার পিতার কিছুমাত্র কাজে আসবে।"–(সূরা লোকমান ঃ ৩৩)

مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ۝

"যে ব্যক্তি কুফরী করেছে তার কুফরীর বোঝা তারই ওপর ন্যস্ত, আর যে ব্যক্তি নেক কাজ করলো সে ধরনের লোকেরাই নিজেদের কল্যাণের জন্যে রাস্তা পরিষ্কার করছে।"–(সূরা আর রূম ঃ ৪৪)

এখানে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষের ওপরই তার ভালো ও মন্দ কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। এর ভেতরে না এ আশা পোষণের কোন সুযোগ রাখা হয়েছে যে, আমাদের দোষ-ত্রুটি বা গাফলতির কেউ কাফ্ফারা আদায় করবে, আর না এ প্রত্যাশার কোন অবকাশ রয়েছে যে, কারো কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্কের কারণে আমরা আমাদের অপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি পাবো এবং এ আশংকারও কোন সুযোগ রাখা হয়নি যে, কারো দুষ্কৃতি আমাদের নেক কাজকে প্রভাবিত করবে, কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি আমাদের আমলের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির ওপর প্রভাবশীল হতে পারে। কেউ আগুনে হাত প্রদান করলে তার স্বাভাবিক দাহ থেকে কোন জিনিস তাকে রক্ষা করতে পারে না। আবার কেউ মধু পান করলে তার মিষ্ট স্বাদ উপলব্ধি থেকেও কোন জিনিস তাকে বাধা দিতে পারে না। না দহনের জ্বালা ভোগের ব্যাপারে কেউ কারো শরীকদার হতে পারে, আর না মিষ্টি স্বাদ গ্রহণে কেউ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে। ঠিক তেমনি পাপের কুফল এবং সৎকাজের সুফলের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিঃসঙ্গ ও অন্য নিরপেক্ষ। সুতরাং দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করার ব্যাপারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই পূর্ণ দায়িত্ববোধ থাকা অপরিহার্য। দুনিয়া ও তার অন্তর্গত বস্তুনিচয় থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এ ভেবে তার জীবন যাপন করা উচিত যে, তার প্রতিটি কাজের জন্যে সে নিজেই দায়িত্বশীল ; পাপের বোঝাও তার একার ওপরই ন্যস্ত, আর সৎকাজের ফায়দাও সে একাকীই ভোগ করবে।

ওপরে পার্থিব জীবন সম্পর্কিত ইসলামী ধারণার যে ব্যাখ্যা দান করা হলো তাতে তার বিভিন্ন অংশ ও উপাদানগুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। এখন তার গঠন ও বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক এবং বিক্ষিপ্ত অংশগুলোর সমন্বয়ের ফলে যে পূর্ণাঙ্গ ধারণাটি গড়ে উঠে তা কতখানি প্রকৃতি ও বাস্তবের সাথে সংগতিপূর্ণ, পার্থিব জীবন সম্পর্কে অন্যান্য সংস্কৃতিগুলোর ধারণার তুলনায় এর কি মর্যাদা হতে পারে এবং এই জীবন দর্শনের ওপর যে সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তা মানুষের চিন্তা ও কর্মকে কোন্ বিশেষ ছাঁচে ঢালাই করে, তা-ও দেখা যাক।

জীবনের স্বাভাবিক ধারণা

জীবনের স্বাভাবিক ধারণা দুনিয়া এবং দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে অন্যান্য ধর্মগুলো যে ধারণা পেশ করেছে কিছুক্ষণের জন্যে তা আপনার মন থেকে দূর করে দিন। অতপর একজন সূক্ষ্মদর্শী হিসেবে আপনি চারপাশের দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে এই গোটা পরিবেশে আপনার মর্যাদা কি, তা অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করুন। এই পর্যবেক্ষণের ফলে কয়েকটি জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট-ভাবে আপনার চোখে পড়বে।

আপনি দেখতে পাবেন যে, যতগুলো শক্তি আপনি লাভ করেছেন তার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। যে ইন্দ্রিয় শক্তির ওপর আপনার জ্ঞান নির্ভরশীল, আপনার নিকটতম পরিবেশের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। যে অংগ-প্রত্যঙ্গের ওপর আপনার গোটা কর্মকাণ্ড নির্ভরশীল তা মাত্র কতিপয় দ্রব্যকেই তা আয়ত্তাধীন রাখতে পারে। আপনার চারদিকের বেশুমার জিনিস আপনার দেহ এবং শক্তির তুলনায় অনেক বড়ো এবং এসবের মুকাবেলায় আপনার ব্যক্তি সত্তাকে অত্যন্ত তুচ্ছ ও কমজোর বলে মনে হয়। দুনিয়ার এই বিরাট কারখানায় যে প্রচণ্ড শক্তিগুলো ক্রিয়াশীল রয়েছে, তার কোনটাই আপনার আয়ত্তাধীন নয়, বরং ঐ শক্তিগুলোর মুকাবেলায় নিজকে অত্যন্ত অসহায় মনে করেন। দৈহিক দিক থেকে আপনি একটি মধ্যম শ্রেণীর প্রাণী। নিজের চেয়ে ছোট জিনিসের ওপর আপনি বিজয়ী, কিন্তু নিজের চেয়ে বড়ো জিনিসের নিকট আপনি পরাজিত।

কিন্তু আপনার ভেতরকার আর এক শক্তি আপনাকে ঐ সমস্ত জিনিসের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। সেই শক্তির বদৌলতেই আপনি সম জাতীয় সমস্ত প্রাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং আপনার চেয়ে তাদের দৈহিক শক্তি অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে কর্তৃত্বাধীন করে নেন। সেই শক্তির দরুনই আপনি আপনার চারপাশের বস্তুনিচয়কে ভোগ-ব্যবহার করে থাকেন এবং ঐগুলো থেকে আপন মর্জী মাফিক সেবা গ্রহণ করেন। সেই শক্তির বদৌলতেই আপনি শক্তির নব নব উৎসের সন্ধান পান এবং সেগুলোকে বের করে নিয়ে নতুন নতুন পদ্ধতিতে ব্যবহার করেন। সেই শক্তির দরুনই আপনি জ্ঞান অর্জনের উপায়-উপাদানসমূহ বৃদ্ধি করেন এবং যে সকল বস্তু আপনার স্বাভাবিক শক্তির আওতা বহির্ভূত সেগুলো পর্যন্ত উপনীত হন। মোটকথা, ঐ বিশেষ শক্তিটির বদৌলতে দুনিয়ার সকল বস্তুই আপনার খাদেমে পরিণত হয় এবং আপনি তাদের খেদমত গ্রহণকারীর সৌভাগ্য অর্জন করেন।

আবার বিশ্ব কারখানার যে সকল উচ্চতর শক্তি আপনার আয়ত্তাধীন নয়, সেগুলোও এমনি ধারায় কাজ করে চলছে যে, সাধারণভাবে সেগুলোকে আপনার

শত্রু বা বিরোধী বলা চলে না, বরং তারা আপনার মদদগার এবং আপনার কল্যাণ ও সুযোগ-সুবিধার অনুকূল। হাওয়া, পানি, আলো, উত্তাপ এবং এই ধরনের আর যেসব শক্তির ওপর আপনার জীবন নির্ভরশীল তার সবগুলোই এমন একটি বিশেষ নিয়মের অধীন কাজ করে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনার সাহায্য করা। এই হিসেবে আপনি বলতে পারেন যে, উল্লেখিত বস্তু-গুলো আপনার অনুগত।

এই গোটা পরিবেশের ওপর আপনি যখন গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেন তখন এক মহাশক্তিশালী বিধানকে আপনি ক্রিয়াশীল দেখতে পান। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু থেকে শুরু করে বৃহৎ হতে বৃহত্তর সকল বস্তুই এই শক্তিধর বিধানের অক্টোপাশে সমানভাবে আবদ্ধ। এরপরও তার শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণের ওপর সমগ্র আলমের স্থিতি একান্তভাবেই নির্ভরশীল। আপনি নিজেও সেই বিধানের অধীন। কিন্তু আপনি এবং দুনিয়ার অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য বস্তুগুলোর ঐ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করার অণু পরিমাণও ক্ষমতা নেই। কিন্তু তার বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং আপনি যখন তার বিরুদ্ধাচরণ করতে চান, তখন এ কাজে সে আপনার সাহায্যও করে থাকে। অবশ্য এমন প্রতিটি বিরুদ্ধাচরণই সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা প্রতিক্রিয়া রেখে যায় এবং সে বিরুদ্ধাচরণের পর তার মন্দ পরিণতি থেকে আপনিও বাঁচতে পারেন না।

এই বিশ্বব্যাপী ও অপরিবর্তনীয় বিধানের অধীনে সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিভিন্ন দৃশ্য আপনারা দেখতে পান। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ভাঙা ও গড়ার এক অসমাপ্য ধারা অব্যাহত রয়েছে। যে বিধান অনুযায়ী একটি জিনিস পয়দা ও প্রতিপালন করা হয়, সেই বিধান অনুসারেই তাকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্নও করে দেয়া হয়। দুনিয়ার কোন বস্তুই সেই বিধানের বাঁধন থেকে মুক্ত নয়। দৃশ্যত যে বস্তুনিচয়কে এথেকে মুক্ত বলে মনে হয় এবং যেগুলোকে অচল-অনড় বলে সন্দেহ হয়, সেগুলোকেও গভীরভাবে নিরীক্ষা করলে বোঝা যায় যে, তাদের মধ্যেও আবর্তন ও পরিবর্তনের ক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে এবং সৃষ্টি ও ধ্বংসের কবল থেকে তাদেরও নিস্তার নেই। যেহেতু বিশ্বপ্রকৃতির অন্যান্য বস্তু চেতনা ও বোধশক্তি সম্পন্ন নয় অথবা ন্যূনকল্পে এ সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই, এ জন্যেই আমরা তাদের ভেতরে এই সৃষ্টি ও ধ্বংসের ফলে কোন আনন্দ বা বিষাদের লক্ষণ অনুভব করি না। জীব জগতে তার লক্ষণ অনুভূত হলেও তা খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু মানুষ এক চেতনা ও বোধশক্তি সম্পন্ন প্রাণী বিধায় তার চারপাশের এই পরিবর্তনগুলো দেখে সে আনন্দ ও বিষাদের এক তীব্র প্রতিক্রিয়া অনুভব করে। কখনো অনুকূল বিষয়ের প্রকাশ দেখে এতো তীব্র

আনন্দানুভব করে যে, এ দুনিয়ায় যে ধ্বংসেরও সম্ভাবনা রয়েছে, একথাটাই সে ভুলে যায়। আবার কখনো প্রতিকূল বিষয় দেখে তার বিষাদ এতোটা তীব্র হয়ে ওঠে যে, এ দুনিয়ায় শুধু ধ্বংস আর ধ্বংসই সে দেখতে পায় এবং এখনো যে সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে সে সত্যটা সে ভুলে যায়।

কিন্তু আপনার ভেতর আনন্দ ও বিষাদের যতো পরস্পর বিপরীত অনুভূতিই থাকুক না কেন এবং তার প্রভাবে দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে আপনি যতোই কড়াকড়ি বা বাড়াবাড়ির দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করুন না কেন, এই দুনিয়াকে কার্যত ভোগ-ব্যবহার করতে এবং আপনার ভেতরকার শক্তিনিচয়কে কাজে লাগাতে আপনি নিজস্ব প্রকৃতির কারণেই বাধ্য। আপনার প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার আকাংখা রয়েছে এবং এ আকাংখাকে চরিতার্থ করার জন্যে আপনার ভেতর ক্ষুধা নামক এক প্রচণ্ড শক্তি দেয়া হয়েছে যা আপনাকে হামেশা কাজের জন্যে উদ্বুদ্ধ করছে। প্রকৃতি আপনাকে আপনার বংশধারা বাঁচিয়ে রাখার কাজে নিয়োজিত করতে ইচ্ছুক ; এই জন্যে সে যৌনচেতনা নামক এক অদম্য শক্তি আপনার ভেতর সঞ্চার করেছে, যা আপনার দ্বারা তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে অনুপ্রাণিত করে। এমনিভাবে আপনার স্বভাব-প্রকৃতিতে অন্যান্য উদ্দেশ্যে আরো কতিপয় শক্তির সমাবেশ করা হয়েছে এবং তার প্রতিটি শক্তিই আপনার দ্বারা নিজ নিজ অভীষ্ট পূর্ণ করে নেয়ার চেষ্টা করে। প্রকৃতির এই বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্য আপনি উৎকৃষ্টভাবে আঞ্জাম দেবেন কি নিকৃষ্টভাবে, সানন্দচিত্তে নিষ্পন্ন করবেন কি জোর-জবরদস্তির চাপে তা সম্পূর্ণত আপনার জ্ঞান-বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করে। শুধু তাই নয় খোদ প্রকৃতি আপনার ভেতর ঐ উদ্দেশ্যগুলো পূর্ণ করার কাজ আঞ্জাম দেয়া বা না দেয়ার এক বিশেষ ক্ষমতা পর্যন্ত প্রদান করেছে। কিন্তু সেই সংগে প্রকৃতি এই বিধানও করে দিয়েছে যে, সানন্দচিত্তে ও ভালোভাবে তার উদ্দেশ্য পূরণ করা আপনার জন্যেই কল্যাণকর এবং তা পূরণ করতে পরান্মুখ হওয়া কিংবা পূর্ণ করলেও নিকৃষ্টভাবে করা খোদ আপনার পক্ষেই ক্ষতিকর।

বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের ধারণা

একজন সুষ্ঠু প্রকৃতি ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি দৃকপাত করলে এবং এই দুনিয়ার প্রেক্ষিতে নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে ওপরে বর্ণিত প্রতিটি বিষয়ই তার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। কিন্তু মানব জাতির বিভিন্ন দল এই গোটা দৃশ্যটিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখেছেন এবং প্রায়শ এমনি ব্যাপার ঘটেছে যে, যাদের চোখে যে দিকটি উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতেই তারা পার্থিব জীবন সম্পর্কে একটি মতবাদ গড়ে নিয়েছেন এবং অন্যান্য দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা পর্যন্ত করেননি।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, একটি দল মানুষের দুর্বলতা ও অসহায়তা এবং তার মুকাবেলায় প্রকৃতির বড়ো শক্তিগুলোর প্রভাব ও পরাক্রম দেখে.এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, দুনিয়ায় মানুষ নিতান্তই একটি তুচ্ছ জিনিস আর দুনিয়ার এই মংগলকারী ও ক্ষতিকারক শক্তিগুলো কোন বিশ্বব্যাপী বিধানের অধীন নয় বরং এরা স্বাধীন কিংবা আধা স্বাধীন। এই চিন্তাধারা তাদের মনের ওপর এতখানি প্রাধান্য বিস্তার করেছে যে, যে দিকটার কারণে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ওপর মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, তাদের দৃষ্টিপথ থেকেই তা অপসৃত হয়ে গেছে। তারা আপন অস্তিত্বের উজ্জ্বল দিকটি ভুলে গেলেন এবং নিজেদের কমজোরী ও অক্ষমতার আতিশয্যপ্রসূত স্বীকৃতির দ্বারা তাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের অনুভূতিকে বিসর্জন দিলেন। মূর্তি পূজা, বৃক্ষ পূজা, নক্ষত্র পূজা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা এই মতবাদেরই প্রত্যক্ষ ফল।

আর একটি দল দেখতে পেলেন যে, দুনিয়ায় শুধু বিপর্যয়েরই লীলাভূমি। সমস্ত বিশ্ব সংসার চালিত হচ্ছে শুধু মানুষের দুঃখ-কষ্ট আর নিগ্রহ ভোগের জন্যে। দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক সম্বন্ধই হচ্ছে মানুষকে অশান্তি আর বিপদের জালে জড়িত করার ফাঁদ বিশেষ। কেবল মানুষের কথাই বলি কেন, গোটা বিশ্বজাহানই এই বিষাদ ও ধ্বংসের কবলে আবদ্ধ। এখানে যা কিছু সৃষ্টি হয়, ধ্বংসের জন্যেই হয়। বসন্ত আসে এই জন্যে যে, শীত এসে তার শ্যামলিমা হরণ করে নিয়ে যাবে। জীবনের বৃক্ষ পল্লবে সুশোভিত হয় এই জন্যে যে, মৃত্যুরূপ শয়তান এসে তার মজা লুণ্ঠন করবে। স্থিতির সৌন্দর্য এতো পরিপাট্য নিয়ে আসে এই জন্যে যে, ধ্বংসের দেবতা তার সঙ্গে খেলা করার বেশ সুযোগ পাবে। এ মতবাদ ঐ লোকগুলোর জন্যে দুনিয়া এবং তার জীবনে কোন আকর্ষণই অবশিষ্ট রাখেনি। তারা সংসার ত্যাগ, আত্মপীড়ন ও কৃচ্ছ্রসাধনা করে নিজেদের ভেতরকার সমস্ত অনুভূতিকে বিলুপ্ত করা এবং প্রকৃতির বিধান শুধু নিজের কারখানা চালিত করার জন্যে মানুষকে উপকরণে পরিণত করেছে সে বিধানটিকে ছিন্ন করার মধ্যেই তারা মুক্তির পথ দেখতে পেয়েছে।

অন্য একটি দল দেখলো, দুনিয়ায় মানুষের জন্যে আনন্দ ও বিলাসের প্রচুর উপকরণ রয়েছে এবং মানুষ এক স্বল্প সময়ের জন্যে এর রসাস্বাদনের সুযোগ পেয়েছে। দুঃখ ও বিষাদের অনুভূতি এই রস্বাসাদনকে বিস্বাদ করে দেয় সুতরাং মানুষ ঐ অনুভূতিটাকে বিলুপ্ত করে দিলে এবং কোন জিনিসকেই নিজের জন্যে দুঃখ ও বিষাদের কারণ হতে না দিলে এখানে শুধু আনন্দ আর ফূর্তিই দেখা যাবে। মানুষের জন্যে যা কিছু রয়েছে এই দুনিয়াতেই রয়েছে ; তার যা কিছু মজা লটার এই পার্থিব জীবনেই লুটতে হবে। মৃত্যুর পর না মানুষ থাকবে আর না থাকবে দুনিয়া বা তার আনন্দ-স্ফূর্তি, সবকিছুই যাবে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে।

এর বিপরীত আরেকটি দল এমন রয়েছে, যারা দুনিয়ার আনন্দ-স্ফূর্তি এমন কি গোটা দুনিয়াবী জিন্দেগীকেই সম্পূর্ণ গুনাহ্ বলে মনে করে। তাদের মতে মানবীয় আত্মার জন্যে দুনিয়ার বস্তুগত উপকরণগুলো হচ্ছে এক প্রকার নাপাকী—অশুচিতার শামিল। এই দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করা, এর কায়-কারবারে অংশগ্রহণ করা এবং এর আনন্দ স্ফূর্তির রসাস্বাদন করার ভেতরে মানুষের জন্যে কোন পবিত্রতা বা কল্যাণ নেই। যে ব্যক্তি আসমানী রাজত্বের দ্বারা সৌভাগ্যবান হতে চায়, দুনিয়া থেকে তার দূরে থাকাই উচিত। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার দৌলত ও হুকুমাত এবং পার্থিব জীবনের রসাস্বাদন করতে চায়, তার নিশ্চিত জেনে রাখা উচিত যে, আসমানী রাজত্বে তার জন্যে কোন স্থান নেই। এ দলটি এ-ও অনুভব করেছে যে, মানুষ তার নিজস্ব স্বভাব-প্রকৃতির তাগিদেই দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করতে এবং তার কায়-কারবারে লিপ্ত হতে বাধ্য ; আসমানী রাজত্বে প্রবেশ করার কল্পনা যতোই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, তা এতখানি শক্তিশালী কিছুতেই হতে পারে না যে, তার ওপর নির্ভর করে মানুষ তার প্রকৃতির মুকাবেলা করতে পারে। তাই আসমানী রাজত্ব অবধি পৌঁছার জন্যে তারা একটি সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে, আর তাহলো এই যে, এক বিশেষ সত্তার প্রতি যারা ঈমান আনবে, তাঁর প্রায়শ্চিত্তই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবে।

অপর একটি দল প্রাকৃতিক আইনের ব্যাপকতা দেখে মানুষকে নিছক এক অক্ষম ও দুর্বল সত্তা বলে মনে করে নিয়েছে। তারা দেখেছে যে, মানুষ যে আদৌ কোন স্বাধীন ও অনন্যপর সত্তা নয়, মনস্তত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এবং উত্তরাধিকার আইনের সাক্ষ্য এই সত্যকেই প্রতিপন্ন করেছে। প্রাকৃতিক আইন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এ আইনের বিরুদ্ধে সে না কিছু ভাবতে পারে, না পারে কোন জিনিসের ইচ্ছা পোষণ করতে, আর না রাখে সে কোন কাজ করার ক্ষমতা। সুতরাং তার ওপর তার কোন কাজের দায়িত্ব আরোপিত হয় না।

এর সম্পূর্ণ বিপরীত আর একটি দলের মতে মানুষ শুধু এক ইচ্ছা শক্তিসম্পন্ন সত্তাই নয়, বরং সে কোন উচ্চতর ইচ্ছাশক্তির অধীন বা অনুগতও নয়, আর না সে আপন কৃতকর্মের জন্যে নিজের বিবেক বা মানবীয় রাজ্যের আইন-কানুন ছাড়া অন্য কারোর সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। সে হচ্ছে এই দুনিয়ার মালিক। দুনিয়ায় সমস্ত জিনিস তারই অধীন। তার ইখতিয়ার রয়েছে এগুলোকে স্বাধীনভাবে ভোগ-ব্যবহার করার। নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলার এবং নিজের আমল ও আচরণে এক সুষ্ঠু নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখার জন্যে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে সে নিজেই বিধি-নিষেধ আরোপ করে নিয়েছে।

কিন্তু সামগ্রিক দিক দিয়ে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এ ব্যাপারে কোন উচ্চতর সত্তার সামনে জবাবদিহি করার ধারণাও সম্পূর্ণ অবান্তর।

এই হচ্ছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শের বিভিন্ন রূপ ধারণা। এর বেশীর ভাগ ধারণার ভিত্তিতেই বিভিন্ন রূপ সংস্কৃতির ইমারত গড়ে উঠেছে। বস্তুর বিভিন্ন সংস্কৃতির ইমারতে যে বিভিন্ন ধরন ও প্রকৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাদের এক বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্ররূপ গ্রহণের প্রকৃত কারণ এই যে, তাদের মূলে রয়েছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে এক বিশেষ ধারণা। এই ধারণাই এই বিশিষ্ট রূপ গ্রহণের দাবী জানিয়ে থাকে। আমরা যদি এর প্রত্যেকটি বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করে কিভাবে এটা এক বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির জন্ম দিল তা অনুসন্ধান করি, তবে তা হবে নিসন্দেহে এক মনোজ্ঞ আলোচনা। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এরূপ আলোচনার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ আমরা চাই শুধু ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্টরূপে তুলে ধরতে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, জীবন সম্পর্কে যতগুলো ধারণা ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে, তার সবই দুনিয়াকে এক একটি বিশেষ দিক থেকে দেখার ফলমাত্র। এর কোন একটি মতবাদ ও সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিশ্বজাহানের ওপর পূর্ণ দৃষ্টিপাত করে এবং এই দুনিয়ায় সবকিছুর মধ্যে সঠিক মর্যাদা নিরূপণ করার পর গড়ে ওঠেনি। এ কারণেই আমরা যখন কোন বিশেষ দৃষ্টিকোণ বর্জন করে অন্য কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দুনিয়াকে নিরীক্ষণ করি, তখন প্রথমোক্ত দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা মতবাদটি বাতিল ও ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়। আর দুনিয়ার প্রতি সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে তো সকল মতবাদের ভ্রান্তিই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইসলামী ধারণার বৈশিষ্ট্য

এখন অতি সুন্দরভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত মতবাদের মধ্যে ইসলামী মতবাদই হচ্ছে প্রকৃতি ও বাস্তব সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল। একমাত্র এই মতবাদেই দুনিয়া এবং মানুষের মধ্যে এক নির্ভুল সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। এর ভেতরেই আমরা দেখতে পাই ঃ দুনিয়া কোন ঘৃণ্য বা বর্জনীয় জিনিস নয়, অথবা মানুষ এর প্রতি আসক্ত হবে এবং এর আনন্দ উপকরণের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে, এ এমন কোন জিনিসও নয়। এখানে না পুরোপুরি গঠন ক্রিয়া চলছে, আর না চলছে এক তরফা বিপর্যয়। একে পরিহার করা যেমন সংগত নয়, তেমনি এর ভেতরে পুরোপুরি ডুবে থাকাও সমীচীন নয়। না সে পুরোপুরি পংকিল ও অপবিত্র, আর না তার সবটাই পবিত্র ও পংকিলতা মুক্ত। এই দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক আপন রাজত্বের সাথে কোন বাদশাহর সম্পর্কের মতোও নয়। কিংবা জেলখানার সাথে কয়েদীর যে সম্পর্ক সেরূপ সম্পর্কও নয়। মানুষ এতটা তুচ্ছ নয় যে,

দুনিয়ার যে কোন শক্তিই তার সেজদার উপযোগী হবে অথবা সে এতখানি শক্তিধর ও ক্ষমতাবানও নয় যে দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের কাছ থেকেই সে সেজদা লাভ করবে। না সে এতটা অক্ষম ও অসহায় যে, তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অভিপ্রায়ের কোন মূল্যই নেই, আর না সে এতখানি শক্তিমান যে, তার ইচ্ছা প্রবৃত্তিই সবকিছুর উর্ধে। সে যেমন বিশ্বপ্রকৃতির একচ্ছত্র সম্রাট নয়, তেমনি কোটি কোটি মনিবের অসহায় গোলামও নয়। এই চরম প্রান্তগুলোরই মধ্যবর্তী এক অবস্থায় তার প্রকৃত স্থান।

এ পর্যন্ত তো প্রকৃতি ও সুষ্ঠু বিবেক আমাদের পথনির্দেশ করে। কিন্তু ইসলাম আরো সামনে এগিয়ে মানুষের যথার্থ মর্যাদা কি তা নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করে দেয়। সে বলে দেয় ঃ মানুষ এবং দুনিয়ার মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ? মানুষ দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করবে কি ভেবে ? সে এই বলে মানুষের চোখ খুলে দেয় যে, তুমি অন্যান্য সৃষ্টির মতো নও। বরং তুমি দুনিয়ায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দায়িত্বশীল প্রতিনিধি (Viceroy)। দুনিয়া ও তার শক্তিগুলোকে তোমারই অধীন করে দেয়া হয়েছে। তুমি সবার শাসক, কিন্তু একজনের শাসিত ; সকলের প্রতি আজ্ঞাকারী, শুধু একজনের আজ্ঞানুবর্তী। সমগ্র সৃষ্টির ওপরে তোমার সম্মান, কিন্তু যিনি তোমায় প্রতিনিধিত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে দুনিয়ায় এ সম্মান দান করেছেন, তুমি যখন তার অধীন ও আজ্ঞানুবর্তী হবে এবং তাঁর দেয়া বিধি-বিধানের আনুগত্য করে চলবে কেবল তখনি তুমি এ সম্মানের অধিকারী হতে পারো। দুনিয়ায় তোমায় পাঠানো হয়েছে এই জন্যে যে, তুমি তাকে ভোগ-ব্যবহার করবে। তারপর এই দুনিয়ার জীবনে তুমি ভাল-মন্দ বা শুদ্ধ-অশুদ্ধ যা কিছুই কাজ করো না কেন, তার ভিত্তিতেই তুমি পরকালীন জীবনে ভাল বা মন্দ ফল দেখতে পাবে। সুতরাং দুনিয়ায় এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে তোমার ভেতরে হামেশা ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও জবাবদিহির অনুভূতি জাগ্রত থাকা উচিত এবং যে বস্তুনিচয়কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে তোমার কাছে আমানত রেখেছেন, তার প্রতিটি জিনিস সম্পর্কেই পুংখানুপুংখ হিসেব গ্রহণ করা হবে—একথাটি মুহূর্তের তরেও বিস্মৃত না হওয়া উচিত।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই ধারণাটি বিস্তৃত ও পুংখানুপুংখরূপে প্রত্যেক মুসলমানের মনে জাগরুক নেই। এমন কি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশ ছাড়া আর কেউ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাও পোষণ করে না। কিন্তু এই ধারণাটি যেহেতু ইসলামী সংস্কৃতির মর্মমূলে নিহিত রয়েছে, এ জন্যেই মুসলমানের চরিত্র তার প্রকৃত মর্যাদা ও যথার্থ বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক দূরে সরে গেলেও আজো তারা তার প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হয়নি। যে মুসলমান

ইসলামী সংস্কৃতির আওতায় প্রতিপালিত হয়েছে, তার আচরণ ও কাজ-কর্ম বাইরের প্রভাবে যতোই নিকৃষ্ট হয়ে থাক না কেন, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান বোধ, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো সামনে মাথা নত না করা, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় না করা, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকে মালিক ও মনিব না ভাবা, দুনিয়ায় নিজেকে ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বশীল মনে করা, দুনিয়াকে কাজের ক্ষেত্র এবং পরকালকে প্রতিফলের ক্ষেত্র বলে বিশ্বাস করা, নিছক ব্যক্তিগত আমলের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ওপর পরকালীন সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভরশীল বলে ধারণা পোষণ করা, দুনিয়া এবং তার দৌলত ও ভোগ উপকরণকে অস্থায়ী এবং শুধু ব্যক্তিগত আমল ও তার ফলাফলকে চিরস্থায়ী মনে করা—এই জিনিস-গুলো তার প্রতিটি ধমণীতে অনুপ্রবিষ্ট হবেই। আর একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি তার কথাবার্তা ও কর্মতৎপরতার ভেতর তার আত্মা ও হৃদয়ের গভীরে বদ্ধমূল ঐ আকিদা ও বিশ্বাসের প্রভাব (তা যতোই ক্ষীণ হোক না কেন) অনুভব করবেই।

ইসলামী সংস্কৃতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে কোন ব্যক্তি এ সত্যটি স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারবে যে, এর ভেতরে যতদিন পূর্ণাঙ্গ অর্থে সত্যিকার ইসলাম বর্তমান ছিলো, ততদিন এ একটি নির্ভেজাল বাস্তব সংস্কৃতি ছিলো। এর অনুবর্তীদের কাছে দুনিয়া ছিল আখেরাতেরই ক্ষেত্রস্বরূপ। তারা দুনিয়াবী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এই ক্ষেত্রটির চাষাবাদ, বীজ বপণ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করারই চেষ্টা করতো, যাতে করে পরকালীন জীবনে বেশী পরিমাণে ফসল পাওয়া যেতে পারে। তারা বৈরাগ্যবাদ ও ভোগবাদের মধ্যবর্তী এমন এক সুসম ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় দুনিয়াকে ভোগ-ব্যবহার করতো, অন্য কোন সংস্কৃতিতে যার নাম-নিশানা পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আল্লাহর খেলাফতের ধারণা তাদেরকে দুনিয়ার জীবনে পুরোপুরি লিপ্ত হতে এবং তার কায়-কারবারকে পূর্ণ তৎপরতার সাথে আঞ্জাম দেবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতো এবং সেই সঙ্গে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহির অনুভূতি তাদেরকে কখনো সীমা অতিক্রম করতে দিত না। তাঁরা আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে অত্যন্ত আত্ম-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ছিলেন। আবার এই ধারণাই তাদেরকে দাম্ভিক ও অহংকারী হতে বিরত রাখতো। তাঁরা সুষ্ঠুভাবে খেলাফতের দায়িত্ব সম্পাদনের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রতিটি পার্থিব জিনিসের প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে যে সকল জিনিস দুনিয়ার ভোগাড়ম্বরে আচ্ছন্ন করে মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে ভুলিয়ে রাখে তার প্রতি তাদের কোনই আসক্তি ছিলো না। মোটকথা, দুনিয়ার কায়-কারবার তাঁরা এভাবে সম্পাদন করতো, যেন এখানে তাঁরা চিরদিন থাকবেন না, আবার এর ভোগাড়ম্বরে মশগুল হওয়া থেকে এই ভেবে বিরত

থাকতেন, যেন এ দুনিয়া তাদের জন্যে এক পান্থশালা, সাময়িক কিছুদিনের জন্যেই তারা এখানে বসতিস্থাপন করেছেন মাত্র।

পরবর্তীকালে ইসলামের প্রভাব হ্রাস এবং অন্যান্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় মুসলমানদের চরিত্রে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বৈশিষ্ট্য আর বাকী থাকলো না। এর ফলে তারা পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামী ধারণার যা কিছু বিপরীত তার সব কাজই করলো। তারা বিলাশ-ব্যসনে লিপ্ত হলো। বিশাল ইমারত নির্মাণ করলো। সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য এবং চারুকলার প্রতি আকৃষ্ট হলো। সামাজিকতা ও আচার-পদ্ধতিতে ইসলামী রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যয়-বাহুল্য ও আড়ম্বরে তারা অভ্যস্ত হলো। রাষ্ট্র শাসন ও রাজনীতি এবং অন্যান্য বৈষয়িক ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অনৈসলামী পন্থা অনুসরণ করলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের হৃদয়ে দুনিয়াবী জীবন সম্পর্কে যে ইসলামী ধারণা বদ্ধমূল হয়ে ছিলো, কোথাও না কোথাও তার স্পষ্ট প্রভাব প্রতিভাত হতো। আর এ প্রভাবই অন্যান্যদের মুকাবিলায় তাদের এক বিশিষ্ট মর্যাদা দান করতো। জনৈক মুসলমান বাদশাহ যমুনার তীরে এক বিশাল ইমারত নির্মাণ করেন এবং তার ভেতর আমোদ-প্রমোদ ও জাঁক-জমকের এমন সব আয়োজনই করেন, যা তখনকার দিনে ছিলো চিন্তনীয়। কিন্তু সেই ইমারতের সবচেয়ে আনন্দদায়ক প্রমোদ কেন্দ্রটির পিছন দিকে (অর্থাৎ কেবলার দিকে) এই কবিতাটি খোদাই করা হয়ঃ

"তোমার পায়ে বন্ধন, তোমার দিল্ তালাবদ্ধ,
চক্ষুযুগল অগ্নিদগ্ধ আর পদযুগল কন্টকে ক্ষতবিক্ষত ;
ইচ্ছা তোমার পশ্চিমে সফর করার
অথচ চলেছো পূর্বমুখী হয়ে,
পশ্চাতে মঞ্জিল রেখে কে তুমি চলছো
এখনো সতর্ক হও।"

সে প্রাসাদটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অতুলনীয় ছিল না। তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু দুনিয়ার বুকে বেহেশত নির্মাণকারীদেরকে 'পশ্চাতে মঞ্জিল রেখে কে তুমি চলেছো অনিশ্চিতের দিকে সতর্ক হও' বলে সতর্ক করে দেয়, এমনি চিন্তাধারার নজির দুনিয়ার আর কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যাবে না।[১]

কাইসার ও কিসরার ধরনের বাদশাহী পরিচালনাকারীগণও কোন শত্রুকে পরাজিত করে শক্তির অহমিকা প্রকাশ করার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহর

১. এ হচ্ছে দিল্লীর লাল কেল্লার কথা।

সামনে সেজদায় ভূলুণ্ঠিত হয়েছেন, ইসলামী ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। বড়ো বড়ো অত্যাচারী ও উদ্ধত শাসকরা ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাইলে কোন আল্লাহর বান্দাই তাদেরকে মুখের ওপর শাসিয়ে দেন এবং তার ফলে তারা আল্লাহর ভয়ে কেঁপে ওঠেন। নিতান্ত দুষ্কৃতিকারী ও কদাচারী ব্যক্তিগণও কোন একটি মামুলি কথায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনের রঙ বদলে যায়। পার্থিব ধন-দৌলতের প্রতি মোহগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে দুনিয়ার অস্থায়িত্ব এবং আখেরাতের জিজ্ঞাসাবাদের চিন্তা জাগলো আর অমনি তারা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবকিছু বিলিবন্টন করে দিয়ে এক মধ্যমপন্থী আদর্শ জীবন অবলম্বন করেছেন। মোটকথা, মুসলমানদের জীবনে যতো অনৈসলামী প্রভাবই বিস্তার লাভ করুক না কেন, তাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিকেই ইসলামী মতবাদের দীপ্তি কোন না কোনরূপে আপনার দৃষ্টিগোচর হবেই। আর এটা দেখে আপনার মনে হবে, যেন অন্ধকারের মধ্যে সহসা আলোর প্রকাশ ঘটেছে।

॥ দুই ॥

জীবনের লক্ষ্য

জীবন দর্শনের পর একটি সংস্কৃতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিরূপণ করার জন্যে দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহলো এই যে, সে মানুষের সামনে কোন্ লক্ষ্যবস্তুটিকে পেশ করে? এ প্রশ্নটি এ জন্যে গুরুত্বপূর্ণ যে, মানুষ যে বস্তুটিকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে নির্ধারিত করে নেয় তার যাবতীয় ইচ্ছা-বাসনা ও বাস্তব কর্মপ্রচেষ্টা সেই লক্ষ্যেরই অনুগামী হয়ে থাকে। সেই লক্ষ্যটির বিশুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার ওপরই মানসিকতার ভালো-মন্দ এবং তার জীবন যাত্রা প্রণালীর শুদ্ধি-অশুদ্ধি নির্ভর করে। তার উন্নতি ও অবনতির ওপরই চিন্তা ও ভাবধারার উন্নতি-অবনতি, নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ-অপকর্ষ এবং অর্থনীতি ও সামাজিকতার উন্নতি-অবনতি নির্ভরশীল। এরই সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়ার ওপর মানুষের ইচ্ছা-বাসনা ও চিন্তা-ভাবনার সুসংবদ্ধতা বা বিক্ষিপ্ততা, তার জীবনের যাবতীয় তৎপরতার শৃংখলা বা বিশৃংখলা এবং তার শক্তিক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রতিভার এক কেন্দ্রীকরণ বা বিকেন্দ্রীকরণ নির্ভর করে। এক কথায়, এই জীবন লক্ষ্যের বদৌলতেই মানুষ চিন্তা ও কর্মের বিভিন্ন পথের মধ্যে থেকে একটি মাত্র পথ নির্বাচন করে নেয় এবং তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি, তার বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উপায়-উপকরণকে সেই পথেই নিয়োজিত করে। কাজেই কোন সংস্কৃতিকে নির্ভুল মানদণ্ডে যাচাই করতে হলে তার মূল লক্ষ্য-বস্তুটি অনুসন্ধান করা আমাদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক।

নির্ভুল সামগ্রিক লক্ষ্যের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য

কিন্তু আলোচনা ও অনুসন্ধানের পরে পা বাড়াবার আগে সংস্কৃতির লক্ষ্য বলতে বুঝায়, তা আমাদের নির্ধারণ করে নেয়া উচিত। একথা সুস্পষ্ট যে, আমরা যখন 'সংস্কৃতি' শব্দটা উচ্চারণ করি, তখন তা দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত সংস্কৃতিকে বুঝি না, বরং আমাদের সামগ্রিক সংস্কৃতিকেই বুঝি। এ কারণেই প্রতিটি লোকের ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য সংস্কৃতির লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। কিন্তু এর বিপরীতভাবে একটি সংস্কৃতির যা লক্ষ্যবস্তু হবে, অনুবর্তীদের মধ্যকার প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য হওয়া একান্ত অপরিহার্য—সে সম্পর্কে তাদের চেতনা থাকুক না থাকুক। এই দৃষ্টিতে সচেতনভাবেই হোক আর অবচেতনভাবেই হোক, লোকদের একটি বিরাট দলের সম্মিলিত সামগ্রিক জীবনের লক্ষ্য যা হবে, তাই হচ্ছে সংস্কৃতির লক্ষ্যবস্তু এবং এই লক্ষ্যবস্তুর লোকদের ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্যের ওপর এতোটা প্রাধান্য লাভ করতে হবে যে,

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব জীবন লক্ষ্য হিসেবে এই দলীয় জীবন লক্ষ্যকে গ্রহণ করতে হবে।

এ ধরনের সামগ্রিক জীবন লক্ষ্যের জন্যে একটি অপরিহার্য শর্ত এই যে, লোকদের ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্যের সাথে তার পূর্ণ সংগতি ও সামঞ্জস্য রাখতে হবে এবং তার ভিতরে যুগপৎ ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবন লক্ষ্য হবার মতো যোগ্যতা থাকতে হবে। এ জন্যে যে, সামগ্রিক জীবন লক্ষ্য যদি লোকদের ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্যের প্রতিকূল হয়, তাহলে তার পক্ষে প্রথমতই সামগ্রিক জীবন লক্ষ্য হওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, যে চিন্তাধারাকে লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ না করবে, তা কখনো সামগ্রিক চিন্তাধারার মর্যাদা পেতে পারে না। যদি কোন প্রচণ্ড শক্রর প্রভাবে তা সামগ্রিক জীবন লক্ষ্যে পরিণত হয়ও, তবু ব্যক্তির জীবন লক্ষ্য এবং সমাজের জীবন লক্ষ্যের মধ্যে অবচেতন-ভাবেই একটি সংঘাত চলতে থাকবে। অতপর ঐ বিজয়ী শক্তির প্রভাব হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা আপন আপন জীবন লক্ষ্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে। আর সেই সঙ্গে সমাজের জীবন লক্ষ্য বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সমাজ সত্তার আকর্ষণ ও সংযোগ শক্তি বিলীন হয়ে যাবে এবং পরিণামে সংস্কৃতির নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যাবে। এ জন্যেই মানুষের স্বাভাবিক জীবন লক্ষ্য যা হবে, প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির নির্ভুল লক্ষ্যবস্তু ঠিক তাই হতে পারে। আর কোন সংস্কৃতির আসল বৈশিষ্ট্য এই যে, তাকে এমন একটি সামগ্রিক জীবন লক্ষ্য পেশ করতে হবে, যা হুবহু ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্যও হতে পারে।

এ দৃষ্টিতে আমাদের সামনে দু'টি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় এবং এ দু'টির মীমাংসা ছাড়া আমরা সামনে এগোতে পারি না ঃ

এক ঃ স্বাভাবিকভাবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্য কি ?

দুই ঃ দুনিয়ার অন্যান্য সংস্কৃতিগুলো যে লক্ষ্যবস্তু পেশ করেছে, মানুষের এই স্বাভাবিক জীবন লক্ষ্যের সঙ্গে তা কতখানি সংগতিপূর্ণ ?

মানুষের স্বাভাবিক জীবন লক্ষ্য

মানুষের স্বাভাবিক জীবন লক্ষ্যের প্রশ্নটি এই যে, মানুষ স্বাভাবিকভাবে দুনিয়ায় কি উদ্দেশ্যে চেষ্টা-সাধনা করে এবং তার প্রকৃতি কোন্ জিনিসটি কামনা করে ? এটা জানার জন্যে আপনি যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করেন যে, দুনিয়ায় তার উদ্দেশ্য কি, তাহলে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্নরূপ জবাব পাবেন। এবং নিজেদের লক্ষ্য বাসনা ও আশা আকাংখা সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন, সম্ভবত এমন দু'জন লোকও খুঁজে পাবেন না। কিন্তু সবগুলো জবাবকে বিশ্লেষণ করলে আপনি দেখতে পাবেন যে, লোকেরা যে জিনিসগুলোকে

নিজেদের লক্ষ্য বলে অভিহিত করছে, তা আদপেই কোন লক্ষ্যবস্তু নয়, বরং একটি বিশেষ লক্ষ্যে পৌছার মাধ্যম মাত্র ; আর সে বিশেষ লক্ষ্যটি হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তি। ব্যক্তি বিশেষ যতো উঁচু দরের মননশীল ও বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন হোন, যতো উন্নতমানের সংস্কৃতিবানই হোন, আর জীবনের যে কোন দিক ও বিভাগেই কাজ করুন না কেন, তার যাবতীয় চেষ্টা-সাধনার মূলে একটি মাত্র লক্ষ্যই নিহিত থাকে আর তাহলো এই যে, সে যেন শান্তি, নিরাপত্তা, আনন্দ ও নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে। সুতরাং একে আমরা ব্যক্তি মানুষের স্বাভাবিক জীবন লক্ষ্য বলে অভিহিত করতে পারি।

দু'টি জনপ্রিয় সামগ্রিক লক্ষ্য এবং তার পর্যালোচনা

দুনিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতি যেসব সামগ্রিক লক্ষ্য পেশ করেছে সেগুলোর পুংখানুপুংখরূপ বিচার করলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে বহু পার্থক্য বর্তমান। এখানে তা নির্ণয় করা আমাদের উদ্দেশ্যও নয়, আর তা সম্ভবও নয়। তবে মূলনীতির দিক থেকে সেগুলোকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

এক ঃ যে সংস্কৃতিগুলোর বুনিয়াদ কোন ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ভাবধারার ওপর স্থাপিত নয় সেগুলো তাদের অনুবর্তীদের সামনে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য লাভের লক্ষ্য পেশ করেছে। এই লক্ষ্যটি কতিপয় মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত। এর বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো হচ্ছে এই ঃ

* রাজনৈতিক প্রাধান্য ও আধিপত্য লাভের কামনা।

* ধন-সম্পদে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আকাংখা, তা দেশ জয়ের মাধ্যমে হোক আর শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেই হোক।

* সামাজিক তরক্কীতে সবার চেয়ে অগ্রাধিকার লাভের বাসনা, তা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে হোক আর কৃষ্টি সভ্যতার ক্ষেত্রে শান-শওকতের দিক দিয়ে হোক।

দৃশ্যত এই সামগ্রিক জীবন লক্ষ্য ও উপরোল্লিখিত ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্যের পরিপন্থী নয়। কেননা একথা এতোটুকু চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই বলা যেতে পারে যে, সমাজের জন্যে এ লক্ষ্যবস্তু নিরূপিত হয়ে গেলেই ব্যক্তির জীবন লক্ষ্যও সেই সঙ্গে নির্ণীত হয়ে যায়। এই লক্ষ্যটির এই বাহ্যিক ধাঁধার কারণেই একটি জাতির লক্ষ-কোটি মানুষ তাদের ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্যকে এর ভেতরে বিলীন করে দেয়। কিন্তু দূরদৃষ্টি ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকৃত-পক্ষে এই সামগ্রিক লক্ষ্যবস্তুটি ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন লক্ষ্যের একেবারেই পরিপন্থী। একথা সুস্পষ্ট যে, প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভে ইচ্ছুক জাতি দুনিয়ায় কেবল একটিই নয় বরং একই যুগে একাধিক জাতি এই লক্ষ্যটি পোষণ করে

থাকে এবং তারা সবাই একে অর্জন করার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। এর অনিবার্য ফলে তাদের মধ্যে তীব্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়ে যায়, প্রতিরোধ, প্রতিযোগিতা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক প্রচণ্ড গোলযোগ দেখা যায় আর এই হট্টগোল ও বিশৃংখলার মধ্যে ব্যক্তির শান্তি, স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আজকে আমাদের চোখের সামনে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে ঠিক এই অবস্থাই বিরাজমান। তবু যদি ধরেও নেয়া যায় যে, কোন এক যুগে শুধু একটি মাত্র জাতিই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে সচেষ্ট হবে এবং এ ব্যাপারে অন্য কোন জাতি তার পথে বাধ সাধবে না, তবু এর সাফল্যে লোকদের ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্যের উপস্থিতি সম্ভব নয়। কারণ এরূপ সামগ্রিক লক্ষ্যের.এটা স্বাভাবিক প্রকৃতি যে, এ শুধু আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতারই সৃষ্টি করে না, একটি জাতির আপন লোকদের ভেতরও পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তুলে। এর ফলে অন্য জাতির লোকদের ওপর আধিপত্য বিস্তার, দৌলত, হুকুমত, শক্তি, শান-শওকত ও বিলাস-ব্যসনে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ, অপরের রেযেকের চাবি নিজের কুক্ষিগত করা, অর্থোপার্জনের সকল সম্ভাব্য উপায়-উপকরণের ওপর নিজের একক মনোপলি প্রতিষ্ঠা, লাভ ও স্বার্থটুকু নিজের অংশে এবং ক্ষতি ও ব্যর্থতা অন্যের ভাগে পড়ার কামনা, নিজেকে হুকুমদাতা এবং অন্যকে অধীন ও আজ্ঞানুবর্তী বানিয়ে রাখার প্রচেষ্টা জাতির প্রতিটি ব্যক্তির জীবন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমত এ ধরনের লোকদের কামনা ও বাসনার কোথাও গিয়ে নিবৃত্তি হয় না, এজন্যে হামেশা অস্থির ও অনিশ্চিত থাকে। দ্বিতীয়ত এই শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন একটি জাতির লোকদের মধ্যে পয়দা হয়, তখন তার প্রতিটি গৃহ ও প্রতিটি বাজারই একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ফলে দৌলত, হুকুমত ও বিলাস-ব্যসন যতো বিপুল পরিমাণই সঞ্চিত হোক না কেন, শান্তি ও স্বস্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা, আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য একেবারে দুর্লভ হয়ে দাঁড়ায়।

পরন্তু এটা স্বাভাবিক ব্যাপার যে, খালেছ বৈষয়িক উন্নতি—যাতে আধ্যাত্মিকতার কোন স্থান নেই—মানুষকে কখনো স্বস্তি দান করতে পারে না, কারণ নিছক ইন্দ্রিয়জ আনন্দ লাভ হচ্ছে নিতান্তই এক জৈবিক লক্ষ্য ; আর এ কথা যদি সত্য হয় যে, মানুষ সাধারণ জীব মাত্র নয়, তার স্থান তার চেয়ে উর্ধে তাহলে এটাও নিশ্চিতভাবে সত্য হতে হবে যে, নিছক জৈবিক আকাংখার পরিতৃপ্তির জন্যে যে জিনিসগুলোর রসাস্বাদন যথেষ্ট, কেবল সেগুলো অর্জন করেই মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না।

দুই ঃ যে সংস্কৃতিগুলোর ভিত্তি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ভাবধারার ওপর স্থাপিত তারা সাধারণভাবে মুক্তি বা নাজাতকে নিজেদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা

করেছে। নিসন্দেহে যে আধ্যাত্মিক উপাদান মানুষকে স্বস্তি ও মানসিক প্রশান্তি দান করে, এ লক্ষ্যটির ভেতর তা বর্তমান রয়েছে। আর একথা সত্য যে, মুক্তি যেমন একটা জাতির লক্ষ্যবস্তু হতে পারে, তেমনি পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি ব্যক্তিরও জীবন লক্ষ্য হতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, এটাও আদতে কোন নির্ভুল জীবন লক্ষ্য হতে পারে না। এর কতিপয় কারণ রয়েছে।

প্রথমত, মুক্তির লক্ষ্যের ভেতর এক ধরনের আত্ম-সর্বস্বতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এর প্রকৃতি হলো, সামগ্রিকতাকে দুর্বল করে ব্যক্তিত্বকে সবল করে তোলা। কারণ ব্যক্তি মানুষ যখন কতিপয় বিশেষ কাজ সম্পাদন করেই মুক্তি লাভ করতে পারে, তখন তাকে ব্যক্তি সর্বস্বতার পরিবর্তে সামগ্রিকতার মর্যাদা দান করতে এবং তাকে সুবিন্যস্ত করার জন্যে ব্যক্তিকে সমাজের সাথে একই কর্মনীতি অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, এমন কোন বস্তুই আর এ লক্ষ্যটির ভেতর থাকে না। কাজেই সংস্কৃতির যা আসল লক্ষ্য, এই ব্যক্তি সর্বস্বতার ভাবধারা তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

দ্বিতীয়ত, মুক্তির প্রশ্নটি আসলে মুক্তিলাভের পন্থার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই এ লক্ষ্যটির বিশুদ্ধ বা অশুদ্ধ হওয়া এটি অর্জনের জন্যে উদ্ভাবিত পন্থার বিশুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে ধর্মগুলো সংসার ত্যাগ ও বৈরাগ্যবাদকে মুক্তির পন্থা বলে নির্দেশ করেছে, সেগুলোতে মুক্তি না ব্যক্তিগত জীবন লক্ষ্য হতে পারে, না পারে সামগ্রিক লক্ষ্য হতে। এরূপ ধর্মের অনুগামীগণ শেষ পর্যন্ত দ্বীনকে দুনিয়া থেকে আলাদা করতে এবং দুনিয়াদার লোকদের মুক্তির জন্যে মধ্যবর্তী পন্থা (যেমন দ্বীনদার লোকদের সেবা, প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি) উদ্ভাবনে বাধ্য হয়েছে। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, এ লক্ষ্যটি আর মিলিতভাবে ব্যক্তি ও সমাজের এক অভিন্ন লক্ষ্য থাকেনি। দ্বিতীয়ত, দ্বীনদারদের একটি নগণ্য সংখ্যা ছাড়া গোটা সমাজের জন্যে এই লক্ষ্যের ভেতর এমন কোন মহত্ব, গুরুত্ব, আকর্ষণ শক্তি রইলো না, যা তাকে অক্ষুণ্ন করে রাখতে পারে। এ জন্যে সমগ্র দুনিয়াদার লোকই একে ত্যাগ করে উপরোল্লিখিত বৈষয়িক লক্ষ্যের পানেই ছুটে চলেছে। অন্যদিকে যে ধর্মগুলো মুক্তিকে বিভিন্ন দেবতা ও মাবুদের সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল বলে ঘোষণা করেছে, তাদের মধ্যে অভিন্নতা বজায় থাকে না। বিভিন্ন দল বিভিন্ন মাবুদের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং লক্ষ্যের ভেতরে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং যার সম্পর্ক সূত্র দ্বারা সকল অনুগামীদের গ্রথিত করা সংস্কৃতির আসল কাজ, সেই যথার্থ ঐক্যটিই বাকী থাকে না। তাই এসব ধর্মের অনুসারীরাও পার্থিব

উন্নতির পথে চলতে এবং আপন সমাজকে সুসংবদ্ধ করতে চাইলে ভিন্ন লক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আর এক ধরনের ধর্ম রয়েছে, যার আহ্বান গোটা মানব জাতির প্রতি নয়, বরং কোন বিশেষ বংশ-গোত্র কিংবা কোন বিশেষ ভৌগলিক এলাকায় বসবাসকারী জাতির প্রতি। এবং এই হিসেবে তার দৃষ্টিতে মুক্তি কেবল ঐ বিশেষ গোত্র ও জাতির জন্যেই নির্দিষ্ট। এ লক্ষ্যটি নিসন্দেহে তাহজীব ও তমুদ্দুনের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সার্থক সামগ্রিক লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে। কিন্তু নির্ভুল বিচার-বুদ্ধির মানদণ্ডে এটিও পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় না। বিশেষত মুক্তিটা কোন বিশেষ গোত্রের জন্যে নির্দিষ্ট, একথা মানতে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সম্মত নয়। এ জন্যে এরূপ ধর্মের অনুগামীগণ বুদ্ধিবাদী উন্নতির পথে কয়েক পা বাড়িয়েই এ লক্ষ্যের বিরুদ্ধে নিজেরাই বিদ্রোহ করে বসে এবং তাকে মন থেকে মুছে ফেলে দিয়ে অন্য কোন লক্ষ্য গ্রহণ করে।

তৃতীয়ত, মুক্তির লক্ষ্যটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে যতো পবিত্রই মনে হোক না কেন, পার্থিব দৃষ্টিতে একটি জাতিকে অনুপ্রাণিত করা এবং জাতীয় উন্নতির জন্যে প্রয়োজনীয় চেতনা, উদ্দীপনা, শক্তি ও তৎপরতা সৃষ্টিকারী কোন বস্তুই এর ভেতর পাওয়া যায় না। এ জন্যেই আজ পর্যন্ত কোন উন্নতিকামী জাতি একে নিজের সামগ্রিক লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেনি, বরং যে সমস্ত জাতির ধর্ম এই একটি মাত্র লক্ষ্য পেশ করেছে, তাদের মধ্যে হামেশাই ব্যক্তিগত লক্ষ্যের মর্যাদা পেয়ে আসছে।

এ সকল কারণেই বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় লক্ষ্যই নির্ভুল মানদণ্ডের বিচারে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয় না। এবার ইসলামী সংস্কৃতি কোন্ বস্তুটিকে তার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে এবং তার কোন্ কোন্ স্বভাব-প্রকৃতি তাকে একটি নির্ভুল লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তা-ই আমরা দেখবো।

ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য ও তার বৈশিষ্ট্য

এ আলোচনার সূচনায়ই একথা ভালোমত মনে রাখা দরকার যে, জীবন লক্ষ্যের প্রশ্নটি আসলে জীবন দর্শন সম্পর্কিত প্রশ্নের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। আমরা পার্থিব জীবন সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করি এবং দুনিয়ায় নিজেদের মর্যাদা ও নিজেদের জন্যে দুনিয়ার মর্যাদা সম্পর্কে যে মতবাদটি বিশ্বাস করি, তাই স্বাভাবিকভাবে জীবনের একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে আমাদের তাবৎ শক্তি ক্ষমতাকে নিয়োজিত করে দেই। আমরা যদি দুনিয়াকে একটা চারণক্ষেত্র বলে মনে করি এবং জীবনটাকে শুধু পানাহার আর পার্থিব বিলাস-ব্যসনে পরিতৃপ্তি লাভের একটা অবকাশ বলে

ধারণা করি, তাহলে এ জৈবিক ধারণা নিসন্দেহে আমাদের ভেতর জীবন সম্পর্কে এক জৈবিক লক্ষ্য জাগিয়ে দেবে এবং জীবনভর আমরা শুধু ইন্দ্রিয়জ ভোগোপকরণ সংগ্রহের জন্যেই চেষ্টা করতে থাকবো। পক্ষান্তরে আমরা যদি নিজেদেরকে জন্মগত অপরাধী এবং স্বভাবগত পাপী বলে বিবেচনা করি এবং সেই জন্মগত অপরাধে দুনিয়ার এই কারাগার ও বন্দীশালায় আমাদের নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে ধারণা করে নেই তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি লাভের আকাংখা জাগ্রত হবে এবং এ কারণে মুক্তিকে আমরা আমাদের জীবন লক্ষ্য বলে ঘোষণা করবো। কিন্তু দুনিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণা যদি চারণভূমি আর বন্দীশালা থেকে উন্নততর হয় এবং মানুষ হিসেবে আমরা নিজেদেরকে সাধারণ প্রাণী ও অপরাধীর চেয়ে উচ্চ মর্যাদাবান বলে মনে করি তাহলে নিশ্চিতরূপে বৈষয়িক ভোগোপকরণের সন্ধান ও পরিত্রাণ লাভ— এই উভয় লক্ষ্যের চেয়ে উন্নততর কোন লক্ষ্যেরই আমরা সন্ধান করবো এবং কোন তুচ্ছ বা নগণ্য বস্তুর প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে না।

এ নিয়মটিকে সামনে রেখে আপনি যখন দেখবেন যে, ইসলাম মানুষকে আল্লাহর খলীফা এবং দুনিয়ার বুকে তাঁর প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছে, তখন এই জীবন দর্শন থেকে স্বাভাবিকভাবেই যে লক্ষ্যের সৃষ্টি হতে পারে এবং হওয়া উচিত, আপনার বিবেক-বুদ্ধি স্বভাবতই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে। একজন প্রতিনিধি তার মালিকের সন্তুষ্টি ও রেযামন্দী লাভ করবে এবং তাঁর দৃষ্টিতে একজন উত্তম, অনুগত, বিশ্বস্ত ও কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারী বলে বিবেচিত হবে— এ ছাড়া তার আর কি লক্ষ্য হতে পারে ? সে যদি সত্যনিষ্ঠ ও সদুদ্দেশ্যপরায়ণ হয়, তাহলে মনিবের আজ্ঞাপালনে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া আর কোন বস্তু কি তার উদ্দেশ্য হতে পারে ? সে কি নিজের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি, কোন স্বার্থলাভের আশা, কোন পদোন্নতি বা পুরস্কার লাভ, অথবা খ্যাতি-যশ ও পদমর্যাদা বৃদ্ধির প্রলোভনে পড়ে তার কর্তব্য পালন করবে ? অবশ্য মনিব যদি খুশী হয়ে তাকে এসব দান করেন, সেটা আলাদা কথা। মনিব তাকে সুষ্ঠু খেদমতের বিনিময়ে এগুলো দান করার আশ্বাসও দিতে পারেন, এমন কি সঠিকভাবে কর্তব্য পালন করলে মনিব তাকে খুশী হয়ে অমুক অমুক পুরস্কার দান করবেন, একথাও সে জানতে পারে। কিন্তু সে যদি পুরস্কারকেই নিজের লক্ষ্য বানিয়ে নেয় এবং নিছক স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে কর্তব্য পালন করে তাহলে এমন কর্মচারীকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কি কর্তব্য নিষ্ঠ কর্মচারী বলতে পারে ? এই দৃষ্টান্ত দ্বারা আল্লাহ এবং তাঁর প্রতিনিধির বিষয়টিও অনুমান করতে পারেন। মানুষ যখন দুনিয়ার বুকে আল্লাহর প্রতিনিধি, তখন আল্লাহর রেযামন্দী ও সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া তার আর কী জীবন লক্ষ্য হতে পারে ?

ইসলাম মানুষের সামনে যে জীবনদর্শন পেশ করেছে, বিবেক-বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতি তার থেকে এ জীবন লক্ষ্যই উদ্ভাবন করে, আর এ হচ্ছে নির্ভুল ও অবিকৃত ইসলামী লক্ষ্য। কুরআন মজীদের ভাষণসমূহ পর্যালোচনা করলে আপনারা জানতে পারবেন যে, এই একমাত্র লক্ষ্যবস্তুকে মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দেয়া এবং তার হৃদয় ও আত্মার ভেতর একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করা হয়েছে এবং এছাড়া অন্য সব লক্ষ্যবস্তুকে সুস্পষ্ট ও দৃঢ়তার সাথে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○ (الانعام : ١٦٢-١٦٣)

"হে নবী, তুমি বলে দাও আমার নামায, আমার ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবকিছুই সেই আল্লাহর জন্যে যিনি সমস্ত জাহানের প্রভু এবং যার কোনই শরীক নেই। আমাকে এরই হুকুম দেয়া হয়েছে এবং আমিই তাঁর সামনে সর্বপ্রথম মস্তক অবনতকারী—আত্মসমর্পণকারী।"
—(সূরা আল আন'আম ঃ ১৬২-১৬৩)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف ..... فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ (التوبة : ١١١)

"আল্লাহ মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন বেহেশতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, হত্যা করে এবং নিহিত হয়। ... ... সুতরাং (আল্লাহর সাথে) তোমরা যে বেচা-কেনা করেছো, তার জন্যে আনন্দ করো, প্রকৃতপক্ষে এটাই বড়ো সাফল্য।"
—(সূরা আত তাওবা ঃ ১১১)

সূরায়ে বাকারায় নাফরমান ও ফর্মাবর্দার বান্দাদের পার্থক্য বর্ণনা করে ফর্মাবর্দার বান্দার প্রশংসা করা হয়েছে এভাবে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

"লোকদের ভেতর এমন লোকও রয়েছে, যে নিজের জানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিক্রি করে দেয় ; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি স্নেহশীল।"
—(সূরা আল বাকারা ঃ ২০৭)

সূরায়ে ফাতহে মুসলমানদের প্রশংসাই করা হয়েছে এই মর্মে যে, তাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা এবং তাদের রুকূ' ও সেজদা সবকিছুই আল্লাহর জন্যে ঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ○ (الفتح : ٢٩)

"মুহাম্মাদ আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং তাঁর সঙ্গি-সাথীগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর রহমদিল। তোমরা হামেশা তাদেরকে রুকূ' ও সেজদায় অবনত দেখছো। এরা আল্লাহর ফযল এবং তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।"–(সূরা আল ফাতহ ঃ ২৯)

সূরায়ে মুহাম্মাদে কাফেরদের ক্রিয়া-কলাপ ব্যর্থ হবার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তারা আল্লাহর জন্যে কিছুই করে না, বরং অন্য উদ্দেশ্যে কাজ করে আল্লাহর অসন্তুষ্টিকেই বরণ করে নেয় ঃ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ○

"তাদের ওপর এই জন্যেই আঘাত পড়বে যে, যে বস্তু আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তারা তারই অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে তারা অপছন্দ করেছে। এ জন্যেই আল্লাহ তাদের কৃতকর্মকে বিনষ্ট করে দিয়েছেন।"–(সূরা মুহাম্মদ ঃ ২৮)

সূরায়ে হজ্জে দুনিয়াবী ফায়দার জন্যে কৃত ইবাদতকে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং ক্ষতির কারণ বলে অভিহিত করা হয়েছে ঃ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ ج فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ ج وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ج خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ط ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○ (الحج : ١١)

"লোকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে আগ্রহহীনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে কোন কল্যাণ করলো তাহলে সে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলো। আর যদি কোন পরীক্ষার সময় এলো তাহলে মুখ ফিরিয়ে নিলো। এরূপ লোকই দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলো আর এ-ই হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি।"–(সূরা আল হজ্জ ঃ ১১)

সূরায়ে বাকারায় বলা হয়েছে যে, যে দান লোকদের দেখানোর উদ্দেশ্যে করা হবে এবং যে মাল দিয়ে মানুষ অনুগ্রহ জাহির করবে তা হচ্ছে নিষ্ফল।

এর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন এক প্রস্তর খণ্ডের ওপর কিছুটা মাটি পড়ে ছিলো। তোমরা তাতে বীজ বপণ করলে ; কিন্তু পানির ঢল এসে তাকে ধুয়ে নিয়ে গেলো। পক্ষান্তরে যে সকল সুকৃতি একাগ্রচিত্তে শুধু আল্লাহরই সন্তুষ্টির জন্যে করা হবে, তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন বাগিচার তুল্য, যার ওপর প্রবল বারিপাত হলে দ্বিগুণ ফল ধারণ করে আর প্রবল বারিপাত না হলেও হালকা পানির ছিটাই তার ফল ধারণের পক্ষে যথেষ্ট।–(রুকূ' ঃ ৩৬)

কুরআন মজীদের বিভিন্ন জাগয়ায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে এই বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যে কোন সৎকাজই করো না কেন, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই করো এবং এর পেছনে আর কোন উদ্দেশ্য পোষণ করো না।

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ ط

"তোমরা যা কিছুই দানের খাতে ব্যয় করবে তার ফায়দা তোমাদেরই জন্যে আর যা কিছুই তোমরা ব্যয় করো, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই করতে থাকো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

"যারা আপন প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে সবর করেছে এবং নামায কায়েম করেছে আর তাদেরকে আমরা যে রুযি দান করেছি তার থেকে গোপনে বা প্রকাশ্যে ব্যয় করেছে আর যারা পুণ্যের দ্বারা পাপকে দূরীভূত করে, এমন লোকদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের ঘর।"–(সূরা আর রাদ ঃ ২২)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ○ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهُ يَتَزَكّٰى ○ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰى ○ اِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ○ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ○ (الليل : ١٧-٢١)

"দোযখের আযাব থেকে সেই বড়ো পরহেযগারই বেঁচে যাবে, যে আত্মশুদ্ধির সাথে নিজের মাল দান করে। তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহ নেই যে, তার বদলা তাকে দিতে হবে। বরং সে শুধু তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টিই কামনা করে আর তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হবেন।"

–(সূরা আল লাইল ঃ ১৭-২১)

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ ز وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ (الروم : ٣٨)

"অতএব তুমি নিকটাত্মীয়কে তার হক বুঝিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও (তার হক)। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্যে এ-ই হচ্ছে উত্তম। আর প্রকৃতপক্ষে এরাই কল্যাণের অধিকারী হয়ে থাকে।"–(সূরা আর রূম ঃ ৩৮)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ○

"তুমি যে যাকাত দিয়েছো এবং তাদ্বারা তুমি শুধু আল্লাহরই সন্তুষ্টি লাভ করতে চাও তো যারা এরূপ করছে তারাই নিজেদের দানকে দ্বিগুণ চতুর্গুণ করছে।"–(সূরা আর রূম ঃ ৩৯)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ○ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ○ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ○ فَوَقٰهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ○

"তারা আল্লাহর প্রতি ভালবাসার খাতিরে মিসকীন, এতীম ও বন্দীকে আহার করায় এবং বলে যে, আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহর জন্যেই খাওয়াচ্ছি। আমরা তোমাদের কাছ থেকে না কোন প্রতিদান চাই আর না চাই কোন কৃতজ্ঞতা। আমরা তো আমাদের প্রভুকে সেই দিনের জন্যে ভয় করি যেদিন মানুষের মুখ বিমর্ষ হয়ে যাবে আর তাদের মুখমণ্ডলের চামড়া কুঁকড়ে যাবে। অতএব আল্লাহ তাদেরকে সেই দিনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে সজীবতা ও স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছেন।"

–(সূরা আদ দাহর ঃ ৮-১১)

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

"ফাই হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদে সেইসব গরীব লোকেরও অংশ রয়েছে, যারা হিজরত করেছে এবং যারা আপন ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছে ; (এবং যারা এই সবকিছু এ জন্যে স্বীকার করেছে যে,) তারা আল্লাহর ফযল এবং তার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাজে সাহায্য করে। প্রকৃতপক্ষে এরাই হচ্ছে সত্যবাদী।"

–(সূরা হাশর ঃ ৮)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ -

“আল্লাহ সেইসব লোককে ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সীসা জমানো প্রাচীরের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হয়ে লড়াই করে।”–(সূরা আস সফ ঃ ৪)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ج (النساء : ٧٦)

“যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, আর কাফেরগণ লড়াই করে যুলুম ও বিদ্রোহের খাতিরে।”–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৬)

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ اِلاَّ مَاكَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِىْ بِهٖ وَجْهُهٗ -

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

“আল্লাহ কেবল সেই আমলকেই কবুল করেন, যা খালেছভাবে তাঁরই জন্যে করা হবে এবং যা দ্বারা শুধু তাঁর সন্তুষ্টিলাভই লক্ষ্য হবে।”

এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম সর্বপ্রকার পার্থিব ও পরকালীন স্বার্থ পরিত্যাগ করে একটি মাত্র বস্তুকে জীবনের লক্ষ্য, মানুষের সকল প্রয়াস-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এবং সমগ্র ইচ্ছা-বাসনা ও আশা-আকাংখার কেন্দ্রবস্তু বলে ঘোষণা করেছে আর সে বস্তুটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার রেযামন্দী ও তাঁর সন্তুষ্টিলাভ। এবার এ লক্ষ্যটির কোন্ সব বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব একে সর্বোত্তম জীবন লক্ষ্যে পরিণত করেছে, তা-ই আমরা দেখবার প্রয়াস পাবো।

এক ঃ স্বাভাবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লক্ষ্যের সামঞ্জস্য—বিশ্বপ্রকৃতি সম্পর্কে ইসলাম যে মতবাদ পেশ করে, প্রকৃতপক্ষে তা মতবাদের সীমা অতিক্রম করে ঈমান ও প্রত্যয়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। সে মতবাদীটি হচ্ছে এই যে, সৃষ্টির এই অন্তহীন রাজ্যের মালিক ও শাসক হচ্ছেন এক আল্লাহ। সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁরই অধীন ও অনুগত এবং তাঁরই সামনে আত্মসমর্পিত।

وَلَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ۝ (الروم : ٢٦)

“সমস্ত আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তার, সবকিছু তাঁর অধীন। এই বিশ্ব কারখানার সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ তাঁরই বিধান এবং তাঁরই ইচ্ছার অধীন (الانعام : ٥٧)- اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ। “আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান নেই।” এই জগত এবং অন্যান্য জগতে যতো জিনিস রয়েছে, তার সবকিছুরই কেন্দ্র হচ্ছেন তিনি। (البقرة : ٢١٠)- وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ “সবকিছুই তার কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।” এরই নাম হচ্ছে ইসলাম, এর অর্থ হচ্ছে আত্মসমর্পণ বা আজ্ঞানুবর্তী হওয়া। গোটা বিশ্বপ্রকৃতি এবং তার প্রতিটি অণু-পরমাণু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়—এই দ্বীন ইসলামেরই অনুবর্তী।

وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا ـ(ال عمران : ٨٣)

"সমস্ত আসমান ও জমিনের সবকিছুই—ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়—তাঁরই অধীন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৩)

এই বিশ্বব্যাপী, অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় বিধানে গোটা বিশ্ব প্রকৃতির ন্যায় মানুষও সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে এবং তার স্বভাব-প্রকৃতিও আল্লাহর অধীন, অনুগত এবং তারই দ্বীনের অনুবর্তী।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ـ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ـ لَاتَبْدِيْلَ

لِخَلْقِ اللّٰهِ ـ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ق(الروم : ٣٠)

"অতএব তোমার মুখমণ্ডল সেই প্রামাণ্য দ্বীনের প্রতি ফিরিয়ে দাও এবং আল্লাহর সেই প্রকৃতি অনুসরণ কর যে অনুযায়ী আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হচ্ছে প্রামাণ্য দ্বীন।"–(সূরা আর রূম ঃ ৩০)

এই মতবাদ অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিজগতের এমন কি মানুষেরও স্বাভাবিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট এবং চরম কাম্য হচ্ছে মহাশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা। তাই প্রত্যেকেরই স্বাভাবিক গতি সেই কেন্দ্রস্থলের দিকেই নিবদ্ধ। এক্ষণে এক যুক্তিবাদী সৃষ্টি হিসেবে মানুষ এই স্বাভাবিক লক্ষ্য সম্পর্কে চেতনা লাভ করবে এবং বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির সাহায্যে তাকে অনুধাবন করে নিজের ইচ্ছা-প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার গতিকে তারই দিকে ফিরিয়ে দিবে—এটুকুই হচ্ছে তার কাজ। এমতাবস্থায় তার ও সমগ্র সৃষ্টির স্বাভাবিক লক্ষ্যের সাথে তার বুদ্ধিগত লক্ষ্য সামঞ্জস্যশীল হয়ে যাবে। বিশ্বজাহানের সকল সৈন্য-সামন্ত এবং সৃষ্টি ব্যবস্থার প্রতিটি অণু-পরমাণু এই লক্ষ্যে উপনীত হবার ব্যাপারে তার সহায়তা করবে এবং সে বুদ্ধিগত মর্যাদার কারণে এই বিরাট কাফেলার পুরোধা ও নেতার আসনে অভিষিক্ত হবে। পক্ষান্তরে এ লক্ষ্যবস্তুকে ছেড়ে সে যদি অন্য কোন বস্তুকে বুদ্ধিগত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে, তবে তার দৃষ্টান্ত হবে এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কোন একটি কাফেলার সঙ্গে রয়েছে। কাফেলাটি পশ্চিম দিকে চলছে। ঐ লোকটি যে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়েছে, সেও পশ্চিম দিকেই ছুটছে। কিন্তু কাফেলা বা সওয়ারী ঘোড়ার গতি কোন্ দিক, তা ঐ বেহুশ যাত্রীর জানা নেই। তার মন রয়েছে পূর্বদিকে নিবদ্ধ। সে তার ঘোড়ার পেছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। লাগাম টানাটানি করে এবং সজোরে চাবুক কষিয়ে সে ঘোড়াকে পিছন দিকে ফিরিয়ে নেবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কয়েক পা সে ঘোড়াকে পিছন দিকে টেনেও নেয়। কিন্তু আবার কাফেলার গতি এবং নিজের স্বভাবগত ঝোঁকপ্রবণতায় বাধ্য হয়ে ঘোড়া সেই পশ্চিম দিকেই ছুটতে থাকে।

মোটকথা, এভাবে ঐ যাত্রী বারবার নিজের মনন ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ মঞ্জিলের দিকেই যেতে বাধ্য হয়, কিন্তু এক সার্থক ও সফলকাম যাত্রীর মতো নয়, বরং এক ব্যর্থ এ বিফলকাম যাত্রীর মতো। কারণ যে জিনিসকে সে আপন মঞ্জিলে মকসুদ বলে ঘোষণা করেছে, সে পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য তার হয় না, আবার যেখানে সে কার্যত গিয়ে পৌঁছে, সেটা না তার গন্তব্যস্থল, আর না সেখানে থাকার কোন প্রস্তুতি,সে গ্রহণ করে।

দুই ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আকর্ষিক শক্তি—পূর্বে যেমন বলা হয়েছে যে, দ্বীন ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র ও ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর সত্তা। এর গোটা ব্যবস্থাপনাই ঐ কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তন করছে। এই ব্যবস্থাপনায় যাকিছু রয়েছে—তা মনন ও প্রত্যয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক আর পূজা-উপাসনা ও ইবাদাত-বন্দেগীর সাথে সম্পৃক্ত হোক অথবা তা দুনিয়াবী জীবনের কোন কারবারই হোক—তার প্রতিটি জিনিসেরই গতি ঐ কেন্দ্রীয় সত্তার দিকেই নিবদ্ধ এবং প্রতিটি জিনিসই তার আকর্ষণ শক্তির প্রচণ্ড তারের সাথে সংযুক্ত হয়ে আছে। খোদ দ্বীন (আনুগত্য) ও ইসলাম (আত্মসমর্পণ) শব্দ দু'টি—যার থেকে এই ধর্মীয় ব্যবস্থাপনাটি উদ্ভাবিত হয়েছে—তার এই প্রকৃতি ও নিগূঢ় তত্ত্বকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রতিপন্ন করে। দ্বীন ও ইসলাম শব্দের মানেই হচ্ছে এই যে, বান্দাহ তার আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে মাথা নত করে দিবে এবং তাঁরই ইচ্ছার অনুগত হবে।

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ -(النساء : ١٢٥)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দিয়েছে এবং সে সৎকর্মশীলও তার চেয়ে উত্তম দ্বীন আর কার হবে।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১২৫)

وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗۤ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى

"যে ব্যক্তি আপন মুখমণ্ডল আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং সেই সঙ্গে সে সৎকর্মশীলও হয়, সে তো অত্যন্ত মযবুত রজ্জু আকড়ে ধরলো।"
-(সূরা লোকমান ঃ ২২)

ইসলামের প্রকৃতি এর চেয়ে চমৎকারভাবে অনুধাবন করা যায় আল্লাহর সামনে হযরত ইবরাহীম (আ) এবং তাঁর পুত্রের আত্মসমর্পণ ঘটনা থেকে। পুত্র (الصافات : ١٠٢) يٰۤاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ (হে আমার পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা করুন) বলে নিজকে ছুরিকার নীচে সমর্পণ করে দেন আর পিতা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে নিজের কলিজার টুকরাকে জবাই করতে উদ্যত হন—উভয়ের এই আচরণকে 'ইসলাম' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ○ (الصفت : ١٠٣)

"যখন তারা উভয়ই আত্মসমর্পণ (ইসলাম) করলেন এবং ইবরাহীম ইসমাঈলকে (যবেহ করার জন্য) উপুড় করে শোয়ালেন ...।"

–(সূরা আস সাফ্‌ফাত ঃ ১০৩)

এই কারণেই ইসলামের প্রতিটি জিনিস আল্লাহরই জন্যে নির্ধারিত। নামায যদি আল্লাহর জন্যে না হয় তাহলে তা একটি অর্থহীন ওঠা-বসা ছাড়া আর কিছু নয়। রোযা যদি আল্লাহর জন্যে না হয় তাহলে তা হবে শুধু উপবাসের শামিল। যাকাত ও দান-খয়রাত যদি আল্লাহর জন্যে হয় তবে তা হবে আল্লাহর পথে ব্যয়, নচেৎ তা হবে শুধু অপব্যয় ও অপচয়। যুদ্ধ ও জিহাদ যদি খালেছ আল্লাহর পথে হয়, তবে তা হবে শ্রেষ্ঠতম ইবাদত, নচেৎ তা হবে শুধু ফেতনা-ফাসাদ আর নিছক রক্তপাত। এভাবে ইসলামের নির্দেশিত অন্যান্য কাজগুলো যদি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়, তবে তা হবে সৎ ও প্রতিদানযোগ্য কাজ, নতুবা তা হবে নিষ্ফল ও অর্থহীন কাজ। আর যেগুলো ইসলাম নিষেধ করেছে, তাথেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে বিরত থাকলে তা হবে ফলপ্রসু, নতুবা তা হবে একেবারেই পণ্ডশ্রম।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এই প্রচণ্ড এককেন্দ্রিকতা ও একমুখিতা হচ্ছে ঐ লক্ষ্যবস্তুরই সৃষ্ট ফল। এই আকর্ষিক শক্তিই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে এক শক্তিশালী কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতার সৃষ্টি করেছে। বর্তমান যুগের প্রকৃতি-বিজ্ঞান অনুসারে আমাদের সৌর ব্যবস্থা যেমন মযবুত ও পূর্ণাঙ্গ, ঐ লক্ষ্যের বদৌলতে এই ব্যবস্থাটিও ঠিক সেরূপ মযবুত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। এই লক্ষ্যটি যদি না হতো, তাহলে দ্বীন ইসলামে এরূপ শৃংখলাও বজায় থাকতো না।

তিন ঃ চিন্তা ও কর্মের একমুখিনতা—এই লক্ষ্যটি যেমন ইসলামের ধর্মীয় ব্যবস্থায় এককেন্দ্রিকতা, একমুখিনতা ও নিয়ম-শৃংখলার সৃষ্টি করেছে, তেমনি এই মানুষের চিন্তা ও কল্পনায়, ইচ্ছা ও মননে এবং আকীদা ও আচরণেও এক পরিপূর্ণ একমুখিনতা পয়দা করে দেয়। পরন্তু এই একমুখিনতার সাথে তার দৃষ্টিকে এমন এক উচ্চতম লক্ষ্য বিন্দু ও মহত্তম উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধ করে দেয়, যার চেয়ে বেশী উন্নত বা উচ্চ পর্যায়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হতেই পারে না। শুধু স্বভাবগত কামনার পরিতৃপ্তি কিংবা প্রবৃত্তিগত স্বার্থ লাভ অথবা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য পূরণই যে ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য হবে, তার চিন্তা ও কর্মে কখনো একমুখিনতা আসতে পারে না। কারণ, বুদ্ধি ও মনোগত ক্রমবিকাশ এবং দৃষ্টি ও কর্মের প্রসারণের প্রত্যেক পর্যায়ে তার ভেতর নব নব কামনা ও

বাসনার সৃষ্টি হবে এবং নতুন নতুন জিনিসকে সে নিজের অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করতে থাকবে। জ্ঞান ও বুদ্ধির কোন উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ এমন সব প্রকৃতিগত কামনা এবং আধ্যাত্মিক ও প্রবৃত্তিগত দাবীর ওপর অবিচল থাকে, যা এর পরবর্তী নিম্নতর পর্যায়ে তার পক্ষে দৃষ্টি আকর্ষণকারী ও কর্মপ্রেরণাদানকারী ছিল—এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এভাবে এক উদ্দেশ্য থেকে অন্য উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হতে হতেই মানুষের সমস্ত জীবন অতিক্রম হয়ে যাবে এবং তার চিন্তাধারায় পরিপূর্ণ একমুখিনতা সৃষ্টি করতে এবং তাঁর গোটা চিন্তা ও কর্মশক্তিকে নিয়োজিত করতে পারে, এমন কোন কেন্দ্রীয় ভাবধারাই তার মনের ভেতর বদ্ধমূল হতে পারে না। এ বৈশিষ্ট্য ইসলামী লক্ষ্যের ভেতরেই রয়েছে যে জ্ঞান ও বুদ্ধির যে কোন পর্যায়ে সে মানুষের একমাত্র জীবন লক্ষ্য হতে পারে এবং কোন উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছেও তাকে বদলাবার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। কারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির যতো উচ্চ মার্গেরই আমরা কল্পনা করি না কেন, আল্লাহর সত্তা তাঁর চেয়েও মহান ও উন্নত। এছাড়া অতি তুচ্ছতম পর্যায় থেকে অতুচ্ছ পর্যায় পর্যন্ত যে কোন লোকের সাথেই তার সম্পর্ক সমান। এ ব্যাপারে কোন পার্থক্য থেকে থাকলে তা শুধু আমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান ও চেতনার পার্থক্যের দিক দিয়েই রয়েছে।

চার ঃ খালেছ মানবীয় সমাজ সংগঠন—আবার এ লক্ষ্যটি যেমন এক ব্যক্তির জীবন লক্ষ্য হতে পারে, তেমনি একটি সমাজ, একটি জাতি বরং গোটা মানব জাতিরই লক্ষ্য হতে পারে। কারণ যে আত্মসর্বস্বতা এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক স্বার্থপরতার স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে মানবতাকে বংশ-গোত্র-সম্প্রদায় এবং ব্যক্তি ও ব্যষ্টিতে বিভক্ত করে দেয়া এবং তাদের ভেতর পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং শত্রুতা ও পরশ্রীকাতরতার মনোভাব জাগিয়ে দেয়া, এ লক্ষ্যের ভেতর তার কোন উপাদানই বর্তমান নেই এবং যে মহান সত্তার সাথে গোটা মানব জাতি তথা গোটা বিশ্বপ্রকৃতির সমান সম্পর্ক বিদ্যমান এবং যার প্রতি নিবিষ্ট হবার পর প্রতিটি দিক থেকে মানবীয় উদ্দেশ্যের ভেতর ঐক্য ও একত্বের সৃষ্টি হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সাহায্য-সহায়তা ও সৌভ্রাত্বের ভাবধারা সৃষ্টি হয়, এ লক্ষ্যটি মানুষকে সেদিকে নিবিষ্ট করে দেয়। দুনিয়ায় যত বৈষয়িক উদ্দেশ্য রয়েছে, তার কোন একটিতে দু'জন মানুষও একে অপরের সত্যিকার সহায়ক হতে পারে না। ভাই-ভাই, পিতা-পুত্র এবং মাতা-কন্যার পক্ষেও এক বৈষয়িক উদ্দেশ্য একত্রিত হয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, এমনকি বৈরিতা ও শত্রুতা থেকে বেঁচে থাকা পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা খোদ রক্তের সম্পর্ককে ছিন্ন হতে দেখেছি। আমাদের চোখের সামনে ভাই ভাইর গলা পর্যন্ত কেটেছে। নিছক পার্থিব উদ্দেশ্যের জন্যে অতি

নিকটতম প্রিয়জনেরা একে অপরের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছে, এ রকম অসংখ্য দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে দেখেছি এবং এখনো দেখছি। এসব কিছু হচ্ছে পার্থিব স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের সবচেয়ে মৌলিক উপাদান আত্মসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতার প্রত্যক্ষ ফল। কিন্তু আল্লাহর সত্তা হচ্ছে সকল পরিণতির শেষ পরিণতি, কোনরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা প্রতিরোধ-প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে এবং কেউ কারো স্বার্থে সংঘর্ষ না লাগিয়ে লক্ষ্য কোটি মানুষ একই সময় তার দিকে ছুটে যেতে পারে। বরঞ্চ এ যাত্রাপথের প্রত্যেক যাত্রীই আন্তরিকতার সাথে অন্য যাত্রীর সাহায্য করে, নিজের ওপর অন্যের আরামকে অগ্রাধিকার দেয় এবং অন্যের পরিশ্রমের তুলনায় নিজে বেশী পরিশ্রম করতে প্রস্তুত হয়। আরাম ও আয়েশের সাথে চলার চেয়ে আপন সহযাত্রীর বোঝা বহন করে, অন্যের খেদমত করে, হাঁপাতে হাঁপাতে, বিনয়ের সাথে ও সলজ্জভাবে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হওয়া এবং আপন মালিকের অধিক হতে অধিক পরিমাণে সন্তুষ্টি অর্জন করাকে অনেক বেশী উত্তম মনে করে।

বস্তুত, বর্ণ, গোত্র, ভাষা ও মৌলিক সীমারেখার বৈষম্যকে নিশ্চিহ্ন করে এক বিশ্বব্যাপী জাতীয়তার রূপায়ণ এবং আন্তর্জাতিক মানব সংঘের সংগঠনের জন্যে যে কেন্দ্রীয় ভাবধারার প্রয়োজন, তা এ লক্ষ্যের ভেতরেই পূর্ণ মাত্রায় বর্তমান রয়েছে। এ ধরনের বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির জন্যে এর চেয়ে উত্তম আর কোন লক্ষ্যই হতে পারে না। কারণ তা এক দিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে একেবারে বিলুপ্তও করে দেয় না, আবার অন্য দিকে ব্যক্তিত্বের সকল বিকেন্দ্রিক প্রবণতাকে নিশ্চিহ্ন করে এক খালেছ মানবীয় সমাজে তাকে সন্নিবেশিত করে দেয়।

পাঁচ ঃ গৌণভাবে সকল উদ্দেশ্যের সফলতা—এ লক্ষ্যের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে, দুনিয়ায় ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক দিক দিয়ে মানুষের যতো উদ্দেশ্য হতে পারে, এর নিরূপণের সাথে সাথে তা সবই গৌণভাবে হাসিল হয়ে যায়। এজন্যে ঐগুলোকে পৃথক পৃথকভাবে অভীষ্ট বানাবার কোন প্রয়োজন হয় না। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সাথে সাথে যে জিনিসগুলো অনিবার্যভাবে হাসিল হয়ে থাকে, কুরআন মজীদ এক একটি করে তার সবই উল্লেখ করেছে।

পার্থিব জীবনে মানুষের সবচেয়ে বড়ো কামনা হচ্ছে শান্তি, নিরাপত্তা, নিশ্চিন্ততা ও মানসিক প্রশান্তি। কুরআন বলে যে, আল্লাহর প্রতি নিবিষ্ট হও ও তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করো, এ জিনিসটি তোমরা আপনা আপনিই লাভ করবে।

بَلٰى ق مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ص وَلَا خَوْفٌ

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○(البقرة : ١١٢)

"হাঁ যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীল হয়েছে, তার পুরস্কার রয়েছে তার পরোয়ারদেগারের কাছে ; এমনি লোকদের জন্যে কোন ভয়ের কারণ নেই আর এরা কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হয় না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১১২)

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ○ (الرعد : ٢٨)

"জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই আত্মার প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা লাভ হয়ে থাকে।"–(সূরা আর রাদ ঃ ২৮)

দুনিয়ার জীবনে মানুষ দ্বিতীয় যে জিনিসটি লাভ করতে চায়, তা হচ্ছে স্বাচ্ছন্দ্য, অর্থাৎ দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগমুক্ত জীবন। কুরআন বলে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলে, তাঁর গযব থেকে বেঁচে থাকলে এবং তাঁর জন্যে পরহেযগারী ও সৎকর্মশীলতা অবলম্বন করলে এ বস্তুটিও স্বাভাবিকভাবে হাসিল হয়ে যায়।

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -(الاعراف : ٩٦)

"এ বস্তিগুলোর লোকেরা যদি ঈমান আনতো, পরহেযগারী অবলম্বন করতো তাহলে আমরা তাদের জন্যে আসমান ও জমিন থেকে বরকতের দরজা খুলে দিতাম।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৯৬)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○ (النحل : ٩٧)

"যে ব্যক্তি নেক কাজ করলো মু'মিন অবস্থায়—সে পুরুষ হোক আর নারী—আমরা তাকে অবশ্যই স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করাবো। এমন লোকদেরকে আমরা নিশ্চিতরূপে তাদের আমলের চেয়ে অনেক বেশী উত্তম প্রতিফল দান করবো।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৯৭)

তৃতীয় যে জিনিসটি মানুষের সবচেয়ে বেশী কাম্য ও অভিপ্রেত তা হচ্ছে রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতা এবং আধিপত্য ও উচ্চমর্যাদা। কুরআন বলে যে, তোমরা আল্লাহর প্রতি নিবেদিত চিত্ত হও, এ সম্পদটি নিজেই তোমাদের পায়ের ওপর এসে পড়বে।

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ ○

"যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং ঈমানদার লোকদের বন্ধু হয়েছে, (সে আল্লাহর দলে যোগদান করেছে), আর আল্লাহর দল অবশ্যই বিজয়ী হবে।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৫৬)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ ○(الانبياء : ١٠٥)

"আমরা জবুরে উপদেশ ও নছিহতের পর একথা লিখে দিয়েছি যে, আমাদের নেক বান্দাগণই হবে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط ـ(النور : ٥٥)

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে খেলাফত দান করবেন, তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে তিনি যেভাবে খলিফা বানিয়েছিলেন। আর তিনি তাদের জন্যে যে দ্বীনকে পসন্দ করেছেন তাকে অবশ্যই তিনি স্থিতি দান করবেন এবং তাদের ভীতিজনক অবস্থার পর শান্তি প্রদান করবেন।"–(সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

অনুরূপভাবে পরকালীন জীবনে মুক্তি মানুষের একান্ত কাম্য। এ সম্পর্কেও কুরআন বলে যে, এ শুধু আল্লাহর সন্তোষ লাভেরই ফলমাত্র ঃ

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ○ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِى ○ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ○(الفجر : ٢٧-٣٠)

"হে নিশ্চিন্ত নফস, আপন প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করো, এমন অবস্থায় যেন তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট ; অতপর (আল্লাহ বলবেন যে,) তুমি আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল এবং আমার বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও।"–(সূরা আল ফজর ঃ ২৭-৩০)

এ থেকে জানা গেলো যে, অন্যান্যরা যতো জিনিসকে কাম্য ও অভীষ্ট বলে ঘোষণা করেছে, ইসলাম সে সবের প্রতি দৃকপাত পর্যন্ত করেনি, বরং যে বস্তুটি

অর্জনের ফলে এসব জিনিস আপনা-আপনি হাসিল হয়ে যায়, ইসলাম সেটিকেই তার লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে। অন্যান্যরা যেসব জিনিসকে নিজেদের লক্ষ্য বলে অভিহিত করে, সেগুলোর অন্বেষণে মুসলমান তার অন্তকরণকে এক মুহূর্তের জন্যেও লিপ্ত করবে, তার দৃষ্টিতে তা এতটুকু উপযোগীও নয়। তার সামনে তো ঐ সকল লক্ষ্য এবং সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তুর চেয়ে উন্নত ও সুউচ্চ এক মহান লক্ষ্য রয়েছে। সে ভালো করেই জানে যে, এ উচ্চতম লক্ষ্যে যখন সে উপনীত হবে, তখন এর অধীনস্থ প্রতিটি জিনিস আপনা-আপনিই সে পেয়ে যাবে। ইমারতের সবচেয়ে উপরের তলায় আরোহণ করলে মধ্যবর্তী তলাগুলো যেমন আরোহণকারীর পায়ের নীচে থাকে, মুসলমান তার লক্ষ্যে পৌছে ঠিক সেরূপ অবস্থাই দেখতে পায়।

ছয় ঃ তাকওয়া ও সৎকর্মশীলতার সর্বোত্তম প্রেরণা—এ লক্ষ্যটির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলাম পরহেযগারী ও সৎকর্মশীলতার যে উন্নত মান প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তার জন্যে ন্যায় ও অন্যায়ের যে বিধি-নিষেধ পেশ করেছে, মানুষকে তা পালন করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত এ লক্ষ্যটিই একমাত্র মার্জিত ও পবিত্র লক্ষ্য হতে পারে।

দুনিয়ায় সৎকাজ যে শুধু সৎকাজ বলেই করা উচিত আর দুষ্কৃতিকে কেবল দুষ্কৃতির কারণেই বর্জন করা উচিত—এমন কথা বলার মতো লোকের কোন অভাব নেই। কিন্তু এ ধরনের কথা যারা বলেন, এর প্রকৃত তাৎপর্যটা পর্যন্ত তাদের জানা নেই। নিছক সৎকাজের খাতিরে সৎকাজ করার মানে হচ্ছে এই যে, সৎকাজের সাথে কোন কল্যাণ ও উপকারিতার সম্পর্ক নেই ; সৎকাজ সৎকাজই, আর এ কারণেই তা মানুষের অভীষ্টও হতে পারে। অনুরূপভাবে শুধু দুষ্কৃতির জন্যেই দুষ্কৃতি থেকে বিরত থাকার অর্থ হচ্ছে এই যে, সমস্ত ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দুষ্কৃতি তার নিজস্ব চরিত্রেই দুষ্কৃতি, যেনো তার চরিত্রটাই মানুষের পক্ষে বর্জনীয় হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ায় মানুষের জন্যে এমন নির্ভেজাল সৎকাজের কোন অস্তিত্ব নেই, যা মানুষের ব্যক্তি সত্তার প্রতি আরোপিত হবার উপযোগী সকল ফায়দা ও কল্যাণ থেকে মুক্ত। আর না এমন খালেছ দুস্কৃতির অস্তিত্ব আছে, যা মানুষের ব্যক্তি সত্তাকে প্রভাবিত করার মতো অনিষ্টকারিতা থেকে শূন্য। বরং সত্য কথা এই যে, লাভ ও ক্ষতি তথা উপকারিতা ও অনিষ্টকারিতার অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের মনে সৎকাজ ও দুষ্কৃতির ধারণা পয়দা হয়েছে। যে কাজ দ্বারা মানুষের প্রকৃতই কোন উপকার হয়, দৃশ্যত তার ভিতরে কিছু অপকারিতা থাকলেও, মানুষ তাকেই সৎকাজ বলে অভিহিত করে। আবার যে কাজ দ্বারা তার যথার্থই কোন ক্ষতি সাধিত হয়, বাহ্যদৃষ্টিতে তার ভেতর কিছু উপকারিতা থাকলেও, মানুষ তাকেই দুষ্কৃতি

বলে আখ্যায়িত করে। কোন কাজকে যদি লাভ ও ক্ষতির বিশেষণ থেকে মুক্ত করে নেয়া হয় এবং কাজটি শুধু একটি ক্রিয়াই থেকে যায়, তবে আমরা তাকে সৎকাজ বা দুষ্কৃতি এর কোনটাই আখ্যা দিতে পারি না। একথা নিসন্দেহ যে, সৎকাজের অভ্যাস দৃঢ়তর হওয়া এবং উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে উপনীত হবার পর মানুষের পক্ষে লাভ ও ক্ষতির ধারণা থেকে মুক্ত হয়েও নিছক সৎকাজের খাতিরে সৎকাজ করা এবং দুষ্কৃতির জন্যেই দুষ্কৃতি থেকে বিরত থাকা সম্ভবপর। কিন্তু প্রথমত এটা শুধু কল্যাণ ও অকল্যাণের উৎস সম্পর্কে বিস্মৃতি মাত্র, উৎসের অপসারণ নয় ; দ্বিতীয়ত এটা শুধু দার্শনিকদের কল্পনার স্বর্গারোহণ মাত্র, কার্যত বড়ো বড়ো বিজ্ঞানীরও এ পর্যন্ত পৌঁছার সৌভাগ্য হয়নি। কাজেই সাধারণ লোকেরা নিছক সৎকাজ অবলম্বন ও দুষ্কৃতি পরিহারকে কিভাবে আপন লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে ?

এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, সৎকাজ ও দুষ্কৃতির ধারণাকে লাভ ও ক্ষতির ধারণা থেকে পৃথক করা যেতে পারে না। সৎকাজের ভেতরে যতক্ষণ না কোন কল্যাণকারিতা নিহিত থাকবে, ততক্ষণ তা মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হতে পারে না। ঠিক তেমনিভাবে দুষ্কৃতির ভেতরে কোন অনিষ্টকারিতা প্রচ্ছন্ন না থাকলে তাকে বর্জনীয় বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। এবার যদি আমরা পরহেযগারী ও সৎকর্মশীলতাকে স্বার্থপরতার তুচ্ছ পর্যায় থেকে স্বার্থহীনতা ও ঐকান্তিকতার উচ্চপর্যায়ে উন্নীত করা এবং তাকে এক নির্বিশেষ ও সার্বজনীন নৈতিক বিধানের ভিত্তি বলে অভিহিত করতে চাই, তাহলে তার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে এই যে, লাভ ও ক্ষতির এমন একটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা হবে বস্তুসর্বস্বতা ও স্বার্থপরতার চেয়ে উন্নততর ; যার ভিত্তিতে সর্ববিধ বৈষয়িক ও মানবিক ক্ষতি দ্বারা পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একটি সৎকাজ মানুষের চোখে শুধু কল্যাণময় বলেই প্রতিভাত হবে এবং সর্বদিক দিয়ে মঙ্গলময় হওয়া সত্ত্বেও একটি পাপ কাজকে শুধু ক্ষতিকারক বলেই মনে হবে। ইসলাম এ পন্থাটিই অবলম্বন করেছে। সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না অর্জনকে লাভ ও ক্ষতির একমাত্র মানদণ্ড বলে ঘোষণা করেছে। এ মানদণ্ড বৈষয়িক স্বার্থপরতামূলক পংকিলতা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। এ মানদণ্ড অনুযায়ী একজন সৎকর্মশীল মানুষ আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে নিজের জান, মাল, সন্তানাদি, সুনাম, সুখ্যাতি ইত্যাদি কুরবান করেও এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সে লাভবান হয়েছে। আবার একজন দুষ্কৃতিপরায়ণ মানুষ আল্লাহর গযব ডেকে আনার পর দুনিয়ার সকল বৈষয়িক ও স্বার্থপরতামূলক ফায়দা হাসিল করেও এ ভয় পোষণ করে যে, সে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। এ জিনিসটাই মানুষকে পার্থিব লাভ ও ক্ষতির প্রতি বেপরোয়া করে নিঃস্বার্থচিত্তে পরহেযগারী ও সৎকর্মশীলতা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এ পর্যন্ত দু'টি বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম এই যে, ইসলাম কোন্ জিনিসটাকে জীবনের লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছে ? দ্বিতীয় এই যে, কি কি কারণে তা একটি উত্তম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে ? এবার এ প্রশ্নের তৃতীয় দিকের প্রতি আমাদের আলোকপাত করতে হবে। আর তাহলো এই যে, ইসলামী সংস্কৃতিকে একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির রূপদানে এ লক্ষ্যটির ভূমিকা কি এবং এ সংস্কৃতিকে সে কোন্ বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে ?

পন্থা নিরূপণে লক্ষ্য নির্ধারণের প্রভাব

ইতিপূর্বে এ সত্যটির প্রতি ইশারা করা হয়েছে যে, জীবনের যাবতীয় কারবারে লক্ষ্য নিরূপণের যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন লক্ষ্য অর্জনের পন্থা নির্ধারিণেরও। আর পন্থা কখনো লক্ষ্যের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন ভিত্তিতে নিরূপতি হতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির সামনে নিছক ঘুরাফিরা ছাড়া কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বর্তমান না থাকে এবং সে শুধু রাস্তা-ঘাট ও অলি-গলির ধূলো সাফ করে বেড়ায়, তাহলে তাকে আমরা পাগল বা ভবঘুরে বলে আখ্যা দিয়ে থাকি। আর যদি সে লক্ষ্য পোষণ করেও, কিন্তু তা অর্জনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে কোন বিশেষ পন্থার অনুসারী না হয়, বরং যে পন্থাটি তার লক্ষ্যাভিমুখী বলে মনে হয়, সেটিই অবলম্বন করার জন্যে তৈরী হয়ে যায়, তবে তাকেও আমরা নির্বোধ বলে অভিহিত করি। কারণ যে ব্যক্তি একটি বিশেষ স্থানে যাবার জন্যে দশটি বিভিন্ন পথে চলার চেষ্টা করে, বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী সে কখনো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন বিশেষ জিনিসকে নিজের অভীষ্ট বলে ঘোষণা করে, আর তা অর্জনের জন্যে তার বিপরীত দিকগামী পন্থা অবলম্বন করে, তবে তাকে আমরা বুদ্ধিমান বলে মনে করি না। কারণ সে হচ্ছে, এমন বেদুঈনের মতো যে কাবার দিকে যাবার জন্যে তুর্কিস্তানের পথ ধরেছে। সুতরাং মানুষের বাস্তব সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে, পথ চলার জন্যে প্রথমে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা, তারপর সেই লক্ষ্যের দিকে তার যাবতীয় ইচ্ছা-বাসনা ও প্রয়াস-প্রচেষ্টার মোড় ঘুরিয়ে দেয়া, আর সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার বিভিন্ন পথ থাকলে তার ভেতরকার সর্বোত্তম পন্থাটি অবলম্বন করা এবং বাকী সমস্ত পথ বর্জন করা।

এ গ্রহণ ও বর্জন সম্পূর্ণ বিচার-বুদ্ধিসম্মত। লক্ষ্য নির্ধারণের ফল এই যে, যে পন্থাটি এ লক্ষ্যের সাথে বিশেষভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ, সেটি অবলম্বন করতে হবে এবং বাদবাকী সমস্ত পন্থা পরিহার করতে হবে। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি যখন ভ্রমণে বেরোয়, তখন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার সবচেয়ে উত্তম পথটিতেই সে এগিয়ে চলে। তার ভ্রমণকালে এছাড়া আর যে দশ-বিশটি পথের সন্ধান পায়, তার প্রতি ফিরেও তাকায় না। একজন বুদ্ধিমান ছাত্রের লক্ষ্য অর্জনের পথে জ্ঞানের

যে শাখাটি সবচেয়ে বেশী সহায়ক, সেই শাখাটিই সে অবলম্বন করে। তার সাথে আর যেসব শাখার সম্পর্ক নেই, তাতে সে নিজের সময় ব্যয় করতে পছন্দ করে না। একজন বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসায়ের যে পন্থাটি সাফল্য লাভের সর্বোত্তম উপায় বলে বিবেচিত হয়, নিজের জন্যে সেই পন্থাটি সে অবলম্বন করে। যে কোন কাজে পুঁজি খাটানো এবং যে কোন বৃত্তিতে নিজের শ্রম ব্যয় করাকে সে নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করে। এ গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারে অনুসৃত পথটি লক্ষ্যস্থলে পৌছার পক্ষে সর্বোত্তম হয়েছে কিনা, একজন সমালোচক শুধু এটুকু মতামতই পেশ করতে পারে। কিন্তু গ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলা সম্ভবপর নয়।

এ সত্যটি জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি সামগ্রীকভাবে গোটা জীবনের বেলায়ও প্রযোজ্য। মানুষ যদি তার জীবন সম্পর্কে কোন লক্ষ্য পোষণ না করে অথবা শুধু বেঁচে থাকার জন্যে বেঁচে থাকাই তার লক্ষ্য হয়, তবে জীবন যাপনের জন্যে সে যে কোন পন্থা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে। তার পক্ষে বিভিন্ন পন্থার মধ্যে ভালো-মন্দ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টের তারতম্য করা একেবারে অর্থহীন। নিজের কামনা-বাসনা ও প্রয়োজনাদি সে যেভাবে খুশী পূর্ণ করতে পারে। বাহ্যিক কার্য-কারণ তাকে এক বিশেষ পন্থার অনুসরণে কিছুটা বাধ্য করলেও তার গোটা জীবনকে কোন নিয়ম-শৃংখলা ও বিধি-বিধানের অনুবর্তী করার ব্যাপারে তো কার্যকরী হতে পারে না। কারণ নিয়ম-শৃংখলার কোন মৌলিক প্রেরণাই তার ভেতরে বর্তমান থাকবে না। পক্ষান্তরে সে যদি জীবন সম্পর্কে কোন লক্ষ্য পোষণ করে কিংবা স্পষ্ট ভাষায় জীবন সম্পর্কে সহজাত জৈবিক লক্ষ্যের উর্ধে কোন যুক্তিসংগত মানবিক লক্ষ্য তার মনে বদ্ধমূল হয়, তবে বিভিন্ন পন্থার মধ্যে সে অবশ্যই তারতম্য করবে। আর প্রকৃতপক্ষে সে যদি একজন বুদ্ধিমান মানুষ হয় তো জীবন-যাপনের বিভিন্ন পন্থার মধ্যে তার লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী একটি পন্থা তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেয়ার পর পন্থাবলম্বনে লক্ষ্যহীন মানুষের মতোই আযাদী ভোগ করা তার পক্ষে কিছুতেই সংগত হবে না।

এবার এ নীতিটিকে একটু প্রসারিত করুন। ব্যক্তির জায়গায় সমাজকে নিয়ে দেখুন, বহু ব্যক্তির ওপরও ঠিক এ নীতিই সমভাবে প্রযুক্ত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সমাজ সভ্যতার প্রাথমিক স্তরে থাকে এবং জীবন সম্পর্কে সহজাত জৈবিক লক্ষ্যের উর্ধে কোন উচ্চ ও উচ্চতর লক্ষ্য তাদের সামনে বর্তমান থাকে না, ততক্ষণ তারা নিজের রীতিনীতি ও চাল-চলনের একজন লক্ষ্যহীন মানুষের মতোই স্বাধীন থাকে। কিন্তু বুদ্ধির ক্রমবিকাশ ও সভ্যতার অধিকতর উঁচু স্তরে

পৌঁছার পর যখন তাদের ভেতরে একটি সংস্কৃতির জন্ম হয় এবং সে সংস্কৃতি তাদের সামগ্রিক জীবনের জন্যে কোন যুক্তিসংগত লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়, তখন সেই লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, লেন-দেন, নৈতিক চরিত্র, সামাজিকতা, অর্থনীতি ইত্যাদির জন্যে একটি বিশেষ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা সংস্কৃতির অনুগামীদেরকে সে ব্যবস্থার অনুসারী করে তোলা এবং এর আওতাধীনে থেকে কাউকে এর বহিস্থ কোন আকীদা বা কর্মনীতি অবলম্বন করার স্বাধীনতা না দেয়া একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আপন বিধি-ব্যবস্থার সংরক্ষণে এবম্বিধ কড়াকড়ি খোদ সংস্কৃতির প্রকৃতির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ব্যাপারে যে সংস্কৃতির বাঁধন শিথিল হবে এবং বিধি-ব্যবস্থায় দৌর্বল্য ও শিথিলতা পাওয়া যাবে, তা কখনো বেঁচে থাকতে পারে না। কারণ সংস্কৃতির যে আকীদা ও কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে, তার অনুগামীগণ কর্তৃক তার অনুসরণের ওপরই নির্ভর করে তার অস্তিত্ব। যখন অনুগামীরা তাদের আকীদা ও কর্মপদ্ধতির অনুসরণ করবে না এবং ঐ পদ্ধতির বহির্ভূত ধ্যান-ধারণা, রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার তাদের বাস্তব জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, তখন কার্যত সংস্কৃতির কোন অস্তিত্বই বাকী থাকবে না। কাজেই একটি সংস্কৃতির পক্ষে নিজের অনুগামীদের কাছে নিজেদেরই উদ্ভাবিত পদ্ধতির অনুসরণের দাবী করা এবং অন্যান্য বহিস্থ পদ্ধতির সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার ব্যাপারে চাপ প্রদান সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত। সমালোচক বড়োজোর এর উদ্দেশ্যের যথার্থ বা অযথার্থ সম্পর্কে কথা বলতে পারেন কিংবা এ উদ্দেশ্যের পক্ষে এ বিশেষ পন্থাটি উপযোগী কিনা, এ সম্পর্কে রায় দিতে পারেন অথবা সর্বাবস্থায় এ পদ্ধতিটির অনুসরণ সম্ভবপর কিনা, এ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু আলোচ্য সংস্কৃতি তার অনুগামীদের কাছে নিজেরই উদ্ভাবিত পদ্ধতির অনুসরণের দাবী করার অধিকারী নয়, একথা কিছুতেই বলতে পারে না।

পরন্তু এ নীতিও যখন স্বীকৃত হয়েছে যে, মানসিক ও বাস্তব জীবনের জন্যে যে বিশেষ পথ ও পন্থা নির্ধারণ করা হয়, প্রকৃতপক্ষে তা নির্ভর করে লক্ষ্যের ধরনের ওপর, আর লক্ষ্যের বিভিন্নতার ফলে পথ ও পন্থার বিভিন্নতাও আবশ্যক, তখন একথাও মানতে হবে যে, যেসব সংস্কৃতি আপন লক্ষ্যের দিক দিয়ে বিভিন্নমুখী হবে, তাদের বাস্তব ও বিশ্বাসগত পদ্ধতিগুলোও অনিবার্যরূপে পরস্পর থেকে ভিন্নরূপ হতে হবে। সে পদ্ধতিগুলোর কোন কোন অংশের মধ্যে সাদৃশ্য থাকতে পারে, একটি পদ্ধতির মধ্যে অন্য পদ্ধতির কোন কোন খুঁটিনাটি বিষয় এসে যেতে পারে, কিন্তু এ ছোটখাটো সাদৃশ্য থেকে না সামগ্রিক সাদৃশ্যের সিদ্ধান্ত নেয়া চলে, আর না খুঁটিনাটি জিনিস ধার করার ফলে গোটা পদ্ধতিটারই ধারিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এ মূলনীতি থেকে আরো দু'টি সূত্র বেরোয় ঃ

প্রথম এই যে, একটি বিশেষ লক্ষ্য পোষণকারী সংস্কৃতির ব্যবহারিক পদ্ধতি যাচাই করার জন্যে ভিন্ন লক্ষ্য পোষণকারী কোন সংস্কৃতির পদ্ধতিকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। অর্থাৎ এই পদ্ধতিটি যদি ঐ পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তবেই অভ্রান্ত নচেৎ ভ্রান্ত সমালোচনায় এ পদ্ধতি সংগত নয়।

দ্বিতীয় এই যে, একটি সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখে তার বাস্তব ও বিশ্বাসগত পদ্ধতিকে অন্য পদ্ধতির সাথে বদলানো যেতে পারে না। আর না একটি পদ্ধতির মৌলিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য পদ্ধতির মধ্যে প্রবেশ করানো চলে। এ ধরনের জগাখিচুড়ীকে যে ব্যক্তি সম্ভব বা সংগত মনে করে, সে সংস্কৃতির মূলনীতির সম্পর্কেই অনবহিত এবং তার মেযাজ ও প্রকৃতি অনুধাবনেই অযোগ্য।

ইসলামী সংস্কৃতির গঠন বিন্যাসে তার মূল লক্ষ্যের ভূমিকা

এ প্রাথমিক কথাগুলো মনে রাখার পর ইসলামী সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণত একটি পৃথক ও বিশিষ্ট সংস্কৃতির রূপদানে তার মূল লক্ষ্যের ভূমিকা কি, তা সহজেই বোঝা যেতে পারে। পূর্বেকার আলোচনায় একথা সবিস্তারে বিবৃত করা হয়েছে যে, ইসলাম জীবনের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে, তা অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতির লক্ষ্য থেকে মূলগতভাবেই পৃথক। সেই সঙ্গে একথাও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার ফলে বিশ্বাস ও কর্মের পদ্ধতিতেও মৌলিক পার্থক্য সূচিত হয়। সুতরাং এর যুক্তিসংগত ফল দাঁড়ায় এই যে, ইসলামের লক্ষ্য তাকে এমন একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির রূপ দিয়েছে, যা মূলগতভাবেই অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। এবং যার বিশ্বাস ও বাস্তব পদ্ধতির সাথে অন্যান্য পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এ পদ্ধতির কোন কোন অংশ হয়তো অন্যান্য পদ্ধতিতেও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু অন্যান্য পদ্ধতিতে সে অংশগুলো যে হিসেবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, এখানে সে হিসেবে সন্নিবেশিত নয়। কোন পদ্ধতিতে সন্নিবিষ্ট হবার পর অংশ বিশেষ তার নিজস্ব প্রকৃতি হারিয়ে সমগ্রের প্রকৃতি ধারণ করে ; আর একটি সমগ্রের প্রকৃতি যখন অপর সমগ্র থেকে ভিন্ন হয়, তখন তার প্রত্যেক অংশের প্রকৃতি অপরের প্রত্যেক অংশের প্রকৃতি থেকে অনিবার্যরূপে ভিন্নতর হবে,—তার কোন কোন অংশের বহিরাকৃতির সাথে অপরের কোন কোন অংশের যতই সাদৃশ্য থাকুক না কেন।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইসলাম মানুষকে দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছে এবং যে মহান প্রভুর সে প্রতিনিধি, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকেই তার জীবনের লক্ষ্য রূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ লক্ষ্যটি যেহেতু তার গোটা জীবনের লক্ষ্য, এ জন্যেই তার জীবনের সকল ক্রিয়াকলাপের মোড় লক্ষ্যের

দিকেই নিবদ্ধ হওয়া, তার দেহ ও প্রাণের যাবতীয় শক্তি ঐ লক্ষ্যের পথেই নিয়োজিত হওয়া এবং তার চিন্তা কল্পনা, ধ্যান-ধারণা ও গতিবিধির ওপর ঐ লক্ষ্যেরই কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। তার জীবন-মৃত্যু, শয়ন-জাগরণ, পানাহার, লেন-দেন, সম্পর্ক-সম্বন্ধ, বন্ধুত্ব ও বৈরিতা, অর্থনীতি ও সামাজিকতা, এক কথায়, তার প্রতিটি জিনিস ঐ একমাত্র লক্ষ্যের জন্যে নিবেদিত হওয়া উচিত। পরন্তু এ লক্ষ্যটিকে তার ভেতর এমন প্রভাবশীল ও ক্রিয়াশীল হওয়া দরকার, যেন এ প্রাণচেতনার কারণেই সে জীবন্ত ও কর্মতৎপর রয়েছে। এবার স্পষ্টতই বোঝা যায়, যে ব্যক্তি তার জীবন সম্পর্কে এমন লক্ষ্য পোষণ করে, আর এ লক্ষ্যের জন্যেই বেঁচে রয়েছে, সে কখনো কোন লক্ষ্যহীন কিংবা ভিন্ন লক্ষ্য পোষণকারী ব্যক্তির মতো জীবন যাপন করতে পারে না। এ লক্ষ্য তো তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী মানুষকে এক দক্ষ কর্মী ও সক্রিয় কর্মচারীতে পরিবর্তিত করে দেয়, এমন কর্মী ও কর্মচারী, যে শুধু বেঁচে আছে তার জীবনের লক্ষ্য অর্জন করার জন্যে।

তাই এ লক্ষ্য নির্ধারণ করার পর ইসলাম জীবন যাপন করার জন্যে বিভিন্ন পন্থার মধ্য থেকে একটি বিশেষ পন্থা নির্বাচন করে এবং ঐ পন্থাটি ছাড়া অন্য কোন পন্থা অনুসরণ করে মানুষকে তার প্রিয় সময় ও মূল্যবান শক্তির অপচয় না করার জন্যে বাধ্য করে। সে এ লক্ষ্যের স্বভাব ও প্রকৃতি অনুসারে আকীদা-বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কাণ্ডের একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি উদ্ভাবন করে এবং কোন অবস্থায়ই এ বিশেষ পদ্ধতির সীমা অতিক্রম না করার জন্যে মানুষের কাছে দাবী জানায়। সে এ পদ্ধতিকে সোজাসুজি আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা বলে ঘোষণা করে এবং এ জন্যে নামকরণ করে 'দ্বীন (دين) –অর্থাৎ আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা। সে বলে اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ। –'আল্লাহর কাছে দ্বীন হচ্ছে শুধু ইসলাম।'

এ দ্বীনের ভিত্তিতেই ইসলাম তার অনুসারী এবং যারা অনুসারী নয় তাদের মধ্যে পার্থক্য চিহ্ন এঁকে দেয়। যারা এ বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী এ অনুসরণ পদ্ধতিকে মেনে চলে, তাদেরকে সে 'মুসলিম' (আত্মসমর্পণকারী) ও 'মু'মিন' (প্রত্যয় পোষণকারী) বলে অভিহিত করে। আর যারা ঐ লক্ষ্যের সাথে এক মত নয় এবং এ অনুসরণ পদ্ধতিকেও মেনে চলে না, তাদেরকে সে 'কাফের' (অবিশ্বাসী)[১] বলে ঘোষণা করে। সে বংশ, গোত্র, জাতি, সম্প্রদায়, ভাষা, দেশ

১. কাফের শব্দটির ব্যবহারেও অতি উচ্চাঙ্গের বাকরীতি অনুসৃত হয়েছে। আরবী অভিধানে 'কুফর' এর মৌল অর্থ হচ্ছে গোপন করা। এ জন্যে বস্তুনিচয়কে গোপন করে বলে রাতকে বলা হয় কাফের। বীজকে মাটির মধ্যে গোপন করে দেয় বলে কৃষককেও বলা হয় কাফের এবং ফলকে বীজের ভেতরে গোপন করে বলে খোসাকে বলা হয় কাফূর। এভাবে উপমা হিসেবে নেয়ামতকে গোপন করা এবং তার শোকর আদায় না করাকে 'কুফর' ও 'কুফরান' বলা হয়েছে। ইসলাম এ কুফর শব্দটিকে ঈমানের বিপরীত বলে ঘোষণা করেছে। এ দ্বারা এ নিগূঢ় সত্যের দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, যারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তারা প্রকৃতপক্ষে আপন স্বভাব প্রকৃতির ওপর আবরণ টেনে দেয়।

এবং এ শ্রেণীর যাবতীয় ভেদ-বৈষম্যকে বিলুপ্ত করে আদম সন্তানের মধ্যে এই এক 'কুফর' ও 'ঈমানের' বৈষম্যকে দাঁড় করায়। যে কেউ এ পদ্ধতি মেনে চলবে—সে প্রাচ্যের হোক কি পাশ্চাত্যের সে তার আপনজন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর পদ্ধতি মেনে না চলবে—সে কা'বার প্রাচীরের নীচেই থাকুক, আর তার রক্তমাংস মক্কার খেজুর এবং জমজমের পানি দ্বারাই গঠিত হোক—সে তার আপন নয়।

আকীদা-বিশ্বাসের এ ক্রিয়া-কাণ্ডের ভিত্তিতে সে যেমন মানুষের মধ্যে 'কুফর' ও 'ঈমানের' বৈষম্য দাঁড় করিয়েছে, তেমনি জীবন যাপনের পন্থা এবং দুনিয়ার সকল জিনিসের মধ্যেও সে হারাম-হালাল, জায়েয-নাজায়েয ও মকরূহ-মুস্তাহাবের পার্থক্য কায়েম করেছে। যেসব ক্রিয়া-কাণ্ড ও রীতিনীতি ঐ লক্ষ্য অর্জন এবং খেলাফতের দায়িত্ব পালনের পক্ষে সহায়ক, সেগুলো নিজ নিজ অবস্থানুপাতে হালাল, জায়েয বা মুস্তাহাব। আর যেগুলো এ পথের বাধা ও প্রতিবন্ধক, সেগুলোও আপন আপন অবস্থানুপাতে হারাম, নাজায়েয বা মাকরূহ। যে মু'মিন এ পার্থক্য চিহ্নকে সমীহ করে, সে 'মুত্তাকী' (পরহেযগার) আর যে এর প্রতি সমীহ করে না, সে 'ফাসেক' (সীমালংঘনকারী)। আল্লাহর দলের লোকদের ভেতর ছোট-বড়ো ও উচ্চ-নীচ পার্থক্য ধন-দৌলত, বংশীয় আভিজাত্য, সামাজিক পদমর্যাদা বা সাদা-কালো, বর্ণের ভিত্তিতে নয়, বরং 'তাকওয়ার' ভিত্তিতে সূচিত হয়।

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ(الحجرات : ١٣)

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মুত্তাকী তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানীয়।"–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩)

এভাবে ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি, নৈতিক-চরিত্র, অর্থনীতি, সামাজিকতা, তমদ্দুন, সভ্যতা, রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা, এক কথায় মানবীয় জীবনের সমগ্র দিকে ইসলামী সংস্কৃতির পথ অন্যান্য সংস্কৃতির পথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। কারণ জীবন সম্পর্কে ইসলামের ধারণা অন্যান্য সংস্কৃতির ধারণা থেকে একেবারে পৃথক। অন্যান্য সংস্কৃতির জীবনের যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, ইসলামের লক্ষ্য তার থেকে ভিন্ন ধরনের। সুতরাং ইস-লাম তার ধারণা অনুযায়ী দুনিয়া এবং তার ভেতরকার বস্তুনিচয়ের সাথে যে আচরণ ও কর্মনীতি অবলম্বন করে এবং আপন লক্ষ্য অর্জনের জন্যে পার্থিব জীবনে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করে, তাও মূলগতভাবে অন্যান্য সংস্কৃতির গৃহীত আচরণ ও কর্মপন্থা থেকে ভিন্ন ধরনের। মনের অনেক চিন্তা-কল্পনা ও ধ্যান-ধারণা, প্রবৃত্তির অনেক কামনা-বাসনা ও ঝোঁক-প্রবণতা এবং জীবন যাপনের

জন্যে এমন বহু পন্থা রয়েছে, অন্যান্য সংস্কৃতির দৃষ্টিতে যার অনুসরণ শুধু সংগতই নয় ; বরং কখনো কখনো সংস্কৃতির পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু ইসলাম সেগুলোকে নাজায়েয, মকরূহ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হারাম বলে ঘোষণা করতে বাধ্য। কারণ, সেগুলো ঐ সংস্কৃতিগুলোর জীবন দর্শনের সাথে একেবারে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তাদের জীবন লক্ষ্য অর্জনের পক্ষেও সহায়। কিন্তু ইসলামের জীবন দর্শনের সাথে ঐগুলোর কোনই সম্পর্ক নেই অথবা তার জীবন লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় স্বরূপ। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, দুনিয়ার বহু সংস্কৃতির পক্ষে ললিতকলা হচ্ছে প্রাণ স্বরূপ এবং এ সকল চারুকলায় নিপুণ ও পারদর্শী ব্যক্তিগণ 'জাতীয় বীর'-এর মর্যাদা লাভ করেন। কিন্তু ইসলাম এর কোন কোনটিকে হারাম, কোনটিকে মকরূহ আর কোনটিকে কিছু পরিমাণ জায়েয বলে ঘোষণা করে। তার আইন-কানুন সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচর্যা এবং কৃত্রিম সৌন্দর্য উপভোগের অনুমতি মাত্র এটুকু রয়েছে যে, মানুষ যেন্নে তার সাথে সাথে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে, তাঁর পরিতুষ্টির জন্যে কাজ করতে এবং খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু যেখানে গিয়ে এ সৌন্দর্য প্রীতি দায়িত্বানুভূতির চেয়ে প্রবলতর হবে, যেখানে আনন্দ ভোগের আতিশয্য মানুষকে আল্লাহর পূজারী হওয়ার বদলে সৌন্দর্য পূজারী করে তোলে, যেখানে ললিতকলার স্বাদ থেকে মানুষকে বিলাস প্রিয়তার নেশায় ধরে যায়, যেখানে ঐসব শিল্পকলার প্রভাবে ভাবপ্রবণতা ও প্রবৃত্তির তাড়না শক্তিশালী ও তীব্রতর হওয়ায় বুদ্ধির বাধন শিথিল হয়ে যায় এবং বিবেকের আওয়াজের জন্যে হৃদয়ের কান বধির হয়ে যায় এবং কর্তব্যের ডাক শোনার মতো আনুগত্য ও দায়িত্বজ্ঞান বজায় না থাকে, ঠিক সেখানে পৌঁছেই ইসলাম অবজ্ঞা, অবৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার প্রাচীর দাঁড় করিয়ে দেয়। এ জন্যেই যে, তার উদ্দেশ্য তানসেন, বান্দাদিন, মানী ও বাহজাদ[১] চার্লিচাপ্লিন এবং মেরী পিক্ফোর্ড সৃষ্টি করা নয়, বরং সে চায় আবু বকর সিদ্দীক (রা), উমর ফারূক (রা), আলী বিন আবু তালিব (রা), হোসাইন বিন আলী (রা) ও রাবিয়া বছরী (রা) সৃষ্টি করতে।

এ দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমাজ, তমদ্দুন এবং অন্যান্য বহু বিষয়েরই বিস্তৃত অবস্থা অনুমান করা যেতে পারে। বিশেষত নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, ধনী ও নির্ধনের ব্যবহার, মালিক ও প্রজার সম্বন্ধ এবং অন্যান্য মানবীয় শ্রেণীগুলোর পারস্পরিক আচরণ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশিত পন্থা সমুদয় প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃতির উদ্ভাবিত পন্থা থেকে নীতিগতভাবেই ভিন্নতর। এ ব্যাপারে অন্যান্য সংস্কৃতির অনুসৃত পদ্ধতিকে মানদণ্ড বানিয়ে ইসলামের অবলম্বিত পদ্ধতিকে যাচাই করা মূলতই ভ্রান্তির পরিচায়ক। এ ধরনের কাজ যারা করেন, তারা নিতান্তই স্থূলদর্শী এবং প্রকৃত সত্য সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞ।

১. এরা উভয়ে পারসিক।

॥ তিন ॥
মৌলিক আকীদা ও চিন্তাধারা
১. ঈমানের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

জীবন দর্শন ও জীবন লক্ষ্যের পর এবার আমাদের সামনে তৃতীয় প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। তা হচ্ছে এই যে, ইসলাম কোন্ ভিত্তির ওপর মানব চরিত্রের পুনর্গঠন করে ?

চরিত্র ও তার মানসিক ভিত্তি

মানুষের সকল কাজ-কর্ম ও ক্রিয়া-কাণ্ডের উৎস হচ্ছে তার মন। কর্ম-কাণ্ডের উৎস হিসেবে মনের দু'টি অবস্থা রয়েছে। একটি অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাতে কোন বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা বদ্ধমূল হবে না, নানারূপ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা প্রবিষ্ট হতে থাকবে এবং তার মধ্যে যে চিন্তাটি বেশী শক্তিশালী, সেটিই হবে কাজের প্রেরণাদানকারী। আর দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে এই যে, তা বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার বিচরণক্ষেত্র থাকবে না, বরং তার ভেতরে কতিপয় বিশিষ্ট চিন্তাধারা এমনভাবে দৃঢ়মূল হবে যে, তার গোটা বাস্তব জীবন স্থায়ীভাবে তারই প্রভাবাধীন হবে এবং তার দ্বারা বিক্ষিপ্ত ক্রিয়া-কাণ্ড অনুষ্ঠিত হবার পরিবর্তে সুবিন্যস্ত ও সুসংহত কর্ম-কাণ্ড সম্পাদিত হতে থাকবে। প্রথম অবস্থাটিকে একটি রাজপথের সাথে তুলনা করা যেতে পারে ; প্রত্যেক যাতায়াতকারীর জন্যেই সে পথটি অবাধ, উন্মুক্ত। তাতে কারো কোন বিশিষ্টতা নেই। দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে একটি ছাঁচের মতো ; এর ভেতর থেকে হামেশাই একটি নির্দিষ্ট রূপ ও আকৃতির জিনিস ঢালাই হয়ে বেরোয়। মানুষের মন যখন প্রথম অবস্থায় থাকে, তখন আমরা বলি যে, তার কোন চরিত্র নেই। সে শয়তানও হতে পারে, আবার ফেরেশতাও হতে পারে। তার প্রকৃতিতে রয়েছে বহুরূপী স্বভাব। তার দ্বারা কখন কী ধরনের কর্ম-কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, কোন নিশ্চয়তা নেই। পক্ষান্তরে সে যদি দ্বিতীয় অবস্থায় আসে তো আমরা বলে থাকি যে, তার একটি নিজস্ব চরিত্র আছে। তার বাস্তব জীবনে একটি নিয়ম-শৃংখলা, একটি ধারাবাহিকতা আছে। পরন্তু সে কোন্ অবস্থায় কি কাজ করবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।

কর্ম-শৃংখলার প্রথম শর্ত

এর থেকে জানা গেল যে, মানুষের বাস্তব জীবনে একটি নির্ভরযোগ্য নিয়ম-শৃংখলা অবলম্বন নির্ভর করে তার এক নির্দিষ্ট চরিত্র গঠনের ওপর। আর

এরূপ চরিত্র গঠন করতে হলে তার মন-মানসকে চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে হবে, তার ভেতরে কতিপয় বিশিষ্ট চিন্তাধারা বদ্ধমূল হতে হবে এবং অন্য কোন প্রকার চিন্তাধারা প্রবিষ্ট হতে এবং তার মনোজগতে যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে না পারে, উক্ত চিন্তাধারায় এতটা স্থিতি, দৃঢ়তা ও অনমনীয়তার সঞ্চার করতে হবে। এ চিন্তাধারা যতটা গভীরে প্রোথিত হবে, চরিত্র ততটাই বেশী মযবুত হবে, আর মানুষের বাস্তব জীবন ততখানিই সুবিন্যস্ত, সুসংহত ও নির্ভরযোগ্য হবে। অপর দিকে এতে যতটা দুর্বলতা থাকবে, প্রতিকূল চিন্তাধারাকে পথ করে দেবার যতখানি অবকাশ থাকবে, চরিত্র ততটাই দুর্বল হবে আর বাস্তব জীবনও সেই পরিমাণে বিশৃঙ্খল ও অনির্ভরযোগ্য হয়ে যাবে।

ঈমানের অর্থ

কুরআনের ভাষায় চরিত্রের এ মানসিক ভিত্তিকেই বলা হয় 'ঈমান'। ঈমান শব্দটি 'আমন' (اَمَنَ) ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'আমন'-এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আত্মার প্রশান্তি ও নির্ভীকতা লাভ। এর থেকেই গঠিত হয়েছে 'আমানত', এটি খেয়ানতের বিপরীত শব্দ। অর্থাৎ যাতে খেয়ানতের ভয় নেই, তাই হচ্ছে আমানত। আমীনকে এ জন্যেই আমীন বলা হয় যে, তার সদাচরণ সম্পর্কে অন্তর নিঃশংক হয়, সে অসদাচরণ করবে না বলে ভরসা হয়। এভাবে যে উষ্ট্রী নিরীহ ও অনুগত হয়, তাকে 'আমুন' (اَمُوْنٌ) বলা হয়। কারণ তার দ্বারা অবাধ্যতা ও অনিষ্টকারিতার কোন ভয় থাকে না। এ মূল বর্ণ থেকেই আরেকটি ধাতু রূপ হচ্ছে 'ঈমান' (اِيْمَانٌ)। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মনের ভেতর কোন কথা গভীর প্রত্যয় ও সর্ত্যতার সাথে এমনভাবে দৃঢ়মূল করে নিতে হবে যে, তার প্রতিকূল কোন জিনিসের পথ খুঁজে পাওয়া ও প্রবিষ্ট হবার শংকাই বাকী থাকবে না, ঈমানের দুর্বলতার অর্থ হচ্ছে এই যে, মন-মানস ঐ কথায় পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়নি, অন্তঃকরণ পুরোপুরি প্রশান্তি লাভ করেনি, বরং তার প্রতিকূল কথারও মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হবার সুযোগ রয়েছে। এরই ফলে চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং এটিই বাস্তব জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। ঈমানের শক্তি ও দৃঢ়তা লাভ হচ্ছে এর বিপরীত জিনিস। সুদৃঢ় ঈমানের অর্থ হচ্ছে এই যে, চরিত্র ঠিক মজবুত ও নিশ্চিত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবার নির্ভর করা চলে যে, মনের ভেতর যে চিন্তা ও ভাবধারা বদ্ধমূল হয়েছে এবং যাদ্বারা চরিত্রের ছাঁচ তৈরী হয়েছে, বাস্তব ক্রিয়া-কাণ্ড ঠিক তদনুসারেই সম্পাদিত হবে।

সংস্কৃতির ভিত রচনায় ঈমানের স্থান

যদি বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের আকীদা ও চিন্তাধারার প্রতি ঈমান রাখে এবং তাদের চরিত্র বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে কোন সামাজিক ও সামগ্রিক সংস্থাই গঠিত হতে পারে না। তাদের

দৃষ্টান্ত হলো, যেমন কোন ময়দানে অনেকগুলো পাথর বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে; প্রতিটি পাথরের নিজস্ব দৃঢ়তা আছে বটে, কিন্তু তাদের ভেতরে কোন সম্পর্ক সূত্র নেই। পক্ষান্তরে যদি একটি অখন্ড ভাবধারা বহু সংখ্যক লোকের মনে ঈমান হিসেবে বদ্ধমূল হয় তো ঈমানের এ ঐক্য সূত্রই তাদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করবে—যেমন করে ঐ বিক্ষিপ্ত পাথরগুলোকেই চুন-সুর্কি-সিমেন্ট দ্বারা গেঁথে দেয়া হলে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর দাঁড়িয়ে যাবে। এবার তাদের মধ্যে যথারীতি সহায়তা ও সহযোগিতা শুরু হয়ে যাবে, এর ফলে তাদের উন্নতির গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকবে। একই ধরনের ঈমান তাদের চরিত্রে সামঞ্জস্য এবং বাস্তব ক্রিয়া-কাণ্ডে সাদৃশ্যের সৃষ্টি করবে। এর ফলে একটি বিশেষ তমদ্দুন জন্মলাভ করবে, এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করবে। এক নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটবে এবং সংস্কৃতির ভবনকে এক নতুন পদ্ধতিতে নির্মিত করবে।

এ আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, যে মৌলিক চিন্তাধারা একটি সংস্কৃতির অনুগামীদের মধ্যে ঈমানরূপে বদ্ধমূল হয়ে যায়, সে সংস্কৃতিতে তার গুরুত্ব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

ঈমান দু' প্রকার

এবার ঈমানের দিক দিয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতির অবস্থা কিরূপ, তাই আমাদের দেখা দরকার। ঈমান শব্দটি আসলে একটি ধর্মীয় পরিভাষা। কিন্তু এখানে যেহেতু আমরা তাকে মৌলিক ভাবধারার অর্থে ব্যবহার করছি, সেহেতু এ অর্থে তাকে দু' শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। একটি হচ্ছে ধর্মীয় ধরনের, অপরটি পার্থিব ধরনের। ধর্মীয় ধরনের ঈমান কেবল ধর্ম ভিত্তিক সংস্কৃতিরই মূলভিত্তি হতে পারে ; কারণ এ অবস্থায় একই ঈমান দ্বীন ও দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রেই কর্তৃত্বশীল হয়ে থাকে। কিন্তু যে সংস্কৃতি ধর্ম ভিত্তিক নয়, তাতে পার্থিব ঈমান ধর্মীয় ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে ধর্মীয় ঈমানের কোন প্রভাবই থাকে না।

ধর্মীয় ঈমান

ধর্মীয় ঈমান সাধারণত এমন সব বিষয় নিয়ে গঠিত হয়, যা মানবীয় চরিত্রকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তির ওপর গড়ে তোলে। যেমন, বিশিষ্ট গুণাবলীতে ভূষিত এক বা একাধিক উপাস্য, ঐশী বলে স্বীকৃত কিতাবাদি এবং ধর্মগুরুদের শিক্ষা ও নিয়ম-নীতি, যার ওপর প্রত্যয় ও কর্মের ভিত্তি স্থাপিত। দ্বীনী দৃষ্টিভঙ্গী বাদ দিলে নিছক পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের ঈমানের সাফল্য দু'টি জিনিসের ওপর নির্ভরশীল। প্রথম এই যে, ধর্ম যে বিষয়গুলোকে

সত্য বলে মানার এবং যেগুলোর প্রতি প্রত্যয় পোষণের দাবী জানিয়েছে, যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির দিক দিয়ে সেগুলোর সত্যোপযোগী হতে হবে। দ্বিতীয় এই যে, সে বিষয়গুলো এমন ধরনের হতে হবে, যাতে করে সেগুলোর ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে মানবীয় চরিত্রের পুনর্গঠন হতে পারে। অর্থাৎ তার আধ্যাত্মিকতা যাতে এক উন্নতমানের নৈতিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিস্থাপনকারী হয় এবং তার নৈতিক চরিত্র নিজস্ব পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে পার্থিব জীবনেও মানুষকে সাফল্য ও সার্থকতা লাভের উপযোগী করে তোলে, চরিত্রকে তার এমনভাবে গঠন করতে হবে।

প্রথম শর্তটি এ জন্যে জরুরী যে, ঈমান যদি নিছক কতকগুলো সংস্কারের সমষ্টি হয় কিংবা তাতে সংস্কার বেশী ও যুক্তির পরিমাণ কম হয়, তবে মানুষের মনে তার প্রাধান্য সম্পূর্ণত অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার প্রভাবাধীন থাকবে। যে মাত্র মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি ক্রমবিকাশের উন্নত স্তরের দিকে যাত্রা শুরু করবে, তখনি ভ্রান্ত সংস্কারে মোহ ভঙ্গ শুরু হয়ে যাবে, ঈমানের ভিত্তি টলমলিয়ে ওঠবে এবং সে সাথে যে আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার ওপর ব্যক্তি ও জাতীয় চরিত্রের বুনিয়াদ রচনা করা হয়েছিলো, তার গোটা ব্যবস্থাপনাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বিভিন্ন শেরক ভিত্তিক ধর্ম দেব-দেবী, উপাস্য,আল্লাহ ও ধর্মগুরুদের সম্পর্কে যেসব ধারণা বিশ্বাস পেশ করে, তার কথা উল্লেখ করতে পারি।তাদেরকে যেসব গুণাবলী দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে, যেসব ক্রিয়া-কাণ্ড তাদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে, যেসব কাহিনী তাদের সম্পর্কে রচনা করা হয়েছে, নিরপেক্ষ বিবেক-বুদ্ধি সে সবকে সত্য বলে মানতে এবং সেগুলোর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকৃতি জানায়। আর প্রায়শই দেখা যায় যে, ঐগুলোর প্রতি বিশ্বাস পোষণকারী জাতি দুনিয়ায় উন্নতি ও অগ্রগতি লাভের উপযুক্তই হয় না। ভ্রান্ত সংস্কার তাদের মনের ওপর এমন মন্দ প্রভাব বিস্তার করে যে, উৎকৃষ্টতম কর্ম-শক্তিগুলোই একেবারে নিস্তেজ হয়ে যায়। তাদের প্রেরণায় না মহত্তের সৃষ্টি হয়, না সংকল্পে হয় দৃঢ়তা। তাদের দৃষ্টিতে না ব্যপ্তির সৃষ্টি হয়, না মগজে হয় আলো আর না হৃদয়ে হয় সৎ সাহস। অবশেষে এ জিনিসটাই ঐ জাতির জন্যে স্থায়ী দারিদ্র, লাঞ্ছনা, অপদার্থতা ও গোলামীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে যে সকল জাতির সামনে অন্য কারণে উন্নতির পথ খুলে যায়, তারা জ্ঞান্‌-বুদ্ধির দিক থেকে যতো উন্নতি করতে থাকে, আপন রব, উপাস্য ও ধর্মগুরুদের ওপর থেকে ততোই তাদের বিশ্বাস চলে যেতে থাকে। প্রথম দিকে অবশ্য নিছক সমাজ ব্যবস্থার নিরাপত্তার খাতিরে ঐ ভ্রান্ত ঈমানকে নিতান্ত অসুবিধা সত্ত্বেও বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে ঐগুলোর বিরুদ্ধে মন-মগজ এতো তীব্রভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে যে, শেষ পর্যন্ত জাতির

মনে ঐগুলোর জন্যে কোন বাঁধনই অবশিষ্ট থাকে না। নিছক ক্ষুদ্র একটি আধ্যাত্মিক দলকে ঐগুলোর প্রতি যথার্থ কিংবা পেশাদারী ঈমানের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়। বাকী গোটা জাতির হৃদয় ও মনেই এক ভিন্ন ধরনের ঈমান—আমরা যাকে পার্থিব ঈমান বলে অভিহিত করেছি–আধিপত্য বিস্তার করে বসে।

দ্বিতীয় শর্তটির আবশ্যকতা একেবারে সুস্পষ্ট। যে ঈমান মানুষকে পার্থিব জীবনে সাফল্য অর্জনের জন্যে তৈরী করতে পারে না, তার প্রভাব শুধু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনেই সীমিত থাকে, বৈষয়িক জীবন পর্যন্ত পৌছতে পারে না। পরিণতির দিক থেকে এরও দু'টি অবস্থা রয়েছে। হয় ঐগুলোর কারণে ঐগুলোর প্রতি বিশ্বাসী জাতি কোন উন্নতিই করবে না ; অথবা উন্নতি করলেও ঐগুলোর বাঁধন থেকে খুব শীগগীরই মুক্তি লাভ করবে, ধর্মীয় ঈমান সাংস্কৃতিক ঈমানের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেবে ; আর বৈষয়িক জীবনের কর্ম প্রচেষ্টায় জাতির তৎপরতা যখন বেড়ে যাবে, তখন নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় ঈমানের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ধর্মের ছিদ্রান্বেষণ করতে চাই না। এ জন্যে বিভিন্ন ধর্মের প্রত্যয়াদি সম্পর্কে এখানে কোন বিস্তৃত আলোচনা করবো না। আপনারা দুনিয়ার ধর্মগুলো অভিনিবেশ সহকারে পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন ধর্মের ঈমান কিভাবে তাদের অনুসারীদেরকে পার্থিব জীবনে উন্নতি লাভ করতে বাধা দিয়েছে এবং কিভাবে জ্ঞান ও বুদ্ধির উন্নতির সাথে সাথে বিভিন্ন ধর্মের সহযোগিতা করতে পারেনি, তা অবশ্যই জানতে পারবেন। পরন্তু আপনারা এ-ও দেখতে পাবেন যে, অন্যান্য জাতিগুলো পতনকালে নিজেদের ধর্মীয় বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান রেখেছে এবং উত্থানকালে সেগুলো পরিহার করেছে। পক্ষান্তরে মুসলমান তার ঈমানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী মযবুত ছিলো তখন, যখন সে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশী উন্নত ও অগ্রসর ছিলো। আর যখন সে বুদ্ধি-জ্ঞানে ও পার্থিব উন্নতিতে পিছনে পড়ে রইলো এবং অন্যান্য জাতি তাদের ওপর বিজয় লাভ করলো, তার ঈমানের ভেতর দুর্বলতা আসে ঠিক তখনই। আজ মুসলমানদের চরম পতন অবস্থা। সে সাথে ঈমানী দৌর্বল্যের ব্যাধিতেও তারা তীব্রভাবে আক্রান্ত। কিন্তু আজ থেকে হাজার বারো শো বছর পূর্বে তারা ছিলো উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থিত ; আর সে সাথে নিজেদের ঈমানের ক্ষেত্রেও ছিলো চূড়ান্ত রকমের মযবুত। পক্ষান্তরে ইউরোপের খৃষ্টান ও জাপানের বৌদ্ধগণ যখন প্রকৃত খৃষ্টান ও বৌদ্ধ ছিলো তখন তারা ছিলো চূড়ান্ত পর্যায়ের অধপতিত। আর যখন তারা উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করলো তখন খৃষ্টবাদ ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাদের আর ঈমান রইল না। বস্তুত ইসলামের ঈমান ও অন্যান্য ধর্মের ঈমানের মধ্যে এ এমন এক উজ্জ্বল পার্থক্য যে, যে কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম।

পার্থিব ঈমান

এবার যে বিষয়গুলোকে আমরা পার্থিব ঈমান বলে অভিহিত করেছি, সেগুলোর প্রতি দৃকপাত করা যাক। এ ঈমানের ভেতর কোন ধর্মীয় উপাদানের অস্তিত্ব নেই। এখানে না কোন খোদা আছে, না আছে কোন ধর্মগুরু ; না কোন ঐশী কিতাব আছে, না আছে মানব চরিত্রকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর গঠন করার উপযোগী কোন শিক্ষাদীক্ষা। এ হচ্ছে খালেছ পার্থিব বিষয়।

এর ভেতর সবচেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে 'কওম' বা জাতি। এটিকে এক ভৌগলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী লোকেরা মা'বুদ (উপাস্য) বানিয়ে পূর্ণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে পূজা করে থাকে। এদিক থেকে সমস্ত 'জাতি পূজক' এ মর্মে ঈমান পোষণ করে যে, জাতি হচ্ছে তাদের ধন ও প্রাণের মালিক, তার খেদমত ও হেফাযত করা অবশ্য কর্তব্য, তার উদ্দেশ্যে দেহ-মন ও ধন-প্রাণ উৎসর্গ করা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। কেবল এটুকুই নয় বরং তারা এ বিশ্বাসও পোষণ করে যে, একমাত্র তাদের জাতিই সত্যাশ্রয়ী, তারাই ভূমির উত্তরাধিকারী ও পাওনাদার, দুনিয়ার সকল ভূমি হচ্ছে তাদের জন্যে যুদ্ধলব্ধ মাল এবং সমুদয় জাতি যুদ্ধবন্দী তুল্য। তাই সারা দুনিয়ায় আপন জাতির ঝাণ্ডা উড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্তব্য।

দ্বিতীয় মা'বুদ হচ্ছে দেশের 'আইন-কানুন'। এটি তারা নিজেরাই তৈরী করে, আবার নিজেরাই এর উপাসনা করে। এ উপাসনাই হচ্ছে তাদের সামাজিক ও সামগ্রিক নিয়ম-শৃংখলার নিশ্চয়তা দানকারী।

তৃতীয় মা'বুদ হচ্ছে তাদের নিজস্ব 'নফস' বা প্রবৃত্তি। এর প্রতিপালন, এর ইচ্ছা ও প্রয়োজন পূরণ এবং এর দাবী ও আকাংখার চরিতার্থতার প্রতি তারা সর্বদা লক্ষ্য রাখে।

চতুর্থ মা'বুদ হচ্ছে 'জ্ঞান' ও 'বিচক্ষণতা' (ইলম ও হেকমত)। এর প্রতি ঈমান পোষণ করে, এর আলোকে ও পথ-নির্দেশে তারা উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে চলে।

এ ঈমান নিশ্চিতরূপে পার্থিব জীবনের জন্যে কিছু পরিমাণ কল্যাণকর। কিন্তু সত্য ও সততার দিক দিয়ে এর মর্যাদা কতটুকু, এ প্রশ্ন ছেড়ে দিলেও নিছক পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা চলে যে, এর কল্যাণকারিতা না যথার্থ, আর না চিরস্থায়ী। এর সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি এই যে, এতে কোন আত্মিক বা নৈতিক উপাদানের অস্তিত্ব থাকে না, তাই ধর্মের বাঁধন শিথিল হতেই নৈতিক বিকৃতির দরজা খুলে যায়। আবার লোকদের অন্তরে নৈতিক চেতনার সৃষ্টি করা এবং প্রকৃতপক্ষে নৈতিকতার কোন মান প্রতিষ্ঠা করা আইনের কাজ নয়। এমন

কি, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নৈতিকতার সংরক্ষণ করতে পারে, এমন কোন শক্তিও তার ভেতরে বর্তমান নেই। তার প্রভাব ও কর্মক্ষেত্র অতি সীমিত। বিশেষত যে আইন-কানুন লোকদের নিজেদের তৈরী, এ ব্যাপারে তার অসহায়তা আরো প্রকট। এ জন্যেই এরূপ আইনের বাঁধনকে শিথিল ও সংকুচিত করা সম্পূর্ণ লোকদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার ; লোকদের ভেতর যতোই কর্ম স্বাধীনতার আকাংখা বৃদ্ধি পায়, পুরানো নৈতিক বাঁধনকে ততোই সংকুচিত ও অসহনীয় মনে হয়। আর নৈতিক বাঁধন সম্পর্কে এ অনুভূতি যখন ব্যাপকতর হয়ে পড়ে, তখন জনমতের চাপে নিজের বাঁধনকে শিথিল করতে আইন স্বতঃই বাধ্য হয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে নৈতিকতার সমস্ত বাঁধনই খুলে যায় এবং এক ব্যাপক নৈতিক অধপতন শুরু হয়ে যায়। আর নৈতিক অধপতন এমন একটি বস্তু যে, তার ধ্বংসাত্মক প্রভাবকে সম্পদের প্রাচুর্য, রাষ্ট্রশক্তি, বৈষয়িক উপাদান, জ্ঞান বুদ্ধি এর কোনটিই প্রতিরোধ করতে পারে না। এ ঘুণ ভেতর থেকেই ধরতে শুরু করে এবং দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর ইমারতকেও তার সাজসজ্জা সমেত ধ্বসিয়ে দেয়।

এছাড়া জাতিপূজা ও আত্মপূজার অন্যান্য অনিষ্টকারিতাও এমন প্রকট যে, তার বিস্তৃত ও পুংখানুপুংখ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এখন তো ঐগুলো বুঝার জন্যে কোন আলাপ-আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনারই প্রয়োজন হয় না। কারণ ঐগুলো মতবাদের পর্যায় অতিক্রম করে উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণের স্তরে এসে পড়েছে। আমরা আজ স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি যে, ঐগুলোর কারণেই এক বিরাট সংস্কৃতি ধ্বংস ও উৎসন্নতার প্রান্তদেশে এসে পৌছেছে। আজ যেসব বস্তুর নিশ্চিত আত্মপ্রকাশের শঙ্কা গোটা দুনিয়াকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে, এ হচ্ছে সে সবেরই অনিবার্য পরিণতি।

কতিপয় সাধারণ মূলনীতি

এ গোটা আলোচনা থেকে কতিপয় সাধারণ মূলনীতি স্থিরীকৃত হয়। এগুলোকে পরবর্তী আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে এক সঠিক পরম্পরার সাথে হৃদয়ে বদ্ধমূল করা দরকার।

এক ঃ মানুষের সকল ক্রিয়া-কাণ্ডের শৃংখলা ও সুসংহতি নির্ভর করে তার এক সুস্থির ও সুনির্দিষ্ট চরিত্র গঠনের ওপর। কোন সুস্থির চরিত্র ছাড়া মানুষের বাস্তব জীবন বিশৃংখল, পরিবর্তনশীল ও অনির্ভরযোগ্যই থেকে যায়।

দুই ঃ যেসব ভাবধারা পূর্ণ শক্তি সহকারে মানুষের মনের ভেতর বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং তার সমুদয় কর্মশক্তি নিজস্ব প্রভাবাধীন নিয়ে কাজ করানোর মত প্রাধান্য লাভ করে, তাদের ওপরই চরিত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ইসলামী

পরিভাষায় এ বদ্ধমূল হওয়াকেই বলা হয় 'ঈমান' আর এরূপ বদ্ধমূল যাবতীয় ভাবধারাকেই আমরা 'ঈমানিয়াত' বলে অভিহিত করে থাকি।

তিন ঃ চরিত্রের ভালো-মন্দ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং দৃঢ় ও দুর্বল হওয়া সম্পূর্ণত ঐ 'ঈমানিয়াত' তথা ঈমানের বিষয়গুলোর সুষ্ঠুতা ও দৃঢ়তার ওপর নির্ভরশীল। ওগুলো নির্ভুল হলে চরিত্রও নির্ভুল হবে, মযবুত হলে চরিত্রও মযবুত হবে। নতুবা ব্যাপার ঠিক বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং মানুষের জীবনে এক নির্ভুল ও উন্নতমানের নিয়ম-শৃংখলা স্থাপন করতে হলে তার চরিত্রকে এক অভ্রান্ত ও সুদৃঢ় ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা অপরিহার্য।

চার ঃ ব্যক্তির একক জীবনের ক্রিয়া-কাণ্ডকে বিক্ষিপ্ততার কবল থেকে মুক্ত করে সংহত ও শৃংখলাবদ্ধ করার জন্যে যেমন ঈমানের প্রয়োজন, তেমনি বহু ব্যক্তিকে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা থেকে উদ্ধার করে একটি সুশৃংখল ও সুসংবদ্ধ সমাজ গঠন করতে হলে তাদের সবার হৃদয়েই এক অখণ্ড ঈমান দৃঢ়মূল করে দেয়া একান্ত আবশ্যক। সমাজ ও তমদ্দুন এটাই দাবী করে।

পাঁচ ঃ এক অখণ্ড ঈমানের প্রভাবাধীনে বহু ব্যক্তির মধ্যে যখন এক অখণ্ড জাতীয় চরিত্র গড়ে ওঠে এবং সেই চরিত্রের প্রভাবে তাদের জীবনের কর্মকাণ্ডে এক প্রকারের সাদৃশ্যের সৃষ্টি হয়, তখনই এক বিশেষ ধরন ও প্রকৃতির সংস্কৃতি জন্মলাভ করে। এ দৃষ্টিতে প্রত্যেক সংস্কৃতিরই সংগঠন ও গোড়াপত্তন জাতীয় চরিত্র নিরুপণ ও দৃঢ়তা বিধানকারী ঈমানের বিষয়গুলো অত্যন্ত প্রভাবশীল হয়ে থাকে।

ছয় ঃ যে জাতির ঈমান আধ্যাত্মিক বিষয় সমন্বিত, তার ধর্ম ও সংস্কৃতি হচ্ছে এক ও অভিন্ন। আর যে জাতির ঈমান দুনিয়াবী বিষয় সমন্বিত, সংস্কৃতি তার ধর্ম থেকে পৃথক হয়ে থাকে। এ শেষোক্ত অবস্থায় ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনে ধর্মের কোন বিশেষ প্রভাব বাকী থাকে না।

সাত ঃ ধর্ম থেকে সংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতা শেষ পর্যন্ত নৈতিক অধপতন ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আট ঃ সংস্কৃতিকে ধর্মের প্রভাবাধীনে থাকতে হলে ধর্মের 'ঈমানিয়াতকে' এমন আধ্যাত্মিক বিষয় সমন্বিত হতে হবে, যেন মামুলি পর্যায় থেকে নিয়ে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত তা মানুষের বুদ্ধি-বিকাশের সহায়তা করতে পারে। সে সঙ্গে মানুষ যাতে যুগপৎ উচ্চমানের দ্বীনদার ও দুনিয়াদার উভয়ই হতে পারে, সে বিষয়গুলোর দ্বারা তার চরিত্রকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে। বরং তার দুনিয়াদারী ঠিক দ্বীনদারী এবং দ্বীনদারী ঠিক দুনিয়াদারীতে পরিণত হবে।

নয় ঃ যে জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন, তার ঈমান শুধু ধর্মীয় ঈমানই নয়, বরং তা যুগপৎ পার্থিব ঈমানও হয়ে থাকে। সুতরাং তার ঈমান টলমলিয়ে ওঠা তার ধর্ম ও সংস্কৃতি উভয়ের জন্যেই মারাত্মক, তার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের পক্ষেই ধ্বংসাত্মক।

এ সাধারণ মূলনীতিগুলোর প্রেক্ষিতেই আমাদেরকে ঈমান সম্পর্কে ইসলামের ভূমিকার প্রতি সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

ঈমানের তাৎপর্য, ব্যক্তি চরিত্রে তার বুনিয়াদী গুরুত্ব এবং সামাজিক ও সামগ্রিক সংস্কৃতিতে তার মৌলিক ভূমিকার পর এবার দেখা যাক ইসলাম কি কি জিনিসের প্রতি ঈমান পোষণের আহ্বান জানিয়েছে ? তার ঈমানিয়াত যুক্তিবাদী সমালোচনার মানদণ্ডে কতখানি উত্তীর্ণ হয় ? তার জীবন পদ্ধতিতে ঈমানের ভূমিকা কি ? এবং মানুষের ব্যক্তি চরিত্র ও সামগ্রিক চরিত্রে তা কতখানি প্রভাবশীল হয় ?

২. ইসলামে ঈমানের বিষয়

কুরআন মজিদে ঈমানের বিষয় সম্বন্ধে এতো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার ভেতর কোন মতভেদের অবকাশ নেই। কিন্তু যারা কুরআনের বাকরীতি অনুধাবন করতে পারেনি, অথবা তার বক্তব্য বিষয় অনুসরণ করতে সক্ষম হয়নি, তাদের মধ্যে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। কুরআনের বাকরীতি হচ্ছে এই যে, কোথাও সে গোটা প্রত্যয়কে একই সঙ্গে বিবৃত করেছে, আবার কোথাও সময় ও সুযোগ অনুযায়ী তার কোন কোন অংশ বিবৃত করে তারই ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। এর থেকে কোন কোন লোক এ ধারণা করে বসেছে যে, ইসলামের প্রত্যয়কে বিশিষ্ট ও বিভক্ত করা যেতে পারে। অর্থাৎ তার ভেতর থেকে কোন একটি কিংবা কোন কোনটির প্রতি ঈমান পোষণই যথেষ্ট আর কোন কোনটি অস্বীকার করেও মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে। অথচ কুরআনের চূড়ান্ত ফায়সালা এই যে, প্রত্যয় হিসেবে যতগুলো বিষয়কে সে পেশ করেছে, তার সবকিছুই স্বীকার করা আবশ্যক। তার একটি থেকে অপরটিকে কিছুতেই পৃথক করা চলে না। তার সবগুলো মিলে একটি অখণ্ড ও অবিভক্ত সত্তায় পরিণত হয় এবং তাকে সামগ্রিকভাবে মেনে নেয়াই কর্তব্য। তার কোন একটিকেও যদি অস্বীকার করা হয় তাহলে সে অস্বীকৃতি বাকী সবগুলোর স্বীকৃতিকে নাকচ করে দেবে।

কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ -

"নিশ্চয়ই যারা বলে ঃ আমাদের রব আল্লাহ, অতপর দৃঢ়পদ থাকে তাদের প্রতি ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়।"-(সূরা হা-মীম আস সিজদা ঃ ৩০)

এ আয়াতে শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এরই ওপর দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য নির্ভরশীল বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় এক জায়গায় আল্লাহর সাথে শেষ দিবসের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج

"যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রভুর কাছে তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ৬২)

এ একই বিষয়বস্তু আলে ইমরান (১২) মায়েদা (১০) এবং রায়াদ (৪) এও রয়েছে।

তৃতীয় এক স্থানে আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান পোষণের আহ্বান জানানো হয়েছে ঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ج وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

"তাই তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। যদি তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে তোমাদের জন্যে রয়েছে মহান পুরস্কার।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৯)

এরূপ বক্তব্য বিষয় হাদীদ (৪)-এও রয়েছে।

অপর এক জায়গায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, তাকেই বলা হয়েছে ঈমানদার ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ـ(النور : ٦٢)

"নিশ্চয়ই তারা ঈমানদার যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে।"–(সূরা আন নূর ঃ ৬২)

মুহাম্মাদ (৪), জ্বিন (২) ও আল ফাতাহ (২)-এ এ বিষয়টিরই পুনরুক্তি করা হয়েছে।

এক জায়গায় আল্লাহ, মুহাম্মাদ (স), কুরআন—এ তিনটি জিনিসের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ط ـ(التغابن : ٨)

"অতএব তোমরা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং আমি যে নূর (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি তার প্রতি ঈমান আন।"–(সূরা আত তাগাবুন ঃ ৮)

এক জায়গায় আল্লাহ, আল্লাহর কিতাব, কুরআন ও শেষ দিন—এ চারটি জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ .... وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط(النساء : ١٦٢)

"এবং ঈমানদারগণ ঈমান আনে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি .... এবং বিশ্বাস করে আল্লাহ ও শেষ দিনকে।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১৬২)

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ, ফেরেশতা, পয়গম্বর ও কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসকে কুফরী ও ফাসেকী বলে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكٰلَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكٰفِرِيْنَ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۚ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ (البقرة : ٩٨-٩٩)

"যারা আল্লাহ, তার ফেরেশতামণ্ডলী, রসূলগণ, জিবরাঈল ও মিকাঈলের সাথে শত্রুতা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই কাফেরদের শত্রু। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি ; এটাকে ফাসেক ছাড়া অন্য কেউ অবিশ্বাস করে না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৯৮-৯৯)

এক জায়গায় আল্লাহ, ফেরেশতা, আল্লাহর কিতাব, পয়গম্বর ও কুরআনের প্রতি ঈমান পোষণকারীকে মু'মিন বলা হয়েছে ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰۤئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف (البقرة : ٢٨٥)

"রসূলের প্রতি তার প্রভুর কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে সে তা বিশ্বাস করেছে এবং ঈমানদারগণও। সকলেই বিশ্বাস করেছে, আল্লাহ তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, কিতাবসমূহ ও রসূলগণকে।"-(সূরা বাকারা ঃ ২৮৫)

অন্য এক জায়গায় ঈমানের পাঁচটি অংশ বিবৃত করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতি, শেষ দিনের প্রতি, ফেরেশতার প্রতি, আল্লাহর কিতাবের প্রতি ও পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান।

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ ..... اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ (البقرة : ١٧٧)

"বরং প্রকৃত পুন্যের কাজ এই যে, মানুষ আল্লাহকে, পরকাল ও ফেরেশতাকে এবং আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও তার নবীদিগকে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে মান্য করবে। .... বস্তুত এরাই প্রকৃত সত্যপন্থী এরাই মুত্তাকী।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

সূরা নিসায়ে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের সংগে মুহাম্মাদ (স) ও কুরআনের প্রতিও ঈমান আনার তাকীদ করা হয়েছে। এবং ঐসবের প্রতি অবিশ্বাস পোষণকারীকে কাফের ও গোমরাহ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

এক জায়গায় শুধু শেষ দিনের স্বীকৃতির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং তার প্রতি অস্বীকৃতিকে ব্যর্থতার কারণ বলে নির্দেশ করা হয়েছে। قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ-(الانعام : ٣١) এরই পুনরাবৃত্তি রয়েছে আরাফ (১৭), ইউনুস (১), ফোরকান (২), নমল (১) ও সাফ্ফাত (১)-এ।

অপর এক জায়গায় শেষ দিনের সঙ্গে আল্লাহর কিতাবের প্রতি অবিশ্বাসকেও কঠিনতম আযাবের কারণ নির্দেশ করা হয়েছে ঃ

اِنَّهُمْ كَانُوْا لَايَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝ وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا (النبا : ٢٧-٢٨)

"তারা তো কোনরূপ হিসাব-নিকাশ হওয়ার আশা পোশন করত না এবং আমাদের আয়াতসমূহকে তারা সম্পূর্ণ (মিথ্যা মনে করে) অবিশ্বাস করতো।"-(সূরা আন নাবা ঃ ২৭)

তৃতীয় এক জায়গায় শেষ দিন ও আল্লাহর কিতাবের সঙ্গে কুরআনকেও ঈমানিয়াতের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

"সে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন) এবং তোমার পূর্বে সেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সেসবকেই বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। বস্তুত এ ধরনের লোকেরাই তাদের আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ জীবনব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাওয়ার অধিকারী।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৪-৫)

চতুর্থ এক স্থানে বলা হয়েছে যে, শেষ দিন, আল্লাহর কিতাব এবং পয়গাম্বরদের প্রতি অবিশ্বাসের ফলে সকল ক্রিয়াকলাপই পণ্ড হয়ে যায়। এরূপ অবিশ্বাসী ব্যক্তিই হচ্ছে জাহান্নামী এবং তার 'আমলের' কোনই মূল্য নেই।

উপরে আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনার কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর ভিতর তাওরাত, ইনজীল, জবুর ও ছুহুফে ইবরাহীমের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের বিশটি জায়গায় একথাও স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে যে, শুধু ঐ কিতাবগুলো মানাই যথেষ্ট নয়, ঐগুলোর সাথে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনও আবশ্যক। যদি কোন ব্যক্তি সমস্ত কিতাবের

প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে আর কুরআনকে করে অবিশ্বাস, তবে সে সমস্ত কিতাবের প্রতি অবিশ্বাস পোষণকারীর মতোই কাফের। [দ্রষ্টব্য ঃ বাকারা (১১, ১২, ১৪, ১৬), নিসা (৭) মায়েদা (২-১০), রা'দ (৩), আনকাবুত (৫) ও জুমার (৪)] কেবল এটুকুই নয়, আল্লাহর প্রেরিত প্রতিটি কিতাবই পুরোপুরি মানা আবশ্যক। "যদি কোন ব্যক্তি তার কিছু অংশ মানে আর কিছু অংশ না মানে, তবে সেও কাফের।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১০)

অনুরূপভাবে নবীদের সম্পর্কে স্পষ্টত বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সবার প্রতি ঈমান আনা প্রয়োজন। যাঁদের নামোল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের প্রতি পৃথকভাবে আর যাঁদের নামোল্লেখ নেই, তাদের প্রতি মোটামুটিভাবে ঈমান আনতে হবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি সমস্ত নবীর প্রতি ঈমান রাখে আর শুধু মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতকে অবিশ্বাস করে, তবে সে নিশ্চিতরূপে কাফের। কুরআনে শুধু এক জায়গায় নয়, বিশটি স্থানে একথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং সমস্ত নবীর সাথে মুহাম্মাদ (স)-এর রেসালাতের স্বীকৃতিকে ঈমানের আবশ্যিক শর্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য ঃ বাকারা (১৪), নিসা (২৩), মায়েদা (৩-১১), আনআম (১৯), আরাফ (১৯-২০), আনফাল (৩), মু'মিনুন (৪), শুরা (৫), মুহাম্মাদ (১) ও তালাক (২)] এর ভেতরকার বেশীর ভাগ আয়াতেই হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মতদেরকে নবী করীম (স)-এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, যে পর্যন্ত তোমরা কুরআন ও মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান না আনবে সে পর্যন্ত তোমরা হেদায়াত পেতে পারবে না।

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, ইসলামে ঈমানের বিষয় হচ্ছে পাঁচটিঃ যথা (১) আল্লাহ, (২) ফেরেশতা, (৩) আল্লাহর কিতাব (এর ভেতর কুরআনও অন্তর্ভুক্ত) (৪) নবী [হযরত মুহাম্মদ (স)ও এঁদের অন্তর্ভুক্ত] ও (৫) শেষ দিন অর্থাৎ কেয়ামত।[১]

এ হচ্ছে ঈমানের মোটামুটি পরিচয়। এর ভেতরকার প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে বিস্তৃত আকীদা কি, ঐগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক কি, কি কারণে ঐগুলোকে পৃথক করা চলে না এবং একটির প্রতি অস্বীকৃতির ফলে সবগুলোর অস্বীকৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে, পরন্তু ঐগুলোর প্রত্যেকটিকে ঈমানিয়াতের অন্তর্ভুক্ত করার ফায়দা কি—সামনে এগিয়ে এ সকল কথা বিবৃত করা হবে।

---

১. অবশ্য হাদীসে একটি ষষ্ঠ জিনিসের কথা উল্লেখিত হয়েছে, তাহলো وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমানের অংশ বিশেষ, কুরআনে এটি এ হিসেবেই বিবৃত হয়েছে, হাদীসে এটিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানের এ অংশটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রচ্ছন্নও, তাই মনের ভেতর একে জাগরুক রাখার জন্যে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

যুক্তিবাদী সমালোচনা

এ পাঁচটি প্রত্যয়ই অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং এ জড়জগতের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত। এ জন্যে আমাদের শ্রেণী ভাগ অনুযায়ী এটা হচ্ছে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রত্যয়। কিন্তু এর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলাম এর ওপর তার আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাই শুধু নয়, বরং নৈতিক, রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থারও ভিত্তি স্থাপন করেছে। সে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের সমন্বয়ে এমন একটি ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন করে যে, তার অধীনে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগই কাজ করতে থাকে। সে ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা স্থিতিশীলতা ও ব্যবহারাদির জন্যে যতো শক্তির প্রয়োজন, তা সবই ঐ পাঁচটি প্রত্যয় থেকে অর্জিত হয়। এ হচ্ছে তার জন্যে শক্তির এক অফুরন্ত উৎস, এর উৎসারণ কখনো রুদ্ধ হয়ে যায় না। এবার আমরা দেখবো যে, যে ঈমানিয়াত দ্বারা এতোবড়ো কাজ সম্পাদন করা হয়েছে, বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিতে তা কতখানি মর্যাদা লাভের অধিকারী এবং তার ভিতর এমন একটা ব্যাপক ও প্রগতিশীল ব্যবস্থার জন্যে ভিত্তি ও শক্তির উৎস হবার মতো কতোটা যোগ্যতা রয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধানের পূর্বে আমাদের মনে একথা বদ্ধমূল করে নিতে হবে যে, ইসলাম এমন একটি সংস্কৃতির ভিত রচনা করতে চায়, যা যথার্থভাবেই মানবীয় সংস্কৃতি। অর্থাৎ তার সম্পর্ক কোন বিশেষ দেশ বা গোত্রের লোকদের সংগে নয়, না কোন বিশিষ্ট বর্ণধারী বা ভাষা ভাষী জাতির সংগে তার কোন বিশিষ্টতা রয়েছে বরং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণই হচ্ছে তার লক্ষ্য। পরন্তু তার প্রভাবাধীনে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা তার কাম্য যেখানে মানুষের পক্ষে কল্যাণ ও মংগলকর প্রতিটি জিনিসেরই লালন-পালন করা এবং তার পক্ষে ক্ষতি ও অনিষ্টকর জিনিস মাত্রই নিশ্চিহ্ন করা হবে। এমন একটা খালেছ মানবীর সংস্কৃতির ভিত্তি আদৌ জড়জগতের সাথে সম্পৃক্ত ঈমানিয়াতের ওপর স্থাপন করা যেতে পারে না। কারণ জড় পদার্থ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয়ের দু'টি অবস্থাই বর্তমান ঃ হয় ঐগুলোর সাথে সমস্ত মানুষের সম্পর্ক তুল্য রূপ—যেমন সূর্য, চন্দ্র, জমিন, হাওয়া, আলো ইত্যাদি। ... নতুবা সেগুলোর সাথে সমস্ত মানুষের সম্পর্ক সমান নয়—যেমন দেশ, গোত্র, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি এর প্রথম শ্রেণীর জিনিসগুলোর ভেতর তো ঈমানের বিষয় হবার যোগ্যতাই নেই, কারণ ঐগুলোর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা নিতান্তই অর্থহীন, আর মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রে ঐগুলোর কোন ইচ্ছা-মূলক প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা তো জ্ঞান ও বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিতেই ভ্রান্ত। তাছাড়া কোন দিক থেকেই ঐগুলোর প্রতি ঈমান আনার কোন সুফল মানুষের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জীবনে প্রকাশ পায় না। এরপর থাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর জিনিস। স্পষ্টতই বোঝা যায়, ঐগুলো একটি বৃহত্তর মানবীয়

সংস্কৃতীয় ভিত্তি হতে পারে না। কারণ ঐগুলো হচ্ছে বৈষম্য ও ভেদবুদ্ধি প্রসুত, ঐক্য বা একত্বমূলক নয়। সুতরাং এ ধরনের সংস্কৃতির ভিত্তি জড় পদার্থ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর থেকে স্বতন্ত্র ঈমানের বিষয়ের ওপর স্থাপন করা একান্তই অপরিহার্য।

কিন্তু ঐগুলোর শুধু জড় পদার্থ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে স্বতন্ত্র হওয়াই যথেষ্ট নয়, সেই সংগে ঐগুলোর ভেতর আরো কতিপয় বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়।

এক ঃ সেগুলো কুসংস্কার বা অযৌক্তিক বিষয় হবে না, বরং সুস্থ বিচার-বুদ্ধি সেগুলোর সত্যতা স্বীকার করতে আগ্রহশীল হবে।

দুই ঃ সেগুলো দূরবর্তী জিনিস হবে না, বরং আমাদের জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে।

তিন ঃ সেগুলোর ভেতরে এমন প্রচ্ছন্ন শক্তি নিহিত থাকবে যে, সংস্কৃতির ব্যবস্থাটি মানুষের চিন্তা ও কর্মশক্তির ওপর আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে তার থেকে পুরোপুরি সাহায্য লাভ করতে পারে।

এ দৃষ্টিতে আমরা ইসলামের ঈমানের বিষয়গুলোর প্রতি দৃকপাত করলে জানতে পারি যে, এ তিনটি পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়।

প্রথমত ইসলাম আল্লাহ, ফেরেশতা, অহী, নবুওয়াত ও পরকাল সম্পর্কে যে ধারণা পেশ করেছে, তার ভেতরে অযৌক্তিক কিছুই নেই। তার কোন একটি জিনিসও নির্ভুল হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়। আর তার কোন কথা মানতে সুস্থ বিচার-বুদ্ধি কখনো অস্বীকৃতিও জানায় না। অবশ্য বুদ্ধি বৃত্তি ঐগুলোর কোন সীমা নির্ধারণ করতে পারে না, ঐগুলোর শেষ প্রান্ত অবধি পৌছতে পারে না এবং তার অন্তর্গূঢ় তাৎপর্যও পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে না, একথা নিসন্দেহ। কিন্তু আমাদের পণ্ডিত বিজ্ঞানীগণ আজ পর্যন্ত যতগুলো বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন, তার সবগুলোরই এ একই অবস্থা। শক্তি (Energy), জীবন, আকর্ষণ, বিবর্তন এবং এ জাতীয় অন্যান্য জিনিসগুলোর অস্তিত্ব আমরা এ হিসেবে স্বীকার করিনি যে, ঐগুলোর অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য আমরা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছি। বরং এ জন্যে স্বীকার করেছি যে, আমরা যে বিভিন্ন ধরনের বিশিষ্ট লক্ষ্যগুলো পর্যবেক্ষণ করেছি সেগুলোর মূলগত কারণ ও নিমিত্ত বর্ণনার জন্যে আমাদের মতে ঐ জিনিসগুলোর বর্তমান থাকা আবশ্যক। আর দৃশ্যমান বস্তুর অদৃশ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যেসব মতবাদ আমরা গড়ে নিয়েছি, তা ঐ জিনিসগুলোর বর্তমান থাকারই দাবী জানায়। সুতরাং ইসলাম যে অদৃশ্য বস্তুগুলোর প্রতি ঈমান আনার দাবী করে, সেগুলোর সত্যতা স্বীকারের জন্যে ঐগুলোর গূঢ় তাৎপর্যকে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা পুরোপুরি উপলব্ধি করতে এবং ঐগুলোর সীমা নির্ধারণ করে নিতে হবে—এর কোন প্রয়োজন নেই। বরং তার জন্যে যুক্তি হিসেবে শুধু এটুকু কথা বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, বিশ্বপ্রকৃতি ও

মানুষ সম্পর্কে ইসলামের পেশকৃত মতাদর্শ মোটেই অযৌক্তিক নয়, তার নির্ভুল হওয়া সুনির্দিষ্ট এবং তা ইসলামের পেশকৃত ঈমানের পাঁচটি জিনিসেরই অস্তিত্ব দাবী করে।

ইসলামের মতাদর্শ হচ্ছে এই যে, এক **৪** বিশ্বপ্রকৃতির গোটা নিয়ম-শৃংখলা এক সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তিনিই তা পরিচালনা করেছেন। **দুই ৪** সেই সার্বভৌম শক্তির অধীনে অন্য এক শ্রেণীর অসংখ্য শক্তি তাঁর নির্দেশানুসারে এ বিশ্বপ্রকৃতির তত্ত্বাবধান করছে। **তিন ৪** মানুষের স্রষ্টা তার প্রকৃতিতে সৎ ও অসৎ এ দু'টি প্রবণতা দিয়ে রেখেছেন ; বুদ্ধিমত্তা ও নির্বুদ্ধিতা, জ্ঞানবত্তা ও অজ্ঞতা উভয়ই তার ভেতরে একত্রিত হয়েছে। ভ্রান্ত ও অভ্রান্ত উভয় পথেই সে চলতে পারে। এ পরস্পর বিরোধী শক্তি ও বিভিন্নধর্মী প্রবণতার মধ্যে যেটি প্রাধান্য লাভ করে, মানুষ তারই অনুসরণ করতে লেগে যায়। **চার ৪** সৎ ও অসতের এ সংঘর্ষে সৎ প্রবণতাগুলোকে সহায়তা এবং মানুষকে সরল পথ প্রদর্শনের জন্যে তার স্রষ্টা মানব জাতির মধ্য থেকেই এক উত্তম ব্যক্তিকে মনোনীত করেন এবং তাঁকে নির্ভুল জ্ঞান দিয়ে লোকদেরকে সৎ পথ প্রদর্শনের কাজে নিযুক্ত করেন। **পাঁচ ৪** মানুষ দায়িত্বহীন ও অজিজ্ঞাস্য সত্তা নয়। সে তার যাবতীয় স্বেচ্ছাকৃত কর্মকাণ্ডের জন্যে আপন স্রষ্টার সামনে জবাবদিহি করতে বাধ্য। একদিন তাকে প্রতিটি অণু-পরমাণুর হিসেব দিতে হবে এবং নিজের কৃত-কর্মের ভালো বা মন্দ ফল ভোগ করতে হবে।

এ মতবাদ আল্লাহ, ফেরেশতা, অহী, নবুওয়াত ও শেষ বিচারের দিন পাঁচটি জিনিসেরই অস্তিত্ব দাবী করে। এর কোন কথাই বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতে অবাস্তব নয়। এর কোন জিনিসকে কুসংস্কার বা অযৌক্তিক বিশ্বাস বলেও আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। এবং এ সম্পর্কে আমরা যতই চিন্তা করি, এর সত্যতার প্রতি ততোই আমাদের আগ্রহ বেড়ে যায়।

আল্লাহর তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য না হতে পারে, কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার না করে উপায় নেই। এ এমন একটি প্রয়োজন যে, এছাড়া বিশ্বপ্রকৃতির জটিল তত্ত্বের মীমাংসা করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

ফেরেশতার অস্তিত্বের নিদর্শন আমরা নির্ণয় করতে পারি না, কিন্তু তাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দুনিয়ার সকল পণ্ডিত ও বিজ্ঞানী তাদেরকে কোন না কোনভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য কুরআন তাদের যে নামে অভিহিত করে, সে নামে তাঁরা তাদের উল্লেখ করেননি।

কেয়ামতের আগমন এবং একদিন না একদিন পৃথিবীর গোটা ব্যবস্থাপনা চুরমার হয়ে যাবার ব্যাপারটি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমানের দৃষ্টিতে শুধু প্রবলতর নয়, প্রায় সুনিশ্চিত।

স্বীয় আল্লাহর সামনে মানুষের দায়ী হওয়া এবং নিজ কৃতকর্মের জন্যে পুরস্কার বা শাস্তির যোগ্য হবার বিষয়টি সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করা যায় না বটে ; কিন্তু মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী এবং মৃত্যুর অবস্থা সম্পর্কে যতো মতবাদ গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে ইসলামের পেশকৃত মতবাদটিই যে সবচেয়ে উত্তম, ফলপ্রসু এবং আন্দাজ-অনুমানের কাছাকাছি-সুস্থ বিচার-বুদ্ধি অন্তত এটুকু স্বীকার করতে বাধ্য।

বাকী থাকে অহী ও নবুওয়াতের প্রশ্ন ; একথা সুস্পষ্ট যে, এর কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর অহী হিসেবে পেশকৃত কিতাবাদির অর্থ এবং আল্লাহর রসূল বলে অভিহিত লোকদের জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানব জাতির চিন্তা ও কর্মধারার ওপর তাঁদের সমতুল্য গভীর, ব্যাপক, মযবুত ও কল্যাণপ্রদ প্রভাব অপর কোন গ্রন্থ বা নেতাই বিস্তার করতে পারেনি। এটা এ কথাটুকু বিশ্বাস করার জন্যে যথেষ্ট যে, তাদের ভেতরে এমন কোন অনন্য সাধারণ জিনিস অবশ্যই ছিলো, মানব রচিত গ্রন্থাবলী ও সাধারণ মানবীয় নেতৃবৃন্দ যার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামে ঈমানের বিষয়গুলো যুক্তি-বিরুদ্ধ নয়। বুদ্ধির কাছে তাকে অস্বীকার করার মতো কোনই উপাদান নেই। বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিবর্তনের কোন পর্যায়ে পৌঁছে মানুষ তাকে নাকচ করতে বাধ্য হবে, তার ভেতরে এমন কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই। বরং বুদ্ধিবৃত্তি তার নিশ্চিততারই সাক্ষ্য দেয়। বাকী থাকে ঈমান ও প্রত্যয়ের প্রশ্ন। এর সম্পর্ক বুদ্ধির সাথে নয়, বরং মন ও বিবেকের সাথে। আমরা যতো অদৃশ্য ও অশরীরী বস্তুকে বিশ্বাস করি, তার সবগুলোরই অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিবেকের ওপর নির্ভর করে। কোন অদৃশ্য বিষয়কে যদি আমরা না মানতে চাই অথবা সে সম্পর্কে আমাদের মন নিশ্চিন্ত না হয়, তবে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ দ্বারা তাকে সত্য বলে জ্ঞান করতে আমাদের বাধ্য করা যেতে পারে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, 'ইথারে'র (Ether) অস্তিত্ব সম্পর্কে যত দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, তার কোনটিই তাকে নিশ্চিন্তরূপে সাব্যস্ত করতে এবং সন্দেহ ও সংশয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে পারে না। কারণ এ দলীল-প্রমাণগুলো দেখেই কোন কোন দার্শনিক তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, আবার কোন কোন দার্শনিক ঐগুলোকে অপ্রতুল মনে করে বিশ্বাস স্থাপনে অস্বীকৃতি জানান। সুতরাং ঈমান ও সত্য জ্ঞানের বিষয়টি মূলত মনের নিশ্চিন্ততা ও বিবেকের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য তাতে বুদ্ধিবৃত্তির এটুকু প্রভাব নিশ্চয়ই রয়েছে যে, যে বিষয়গুলোর সত্যজ্ঞান যুক্তি-বিরুদ্ধ বলে সাব্যস্ত হয়, সেগুলো সম্পর্কে বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যে সংঘাত শুরু হয়ে যায়

এবং তার ফলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। আর যে জিনিসগুলোর সত্যজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের প্রতিকূল নয়, অথবা যেগুলোর সত্যজ্ঞানে বুদ্ধিবৃত্তিও খানিকটা সহায়তা করে, সেগুলো সম্পর্কে মানসিক নিশ্চিন্ততা বেড়ে যায় এবং তার ফলে ঈমান শক্তি অর্জন করে।

দ্বিতীয়ত, অদৃশ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে বেশীর ভাগই হচ্ছে তত্ত্বমূলক বিষয় ; অর্থাৎ সেগুলোর সাথে আমাদের বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। উদাহরণত ইথার (Ether), পদার্থের প্রাথমিক রূপ ও সাধারণ রূপ, বস্তু, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক আইন, কার্যকারণ বিধি এবং এরূপ বহুবিধ তত্ত্বমূলক বিষয় বা অনুমান রয়েছে, যেগুলো মানা বা না মানার কোন প্রভাব আমাদের জীবনের ওপর পড়ে না। কিন্তু ইসলাম যে অদৃশ্য বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানিয়েছে, সেগুলো এমন কোন তত্ত্বমূলক বিষয় নয়। বরং আমাদের নৈতিক ও বাস্তব জীবনের সাথে সেগুলো গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সেগুলোর স্বীকৃতিকে নীতির উৎস বলে অভিহিত করার কারণ এই যে, ঐগুলো শুধু তত্ত্বমূলক সত্যই নয়, বরং ঐগুলো সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান এবং সে সবের প্রতি পূর্ণাংগ ঈমান আমাদের নিজস্ব গুণাবলী ও স্বভাব-প্রকৃতি, ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড এবং আমাদের সামাজিক ও সামগ্রিক বিষয়াদির ওপর তীব্রভাবে প্রভাবশীল হয়ে থাকে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষাগত মর্যাদাসম্পন্ন বিশাল মানব সমাজের ওপর—তাদের জীবনের গুপ্ত এবং ক্ষুদ্রতম বিভাগে পর্যন্ত ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব স্থাপন এবং তার বাঁধনকে সুদৃঢ় রাখার জন্যে যেরূপ শক্তির প্রয়োজন, তা শুধু ইসলামের পেশকৃত ঐ স্বীকৃতির দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। এক সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা, প্রবল ও প্রতাপান্বিত, দয়াময় ও মেহেরবান আল্লাহ আমাদের ওপর কর্তৃত্বশীল, তাঁর অগণিত সৈন্য-সামন্ত সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় বিরাজমান, তিনিই মানুষের জন্যে পয়গম্বর পাঠিয়েছেন এবং সে পয়গম্বর যে বিধি-বিধান আমাদেরকে দিয়েছেন, তা তাঁর নিজস্ব রচিত নয়, বরং সম্পূর্ণত আল্লাহরই কাছ থেকে প্রাপ্ত এবং স্বীয় আনুগত্য বা অবাধ্যতার ভালো বা মন্দ ফল অবশ্যই আমাদের ভোগ করতে হবে—এ প্রত্যয়ের ভেতর এমন প্রচণ্ড ও ব্যাপকতর শক্তি নিহিত রয়েছে, যা এছাড়া আর অন্য কোন উপায়ই অর্জন করা যেতে পারে না। বস্তুগত শক্তি কেবল দেহকে পরিবেষ্টন করতে পারে ; শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর নৈতিক প্রভাব শুধু মানব সমাজের উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত পৌছতে পারে। আইনের রক্ষকরা যেখানে পৌছতে সক্ষম, কেবল সেখানেই তা কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু প্রত্যয়ের এ শক্তি মানুষের মন ও হৃদয়কেই অধিকার করে বসে। সাধারণ ও অসাধারণ, মূর্খ ও শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও নির্বোধ সবাকেই সে নিজের মধ্যে পরিবেষ্টিত করে নেয়। অরণ্যের

নিঃসঙ্গতায় এবং রাতের অন্ধকারে সে নিজের কাজ সম্পাদন করে যায়। যেখানে অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত রাখার সে সম্পর্কে নিন্দা ও ভর্ৎসনা করার, এমন কি তাকে দেখার মতো কেউ থাকে না, সেখানে আল্লাহর হাযির-নাজির থাকার প্রত্যয়, পয়গম্বরের দেয়া শিক্ষাকে সত্য বলে বিশ্বাস এবং কেয়ামতের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে প্রতীতি এমন কাজ আঞ্জাম দেয়, যা কোন পুলিশ কনেষ্টবল, আদালতের বিচারক কিংবা অধ্যাপকের শিক্ষার পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর নয়। পরন্তু এ প্রত্যয়টি যেভাবে দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত অগণিত বিভিন্ন মুখী ও পরস্পর বিরোধী মানুষকে একত্রিত করেছে, তাদেরকে মিলিয়ে একটি সুবৃহৎ জাতি গঠন করেছে, তাদের চিন্তা-ভাবনা, ক্রিয়া-কাণ্ড ও রীতিনীতিতে চূড়ান্ত রকমের একমুখিনতার সৃষ্টি করেছে, তাদের ভেতর পারিপার্শ্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও এক সংস্কৃতির বিস্তৃতি সাধন করেছে, এক উচ্চতম লক্ষ্যের জন্যে তাদের ভেতরে আত্মোৎসর্গের যে প্রেরণা সঞ্চার করেছে, আর কোথাও তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ পর্যন্ত যা কিছু সাব্যস্ত করা হয়েছে, তা হচ্ছে এই যে, ইসলামী পরিভাষায় ঈমান বলতে বুঝায় আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রসূল এবং শেষ বিচারের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। এ পাঁচটি প্রত্যয় মিলে একটি অখণ্ড ও অবিভাজ্য সত্তা গঠন করে। অর্থাৎ এগুলোর পরস্পরের মধ্যে এমন এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান যে, এর কোন একটি অংশ অস্বীকার করলেই গোটা প্রত্যয়ের অস্বীকৃতি অনিবার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া যুক্তিবাদী পর্যালোচনার দ্বারা এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, ইসলাম যে ধরনের সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তার জন্যে কেবল এ বিষয়গুলোই প্রত্যয়ের মর্যাদা পেতে পারে এবং এরূপ প্রত্যয় তার প্রয়োজন। পরন্তু বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির সাথে সহযোগিতা করতে অক্ষম, এমন কোন জিনিসও তার ভেতরে নেই।

এবার তৃতীয় প্রশ্নটির প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। আর তাহচ্ছে এই যে, ঈমানের মর্যাদা কি এবং এ মর্যাদাই বা কেন? এ প্রশ্নটি অনুধাবন করতে গিয়ে লোকেরা বহুল পরিমাণে ভুল করে এসেছে এবং কোন কোন প্রখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাপারে হোচট খেয়েছেন। এ কারণে বিষয়টি একটু খোলাসাভাবে বিবৃত করা দরকার।

ইসলামে ঈমানের গুরুত্ব

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কুরআন মজীদের দাওয়াতের মূল প্রতিপাদ্য কি, তাহলে একটি মাত্র শব্দেই তার জবাব দেয়া যেতে পারে। আর তাহলো 'ঈমান'। কুরআন মজীদের অবতরণ এবং নবী (স)-এর আগমনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে লোকদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান জানানো। কুরআন তার ধারক ও বাহক সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বলে যে, তিনি হচ্ছেন ঈমানের আহ্বায়ক।

رَبَّنَاۤ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ (ال عمران : ١٩٣)

"হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আমরা এমন একজন আহ্বায়কের কথায় সাড়া দিয়েছি যিনি ঈমানের প্রতি আহ্বান জানান।"

আর স্বয়ং নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করে যে, সে কেবল এমন লোকদেরকেই সৎপথ (হেদায়াত) প্রদর্শন করবে যারা গায়েবী বিষয়ের (অর্থাৎ উল্লিখিত ঈমানিয়াতের) প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে প্রস্তুত।

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ ـ(البقرة : ٢ـ٣)

"(কুরআন) হেদায়াত হচ্ছে সেই মুত্তাকীদের জন্যে যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২-৩)

সে ওয়াজ-নছিহত, সদুপদেশ, ওয়াদা-অঙ্গীকার, যুক্তি-প্রমাণ ও কিচ্ছা-কাহিনীর দ্বারা ঐ দিকেই লোকদের আহ্বান জানায়। মানুষের কাছে সে প্রথম দাবী জানায় ঈমান আনার। তারপর সে আত্মশুদ্ধি, নৈতিক সংশোধন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তার কাছে ঈমানই হচ্ছে সত্য, সততা, জ্ঞান, হেদায়াত ও আলো। আর ঈমানের অনুপস্থিতি অর্থাৎ কুফরী হচ্ছে অজ্ঞতা, যুলুম, বাতিল, মিথ্যা ও ভ্রষ্টতার শামিল।

কুরআনে হাকীম এক স্পষ্ট সীমা-রেখা টেনে তামাম দুনিয়ার মানুষকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেয়। একটি দল হচ্ছে ঈমান পোষণকারীদের, আর দ্বিতীয় দলটি হলো অবিশ্বাসীদের। প্রথম দলটি তার দৃষ্টিতে সত্যাশ্রয়ী—জ্ঞান ও নূরের সম্পদে সমৃদ্ধ ; তার জন্যে হেদায়াতের পথ, তাকওয়া ও পরহেযগারীর দরযা উন্মুক্ত ; কেবল সে-ই কল্যাণ লাভের অধিকারী। দ্বিতীয় দলটি হচ্ছে তার দৃষ্টিতে কাফের, যালেম, মূর্খ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; হেদায়াতের পথ তার জন্যে অবরুদ্ধ। তাকওয়া ও পরহেযগারীতে তার কোন অংশ নেই। তার জন্যে ক্ষতি, ধ্বংস ও ব্যর্থতার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সে এ দু' দলের দৃষ্টান্ত এভাবে পেশ করে যে, তাদের একটি অন্ধ ও বধির, অপরটি দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ وَالسَّمِيْعِ ط (هود : ٢٤) সে বলে যে, ঈমানের পথই হচ্ছে 'ছিরাতে মুস্তাকিম—সরল পথ। وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ـ(الشورى : ٥٢) এবং তাছাড়া আর সমস্ত পথই বর্জন করা আবশ্যক। وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ـ(الانعام : ١٥٣) সে কোন পেঁচগোছ ছাড়াই সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল, তাঁর কিতাবকে মানে, তার কাছে রয়েছে এক উজ্জ্বল

প্রদীপ, তার সাহায্যে সে সোজা পথে চলতে পারে। এ প্রদীপের বর্তমানে তার পক্ষে পথভ্রষ্ট হবার কোনই আশংকা নেই। সে সোজা পথকে বাঁকা পথ থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবেই দেখতে পাবে এবং নিরাপদ ও নির্ঝঞ্ঝাটে কল্যাণের মনজিলে মকসুদে পৌঁছে যাবে। পক্ষান্তরে যার কাছে ঈমানের দীপিকা নেই, তার কাছে কোন আলোই নেই। তার পক্ষে সোজা ও বাঁকা পথের পার্থক্য নির্ণয় করা সুকঠিন ব্যাপার। সে অন্ধের ন্যায় অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজ-অনুমানে পা টিপে টিপে চলবে। হয়তো ঘটনাক্রমে তার কোন পদক্ষেপ সোজা পথে গিয়ে পড়তেও পারে ; কিন্তু এটা সোজা পথে চলার কোন নিশ্চিত উপায় নয়। বরং তার সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনাই বেশী। কখনো হয়তো গর্তে গিয়ে পড়বে, আবার কখনো কাঁটার মধ্যে আটকে পড়বে।

প্রথম দলটি সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে ঃ

فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ ۙ
اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ (الاعراف : ١٥٧)

"অতএব যারা রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে এবং যারা তার সাহায্য ও সহায়তা করেছে, আর আনুগত্য করেছে তার সাথে অবতীর্ণ নূরের, প্রকৃত-পক্ষে তারাই হচ্ছে কল্যাণ লাভের অধিকারী।"-(সূরা আরাফ ঃ ১৫০)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اتَّقُوْا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا
تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ -(الحديد : ٢٨)

"লোক সকল, আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর রহমত থেকে দ্বিগুণ অংশ প্রদান করবেন আর তোমাদের জন্যে এমন আলোর ব্যবস্থা করবেন যে, তোমরা তার ভেতরে চলতে পারবে আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।"
-(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৮)

আর দ্বিতীয় দলটি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَآءَ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ
هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ○ (يونس : ٦٦)

"যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শরীকদারকে আহ্বান জানায়, তারা কার আনুগত্য করে জানো ? তারা শুধু অনুমানের পায়রুবী করে, আর নিছক আন্দাজের ভিত্তিতে পথ চলে।"—(সূরা ইউনুস ঃ ৬৬)

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ ج وَاِنَّ الظَّنَّ لاَيُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ○ (النجم : ٢٨)

"তারা শুধু অনুমানের পায়রুবী করে, আর অনুমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা হকের প্রয়োজন থেকে কিছুমাত্র বেনিয়াজ করে না।"

—(সূরা আন নজম ঃ ২৮)

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ لاَيَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ (القصص : ٥٠)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া হেদায়াত ছেড়ে আপন প্রবৃত্তির পায়রুবী করলো, তার চেয়ে অধিক গোমরাহ আর কে হবে ? এরূপ যালেমদেরকে আল্লাহ কখনো সোজা পথ দেখান না।"—(সূরা আল কাসাস ঃ ৫০)

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُّوْرٍ ○ (النور : ٤٠)

"যাকে আল্লাহ তায়ালা আলো দেননি, তার জন্যে আর কোন আলো নেই।"—(সূরা আন নূর ঃ ৪০)

এ গোটা বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা সূরায়ে বাকারায় পাওয়া যায়। তার থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, ঈমান ও কুফরের এ পার্থক্যের ফলে মানব জাতির এ দু'টি দলের মধ্যে কতবড়ো পার্থক্য সূচিত হয়।

لاَاِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قف قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لاَانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ (البقرة : ٢٥٦-٢٥٧)

"দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই, হেদায়াতের পথ থেকে গোমরাহীকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে ; অতপর যে ব্যক্তি 'তাগুত'কে (শয়তানী শক্তি) পরিত্যাগ করে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, সে একটি

অবিচ্ছেদ্য মযবুত রজ্জু আকড়ে ধরেছে আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সাহায্যকারী ; তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে যান। আর কাফেরদের সাহায্যকারী হচ্ছে শয়তান ; সে তাদেরকে আলোক থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হচ্ছে দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"

আমলের ওপর ঈমানের অগ্রাধিকার

পরন্তু এ ঈমান ও কুফরের পার্থক্য মানবীয় ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যেও পার্থক্যের সৃষ্টি করেছে। কুরআনের মতে ঈমানদার ব্যক্তিই পরহেযগার ও সৎকর্মশীল হতে পারে। ঈমান ব্যতিরেকে কোন আমলের ওপরই তাকওয়া ও সততার বিশেষণ প্রযোজ্য হতে পারে না—দুনিয়াবাসীর দৃষ্টিতে সে কাজটি যতোই সৎকর্ম বলে বিবেচিত হোক না কেন। কুরআন বলে ঃ

وَالَّذِىْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○ (الزمر : ٣٣)

"যে ব্যক্তি সত্য কথা নিয়ে এসেছে আর যে তার সত্যতা স্বীকার করেছে, কেবল তারাই হচ্ছে মুত্তাকী।"–(সূরা আয যুমার ঃ ৩৩)

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○ (البقرة : ٢-٤)

"কুরআন হচ্ছে মুত্তাকী লোকদের জন্যে হেদায়াত স্বরূপ, যারা গায়েবী বিষয়ের প্রতি ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমাদের দেয়া রেযেক থেকে ব্যয় করে, আর যারা তোমার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের ওপর ঈমান আনে এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতিও আর যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২-৪)

সুতরাং কুরআনের দৃষ্টিতে ঈমানই হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেযগারীর মূল ভিত্তি। যে ব্যক্তি ঈমান পোষণ করে তার সৎকর্মসমূহ ঠিক সেভাবে ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়, যেমন করে ভালো জমিন ও ভালো আবহাওয়ায় বাগ-বাগানের রোপিত বৃক্ষ তরু-তাজা ও ফল-ফুলে পূর্ণ হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈমান ছাড়াই আমল করতে থাকে, সে যেন এক অনুর্বর, প্রস্তরময় জমিন ও নিকৃষ্ট আবহাওয়ায় বাগিচা রোপণ করে।[১] এ কারণেই কুরআন মজীদে সর্বত্র

১. এ বিষয়টি প্রায় এরূপ উপমার সাথেই কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে। দ্রষ্টব্য সূরা আল বাকারা ঃ ৩৬ রুকূ'।

ঈমানকে সৎকাজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এবং কোথাও ঈমান বিহীন সৎকাজকে মুক্তি ও কল্যাণের উপায় বলে ঘোষণা করা হয়নি।[২] বরং অভিনিবেশ সহকারে কুরআন পাঠ করলে আপনারা জানতে পারবেন যে, কুরআন মজীদ যা কিছু নৈতিক নির্দেশ ও আইনগত বিধান পেশ করেছে, তার সবকিছুরই লক্ষ্য হচ্ছে ঈমানদার লোকেরা। এ ধরনের আয়াতগুলো হয় يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا। দ্বারা শুরু হয়েছে, অথবা বর্ণনাভংগির মাধ্যমেই একথা কোন না কোনভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আহ্বান হচ্ছে শুধু মু'মিনদের প্রতি। বাকী থাকলো কাফের, তাদেরকে সৎকাজের নয়, বরং ঈমানের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং স্পষ্টত বলে দেয়া হয়েছে যে, যারা মু'মিন নয়, তাদের আমলের কোনই মূল্য নেই, তাহচ্ছে অসার, অর্থহীন এবং সম্পূর্ণ বিলুপ্তির উপযোগী।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍۭ بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَآءً ۭ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَهٗ لَمْ يَجِدْهُ شَيْـًٔا ۝ (النور : ٣٩)

"যারা কুফরী করেছে, তাদের আমলের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, যেন মরুভূমিতে মরীচিকা। পিপাসার্ত ব্যক্তি দূর থেকে দেখে মনে করে যে, তা পানি ; কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছলে আর কিছুই পায় না।"

–(সূরা আন নূর ঃ ৩৯)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۝ ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِىْ وَرُسُلِىْ هُزُوًا ۝ (الكهف : ١٠٣-١٠٦)

"তাদেরকে বলো ঃ আপন কৃত-কর্মের দৃষ্টিতে কোন্ ধরনের লোক সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত, আমরা কি তোমাদেরকে বলবো ? এ হচ্ছে তারাই, যাদের প্রয়াস-প্রচেষ্টা, পার্থিব জীবনে অযথা নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ তারা ভাবছিলো যে, আমরা খুব ভালো কাজ করছি। এসব লোকেরাই আপন প্রভুর নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করেছে এবং তাদেরকে যে তাঁর দরবারে হাযির হতে হবে, এ সত্যটুকু পর্যন্ত স্বীকার করেনি। এর ফলে তাদের আমল

২. দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখুন আল বাকারা (৩-৯, ৩৮), আন নিসা (২৪), আল মায়েদা (২), হুদ (২), আন নহল (১৩), ত্বা-হা (৩-৬), আত্তীন ও আল আছর।

বিনষ্ট হয়ে গেছে। কেয়ামতের দিন আমরা তাদের আমলের কোনই মূল্য দেব না এবং তারা দোযখে প্রবেশ করবে। তারা যে কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও আমার রসূলগণকে উপহাস করেছে—এ হচ্ছে তারই প্রতিফল।"–(সূরা আল কাহাফ ঃ ১০৩-১০৬)

এ একই বিষয় সূরায়ে মায়েদা (রুকূ' ১), আনআম (১০), আরাফ (১৭), তওবাহ (৩), হুদ (২), জুমার (৭) ও মুহাম্মদ (১)-এ বিবৃত হয়েছে। আর সূরায়ে তওবায় সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, কাফের দৃশ্যত সৎকাজ করলেও সে কখনো মু'মিনের সমান হতে পারে না ঃ

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ لا اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ـ(التوبة : ١٩ـ٢٠)

"তোমরা কি যারা হাজীদের পানি পান করায় এবং মসজিদে হারাম আবাদ রাখে তাদেরকে সেই ব্যক্তির সমান মনে করেছো, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং যে আল্লাহর পথে জেহাদ করেছে? এ উভয় ব্যক্তি আল্লাহর কাছে কখনো সমান হতে পারে না। আর আল্লাহ যালেমদেরকে হেদায়াত করেন না। যারা ঈমান এনেছে আর যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর পথে জান ও মাল দ্বারা জেহাদ করেছে, তারা আল্লাহর কাছে অতীব সম্মানিত। আর এরাই হচ্ছে সফলকাম।"
–(সূরা আত তওবা ঃ ১৯-২০)

সারসংক্ষেপ

এ আলোচনা এবং এর সমর্থনে পেশকৃত কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ থেকে কয়েকটি বিষয় নিসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয় ঃ

এক ঃ ঈমান হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর। এর ওপরই এ ব্যবস্থাটির গোটা ইমারত গড়ে উঠেছে। আর কুফর ও ইসলামের পার্থক্য শুধু ঈমান ও অ-ঈমানের মৌলিক পার্থক্যের ওপর স্থাপিত।

দুই ঃ মানুষের কাছে ইসলামের প্রথম দাবী হচ্ছে ঈমান স্থাপনের এ দাবীকে মেনে নেবার পরই এক ব্যক্তি ইসলামের সীমার মধ্যে প্রবেশ করে। আর এরই জন্যে হচ্ছে ইসলামের সমস্ত নৈতিক বিধান ও সামাজিক আইন-কানুন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এ দাবীকে বর্জন করে, সে ইসলামের নির্দিষ্ট

পরিধির বাইরে অবস্থিত, তার প্রতি না কোন নৈতিক বিধান প্রযোজ্য আর না কোন সামাজিক আইন কানুন।

তিন ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমানই হচ্ছে আমলের ভিত্তিমূল। যে কাজটি ঈমানের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে, কেবল তা-ই হচ্ছে তার দৃষ্টিতে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ। আর যেখানে আদতেই এ ভিত্তির কোন অস্তিত্ব নেই সেখানে সকল আমলই হচ্ছে নিষ্ফল ও অর্থহীন।

একটি প্রশ্ন

ঈমানের এ গুরুত্বটা কোন কোন লোক উপলব্ধি করতে পারে না। তারা বলে যে, কতিপয় বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ মেনে নেবার ভেতরে এমন কোন রহস্য নেই যে, তার ভিত্তিতে গোটা মানব জাতিকে দু'টি দলে বিভক্ত করা যেতে পারে ; আমাদের দৃষ্টিতে আসল জিনিস হচ্ছে নৈতিকতা ও স্বভাব-চরিত্র, এরই ওপর ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং শুদ্ধ-অশুদ্ধের পার্থক্য নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি উন্নত নৈতিকতা, পবিত্র স্বভাব এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী, সে ঐ মতবাদগুলো তথা ইসলামের প্রত্যয়সমূহ স্বীকার করুক আর না-ই করুক, তাকে আমরা সৎলোকই বলবো এবং সৎকর্মশীলদের দলে শামিল করে নেব। আর যার ভেতরে এ গুণাবলী নেই তার পক্ষে ঈমান ও কুফরের বিশ্বাসগত পার্থক্য সম্পূর্ণ অর্থহীন। সে যে কোন আকীদা-বিশ্বাসই পোষণ করুক না আমরা তাকে মন্দই বলবো। তাদের মতে এরপর আরও একটি জিনিস থেকে যায়। তাহলো এই যে, আমলের গুরুত্ব এবং তার মূল্যমান ঈমানের ওপর নির্ভরশীল এবং ঈমান ছাড়া কোন কাজই সৎকাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে সংকীর্ণতার পরিচায়ক। নিছক আল্লাহ, রসূল, কিতাব বা কেয়ামত সম্পর্কে ইসলাম থেকে ভিন্নমত পোষণকারীর নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব ও সৎকার্যাবলী বিনষ্ট হয়ে যাবে — কোন যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ ছাড়া এটা স্বীকার করা যেতে পারে না। ইসলাম কোন আকীদা-বিশ্বাসকে সত্য বলে মনে করলে নিসন্দেহে তার প্রচার করতে পারে ; লোকদেরকে সেদিকে আহ্বান জানাতে পারে, তার প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিতে পারে ; কিন্তু বিশ্বাসের প্রশ্নকে নৈতিকতা ও আমলের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করা এবং নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব, চারিত্রিক পবিত্রতা ও কর্মগত উৎকর্ষকে ঈমানের ওপর নির্ভরশীল করা কতখানি সংগত হতে পারে ?

দৃশ্যত এ প্রশ্ন এতখানি গুরুত্বপূর্ণ যে, কোন কোন মুসলমান পর্যন্ত এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের মূলনীতিকে সংশোধন করতে প্রস্তুত হয়েছে। কিন্তু ঈমানের তাৎপর্য এবং স্বভাব ও চরিত্রের সাথে তার সম্পর্ককে উপলব্ধি করার পর আপনা আপনিই এ আপত্তি নিরসন হয়ে যায়।

প্রশ্নের সত্যাসত্য নির্ণয়

সর্বপ্রথম এ সত্যটি জেনে নেয়া দরকার যে, মানুষে মানুষে ভালো ও মন্দের পার্থক্য মূলত দু'টি পৃথক ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম হচ্ছে মানুষের জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতি, এর উৎকর্ষ-অপকর্ষ মানুষের নিজস্ব ইচ্ছা শক্তির অধীন নয়। দ্বিতীয় হচ্ছে উপার্জন, এর সৎ বা অসৎ হওয়া প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি এবং ইচ্ছা ও ক্ষমতার সুষ্ঠু বা নিকৃষ্ট ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। এ দু' জিনিসই মানব জীবনে আপন আপন প্রভাবের দিক দিয়ে এরূপ মিলেমিশে রয়েছে যে, আমরা এ দু'টি কিংবা এ দু'টির প্রভাব-সীমাকে পরস্পর থেকে পৃথক করতে পারি না। কিন্তু মতবাদ হিসেবে এতটুকু অবশ্য জানি যে, মানুষের চিন্তা ও কর্মজীবনে উৎকর্ষ ও অপকর্ষের এ দু'টি ভিত্তি পৃথকভাবে বর্তমান। যে উৎকর্ষ-অপকর্ষ স্বভাব প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা নিজস্ব মৌলিকতার দিক থেকে বিচারের মানদণ্ডে কোন গুরুত্ব লাভ করতে পারে না। গুরুত্ব কেবল সেই উৎকর্ষ-অপকর্ষই লাভ করতে পারে, যা উপার্জনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[১] শিক্ষা, সদুপদেশ, সংস্কৃতি প্রভৃতির জন্যে যতো প্রচেষ্টাই চালান হয়, তার কোন কিছুই প্রথম ভিত্তিটির (অর্থাৎ জন্মগত স্বভাব প্রকৃতি) সাথে সম্পৃক্ত নয়, কেননা তার উৎকর্ষকে অপকর্ষ দ্বারা কিংবা অপকর্ষকে উৎকর্ষ দ্বারা পরিবর্তিত করা অসম্ভব। বরং ঐগুলো হচ্ছে দ্বিতীয় ভিত্তিটির (উপার্জনের) সাথে সম্পর্কযুক্ত। সঠিক শিক্ষা ও যথার্থ ট্রেনিং-এর মাধ্যমে অপকর্ষের দিকে আর গলদ শিক্ষা ও ভ্রান্ত ট্রেনিং-এর মাধ্যমে অপকর্ষের দিকে চালিত করা যেতে পারে।

এ নীতি অনুযায়ী যে ব্যক্তি মানুষের উপার্জিত শক্তিগুলোকে উৎকর্ষের দিকে চালিত করতে এবং তারই পথে বিকশিত করতে ইচ্ছুক, তার পক্ষে নির্ভুল কর্মপন্থা কী হতে পারে? তাহলো মানুষের নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা এবং সেই জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তার জন্যে এমন একটি ট্রেনিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করা, যা তার নৈতিকতা ও স্বভাব-চরিত্রকে (যতখানি তা উপার্জনের সাথে সংশ্লিষ্ট) একটি উত্তম ছাঁচে ঢালাই করতে সক্ষম। এ ব্যাপারে ট্রেনিং-এর চেয়ে জ্ঞানের অগ্রগণ্য হওয়া একান্ত অপরিহার্য। এ অগ্রাধিকারকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে না। কারণ জ্ঞান বা এলমই হচ্ছে আমলের বুনিয়াদ, নির্ভুল জ্ঞান ছাড়া কোন আমলেরই অভ্রান্ত হওয়া সম্ভব নয়।

---

১. কুরআনে ঠিক একথাটিই বিবৃত হয়েছে। لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا ط لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَااكْتَسَبَتْ। অর্থাৎ আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থের অতিরিক্ত কোন কাজের জন্যে দায়িত্বশীল করেন না। সে যা কিছু উপার্জন করেছে, তারই সুফল লাভ করবে। সে যা কিছু উপার্জন করেছে, তার দায়িত্বই তার ওপর বর্তিবে। আর জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতি আল্লাহ যাকে যেভাবে ইচ্ছা দান করেছেন। هُوَ الَّذِىْ يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ। আর মানুষের জীবনে তার স্বভাব-প্রকৃতি এবং উপার্জনের মধ্যে কোন্‌টার মধ্যে কতটা অংশ রয়েছে, তা আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন। اِنَّ اللّٰهَ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ شَىْءٌ-(ال عمران : ٥)

এবার জ্ঞানের কথা ধরা যাক। এক ধরনের জ্ঞান হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি আমরা স্কুল-কলেজে শিখি বা শিখাই এবং বেশুমার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার সমন্বয়ে এটি গঠিত। দ্বিতীয় ধরনটি হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান, কুরআনের পরিভাষায় এটি (العلم) বা একমাত্র জ্ঞান বলে অভিহিত। এটি আমাদের বাস্তব কাজ-কারবারের সাথে নয়, বরং 'আমাদের' সাথে সম্পৃক্ত। এর আলোচ্য বিষয় হলো, আমরা কে ? এই যে দুনিয়ায় আমরা বসবাস করি, এখানে আমাদের মর্যাদা কি ? আমাদের এবং এ দুনিয়াকে কে বানিয়েছেন ? সেই সৃষ্টিকর্তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি ? আমাদের জন্যে জীবন যাপনের নির্ভুল পন্থা (হেদায়াত ও ছিরাতাল মুস্তাকীম) কি হতে পারে এবং তা কিভাবে আমরা জানতে পারি ? আমাদের এ জীবন যাত্রার মঞ্জিলে মকছুদ কোন্‌টি ? বস্তুত জ্ঞানের ঐ দু'টি প্রকারের মধ্যে এ দ্বিতীয় প্রকারটিই মৌলিকতার দাবী করতে পারে। আমাদের সকল খুঁটিনাটি জ্ঞানই এর শাখা-প্রশাখা মাত্র এবং এ জ্ঞানটির অভ্রান্তি বা ভ্রান্তির ওপরই আমাদের গোটা চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর শুদ্ধি বা অশুদ্ধি নির্ভরশীল। কাজেই মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির জন্যে যে ব্যবস্থাই প্রণয়ন করা হবে, তার ভিত্তি এ প্রকৃত জ্ঞানের ওপরই স্থাপিত হবে। যদি মৌলিক জ্ঞান সঠিক ও নির্ভুল হয় তো শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যবস্থাও যথার্থ হবে। আর যদি সে জ্ঞানের ভেতর কোন বিকৃতি থাকে, তবে সে বিকৃতির ফলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির গোটা ব্যবস্থাই বিকৃত হয়ে যাবে।

কুরআন মজীদে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রসূল এবং শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে যে প্রত্যয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা এ মৌলিক জ্ঞানের সাথেই সম্পৃক্ত। ঐ প্রত্যয়গুলোর প্রতি ঈমান আনার ব্যাপারে এতো জোরালো ভাষায় দাবী জানানোর কারণ এই যে, ইসলামের গোটা সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা ঐ মৌলিক জ্ঞানের ওপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের উপার্জিত শক্তিগুলোর পরিশীলন এবং সংস্কৃতির যে ব্যবস্থাপনা একমাত্র নির্ভুল জ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল সেটিই হচ্ছে নির্ভুল ব্যবস্থাপনা। যে ব্যবস্থা প্রকৃত জ্ঞান ছাড়াই কায়েম করা হয়েছে অথবা যা নির্ভুল জ্ঞানের ওপর ভিত্তিশীল নয়, তা মূলতই ভ্রান্ত। এর দ্বারা মানুষের অর্জিত শক্তিগুলোকে ভ্রান্ত পথে চালিত করা হয়েছে। এ সকল পথে মানুষের যে চেষ্টা সাধনা ব্যয়িত হয়, দৃশ্যত তা যতই নির্ভুল মনে হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তার ব্যবহারই ভ্রান্ত। তার গতি সঠিক মঞ্জিলে মকছুদের দিকে নিবদ্ধ নয়। তা কখনো সাফল্যের স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এ জন্যেই তা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তার কোন ফায়দাই মানুষ লাভ করতে পারে না। এ কারণেই ইসলাম তা নিজস্ব পথকে

'ছিরাতে মুস্তাকিম' বা সহজ-সরল পথ বলে আখ্যায়িত করেছে এবং অজ্ঞানতা বা ভ্রান্ত জ্ঞানের ভিত্তিকে অনুসৃত সমস্ত পথকেই বর্জন করার দাবী জানিয়েছে ঃ وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ج وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ـ(الانعام : ١٥٣) আর এ জন্যেই ইসলাম ঘোষণা করে যে, যার ঈমান পরিশুদ্ধ নয়, তার যাবতীয় কৃতকর্মই নিষ্ফল এবং পরিশেষে সে অকৃতকার্যই থেকে যাবে। وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○(المائدة : ٥)

ইসলাম যে প্রত্যয়সমূহ পেশ করেছে, তার কাছে তাই হচ্ছে একমাত্র জ্ঞান, একমাত্র সত্য, একমাত্র হেদায়াত ও একমাত্র আলো। এ যখন তার স্বরূপ, তখন অবশ্যই তার বিরুদ্ধ প্রত্যয়গুলোর একমাত্র অজ্ঞানতা, একমাত্র মিথ্যা, একমাত্র গোমরাহী ও একমাত্র অন্ধকারই হওয়া উচিত। যদি ইসলাম ঐগুলোকে এতো জোরালোভাবে বর্জন করার দাবী না জানাতো এবং ঐ ভ্রান্ত প্রত্যয়সমূহের ধারকদেরকে নির্ভুল ঈমান পোষণকারীদের সমান মূল্য দিতো, তাহলে প্রকারান্তরে সে একথাই স্বীকার করে নিতো যে, তার প্রত্যয়গুলো একমাত্র সত্য নয় এবং সেগুলোর সত্য, হেদায়াত ও আলো হওয়া সম্পর্কে তার নিজেরই পূর্ণ বিশ্বাস নেই। এ অবস্থায় তার পক্ষে ঐ প্রত্যয়গুলোর পেশ করা, ঐগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং সে পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে লোকদেরকে আহ্বান জানানো সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ে। এ জন্যে যে, সে যদি এটা স্বীকার করে নেয় যে, এ পরম জ্ঞানের বিরোধী অন্যান্য জ্ঞানও তার মতোই বিশুদ্ধ অথবা আদৌ কোন পরম জ্ঞান না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই, তাহলে তার এ পরম জ্ঞানকে পেশ করা এবং এর প্রতি ঈমান স্থাপনের আহ্বান জানানো সম্পূর্ণরূপেই নিরর্থক হয়ে যায়। এরূপ যদি সে এও মেনে নেয় যে, এ পরম জ্ঞানের বিরোধী অন্যান্য জ্ঞানের ভিত্তিতে অথবা কোন পরম জ্ঞান ছাড়াই শিক্ষা ও কৃষ্টির যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে, তার মাধ্যমেও মানুষ কল্যাণ লাভ করতে পারে, তাহলে ইসলামী পদ্ধতির অনুসৃতির প্রতি আহ্বান জানানোও একেবারে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

পরন্তু ঈমানের তাৎপর্য সম্পর্কিত পূর্বেকার আলোচনা স্মরণ থাকলে ইসলাম কেন ঈমানের ওপর এতোটা গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা সহজেই বোঝা যাবে। কল্পনার জগতের অধিবাসীরা বালু, পানি, এমনকি হাওয়ার ওপরও প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম একটি বিচক্ষণতাপূর্ণ ধর্ম। ঠুনকো ভিত্তির ওপর সে তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারে না। বরং সবার আগে সে মানুষের আত্মা ও তার চিন্তাশক্তির গভীরে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে।

তার ওপর এমন এক ইমারত গড়ে তোলে যে, কারো হেলানোতে তা হেলে পড়ে না। সে সবার আগে মানুষের মনে এ সত্যটি বদ্ধমূল করে দেয় যে, তোমার ওপর এক আল্লাহ রয়েছেন ; তিনি দুনিয়া ও আখেরাত সর্বত্রই তোমার বিচারক ও বিধায়ক, তাঁর রাজত্ব ও শাসনক্ষমতা থেকে তুমি কিছুতেই বেরিয়ে যেতে পারো না। তাঁর কাছে তোমার কোন কথাই লুকানো নয়। তোমার পথপ্রদর্শনের জন্যে তিনি রসূল পাঠিয়েছেন এবং রসূলের মাধ্যমে তোমায় কিতাব ও শরীয়াত প্রদান করেছেন। তা অনুসরণ করে তুমি সেই প্রকৃত শাসক, বিচারক ও বিধায়কের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারো। তুমি তাঁর বিরোধী কাজ করলে তোমার সে বিরুদ্ধাচরণ যতোই গোপন থাকুক, তিনি অবশ্যই তোমায় পাকড়াও করবেন এবং তার জন্যে শাস্তি প্রদান করতেও কসুর করবেন না। এ ছাপটি মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে এঁকে দেবার পর সে সৎ স্বভাব ও সচ্চরিত্রের শিক্ষাদান করে। ন্যায় ও অন্যায় সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ বাতলে দেয় এবং ঐ ঈমানী ছাপের বলেই সে লোকদের দ্বারা তার নিজস্ব শিক্ষার অনুসৃতি ও বিধি-নিষেধের আনুগত্য করিয়ে নেয়। এ ছাপটি যতো গভীরে হবে, লোকদের অনুবর্তিতা ততোই পূর্ণাংগ হবে, আনুগত্য সেই অনুপাতে মযবুত হবে, আর কৃষ্টি ও ট্রেনিং পদ্ধতিও হবে ততোখানিই শক্তিশালী। আর এ ছাপটি যদি দুর্বল ও অগভীর হয়, অথবা আদৌ বর্তমান না থাকে কিংবা এর পরিবর্তে অন্য কোন ছাপ মনের ওপর আঁকা না থাকে তাহলে নৈতিক শিক্ষার গোটা ব্যবস্থাই একেবারে অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে, ন্যায়-অন্যায়ের বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়বে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির সকল ব্যবস্থাপনাই শিশুদের খেলা ঘরে পরিণত হবে। কাজেই বাস্তবক্ষেত্রে এগুলোর প্রতিষ্ঠা বা স্থিতিশীলতার কোনই নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে তা সুরম্য, প্রশস্ত ও সমুন্নত, কিন্তু তাতে দৃঢ়তা বা স্থিতিশীলতা কোথায় ? এ জিনিসটিকেই কুরআন মজীদ একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিবৃত করেছে ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۝ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝ (ابراهيم : ٢٤-٢٧)

"তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ পবিত্র কালেমার (নির্ভুল প্রত্যয়) কিরূপ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ? তা হচ্ছে যেন একটি উত্তম বৃক্ষ ; তার শিকড় রয়েছে মাটির তলদেশে দৃঢ়মূল আর শাখা-প্রশাখা আসমান পর্যন্ত প্রসারিত। তা তার পরোয়ারদেগারের ইচ্ছানুসারে সর্বদা ফল দান করছে। আল্লাহ লোকদের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে করে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। আর নাপাক কালেমার (ভ্রান্ত প্রত্যয়) দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি নিকৃষ্ট বৃক্ষের মতো ; তা মাটির ওপরিভাগ থেকেই উপড়ে ফেলা যায়। তাতে কোন দৃঢ়তা ও মযবুতির বালাই নেই। আল্লাহ ঈমানদারগণকে একটি সুদৃঢ় বাণী (পরিপক্ক বিশ্বাস) সহকারে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনেই দৃঢ়তা দান করেন এবং যালেমদেরকে এরূপ পথভ্রষ্ট অবস্থায় ত্যাগ করেন। আর আল্লাহ যা চান, তা-ই করেন।"-(সূরা ইবরাহীম ঃ ২৪-২৭)

এ পর্যন্ত ঈমানের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি বিষয়ের প্রতি মোটামুটিভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এবার বিস্তৃতভাবে দেখতে হবে যে, তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ইসলাম কি প্রত্যয় পেশ করছে ? প্রত্যেকটি প্রত্যয়ের প্রয়োজন ও কার্যকারণ কি ? মানুষের চিন্তাশক্তির ওপর তা কি প্রভাব বিস্তার করে এবং লোকদের মন-মানসে তা দৃঢ়মূল হবার পর কিভাবে একটি সৎ ও সুদৃঢ় চরিত্র গঠিত ও বিন্যস্ত হয়ে থাকে ?

৩. আল্লাহর প্রতি ঈমান

আল্লাহর প্রতি ঈমানের গুরুত্ব

ইসলামের প্রত্যয় ও আচরণের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় প্রথম ও মৌলিক জিনিস হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। প্রত্যয় ও ঈমানের আর যত দিক ও বিভাগ রয়েছে তা হচ্ছে ঐ এক মূল কাণ্ডেরই শাখা-প্রশাখা মাত্র। ইসলামের যত নৈতিক বিধি ব্যবস্থা ও সামাজিক আইন-কানুন রয়েছে, তা ঐ কেন্দ্রবিন্দু থেকেই শক্তি অর্জন করে থাকে। এখানকার প্রতিটি জিনিসেরই উৎস ও প্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে আল্লাহর সত্তা। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান পোষণের কারণ এই যে, তারা আল্লাহর ফেরেশতা। পয়গম্বরদের প্রতি ঈমান পোষণের কারণ এই যে, তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত। কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান পোষণের কারণ এই যে, তা আল্লাহর নির্ধারিত বিচার ও হিসাব গ্রহণের দিন। ফরযসমূহ এ জন্যেই ফরয হয়েছে যে, সেগুলো আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। পারস্পরিক অধিকারগুলো এ জন্যেই অধিকার পদবাচ্য হয়েছে যে, সেগুলো আল্লাহর হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। সৎকাজের প্রবর্তন ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধ এ জন্যেই আবশ্যক যে, আল্লাহ তার নির্দেশ দান করেছেন। ফল কথা, ইসলামের প্রতিটি জিনিসের তা প্রত্যয় হোক কি আচরণ—ভিত্তিই এ (আল্লাহর প্রতি) ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ একটি মাত্র জিনিসকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললে ফেরেশতা ও কেয়ামত দিবস একেবারে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। নবী, রসূল এবং তাঁদের আনীত কিতাবাদি আনুগত্য লাভের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফরয, ওয়াজিব, আনুগত্য, অধিকার ইত্যাদি তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। আদেশ-নিষেধ ও বিধি-ব্যবস্থায় কোন বাধ্য বাধকতা থাকে না। মোটকথা, এ একটি মাত্র কেন্দ্রবিন্দু অপসৃত হলেই ইসলামের গোটা ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, বরং ইসলাম বলে কোন জিনিসেরই অস্তিত্ব থাকে না।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিস্তৃত ধারণা

যে প্রত্যয়টি এ বিশাল আদর্শিক ও ব্যবহারিক ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রবিন্দু এবং শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করছে, তা কেবল এটুকু কথাই নয় যে, 'আল্লাহ তায়ালা আছেন।' বরং সে নিজের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার গুণরাজি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল ধারণাও (তাঁর সম্পর্কে মানুষের পক্ষে যতখানি ধারণা করা সম্ভব) পোষণ করে এবং গুণরাজি সম্পর্কিত এ ধারণা থেকে এমন শক্তি অর্জিত হয় যা মানুষের গোটা আদর্শিক ও ব্যবহারিক শক্তি নিচয়ের ওপর পরিব্যপ্ত ও কর্তৃত্বশীল হয়ে যায়। নিছক স্রষ্টার অস্তিত্বের স্বীকৃতিই এমন কোন

জিনিস নয়, যাকে ইসলামের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আখ্যা দেয়া যেতে পারে। অন্যান্য জাতিও কোন না কোনরূপে স্রষ্টার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যে বস্তুটি ইসলামকে সকল ধর্ম ও দ্বীনের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, তাহলো এই যে, স্রষ্টার গুণরাজি সম্পর্কে সে এক নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত ধারণা পেশ করেছে। পরন্তু সেই জ্ঞানকে ঈমান, বরং ঈমানের ভিত্তি বানিয়ে তার সাহায্যে আত্মশুদ্ধি, নৈতিক সংশোধন, কর্ম সংগঠন, সৎকাজের প্রসার, দুষ্কৃতির প্রতিরোধ এবং সভ্যতার গোড়া পত্তনে এতো বড়ো কাজ সম্পাদন করা হয়েছে যে, দুনিয়ার কোন ধর্ম বা জাতিই তা করতে পারেনি।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের সংক্ষিপ্ত রূপটি হচ্ছে—যার মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসকে ইসলামে প্রবেশ করার প্রাথমিক ও আবশ্যক শর্ত ঘোষণা করা হয়েছে—কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অর্থাৎ মুখে একথাটি স্বীকার করা এবং অন্তর দিয়ে একে বিশ্বাস করা যে, যে মহান সত্তা আল্লাহ নামে পরিচিত, তিনি ছাড়া আর কোন 'ইলাহ' (প্রভু) নেই। অন্য কথায় এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, 'খোদায়ী'কে (الوهيت) বিশ্বপ্রকৃতির সকল বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল একটি মাত্র সত্তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে ; এবং খোদায়ীর (الوهيت) জন্যে নির্ধারিত সকল আবেগ-অনুভুতি, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-কল্পনা, মতবিশ্বাস ও ইবাদাত আনুগত্যেকে সেই এক সত্তার সাথে সম্পৃক্ত করে দিতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত কালেমাটির মূল উপাদান তিনটি ঃ

এক ঃ প্রভুত্ব (الوهيت) সম্পর্কিত ধারণা।

দুই ঃ সমস্ত বস্তুনিচয়ের প্রতি তার অস্বীকৃতি।

তিন ঃ কেবল আল্লাহর জন্যে তার স্বীকৃতি।

বস্তুত আল্লাহর সত্তা ও গুণরাজি সম্পর্কে কুরআন মজীদে যা কিছু বলা হয়েছে, তা এ তিনটি বিষয়েরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা মাত্র।

প্রথমত সে 'খোদায়ী' (الوهيت) সম্পর্কে এমন এক পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল ধারণা পেশ করেছে, যা দুনিয়ার কোন কিতাব বা ধর্মেই আমরা দেখতে পাই না। অবশ্য একথা নিসন্দেহে যে, সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যেই এ ধারণা কোন না কোনভাবে বর্তমান রয়েছে। কিন্তু সর্বত্রই তা ভ্রান্ত কিংবা অসম্পূর্ণ। কোথাও 'খোদায়ী' (الوهيت) বলা হয়েছে প্রারম্ভকে, কোথাও একে শুধু সূত্রপাত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও একে শক্তি ও ক্ষমতার সমর্থক মনে করা হয়েছে, কোথাও এ শুধু ভীতি ও আতঙ্কের বস্তু হয়ে রয়েছে। কোথাও তা শুধু প্রেমের কেন্দ্রস্থল, কোথাও এর অর্থ কেবল প্রয়োজন পূরণ ও আমন্ত্রণ গ্রহণ। কোথাও তাকে মূর্তি ও প্রতিকৃতি দ্বারা কলঙ্কিত করা হয়েছে। কোথাও তিনি আসমানে

অবস্থান করেন, আবার কোথাও তিনি মানুষের বেশ ধারণ করে দুনিয়ায় অবতরণ করেন। এ সকল ভ্রান্ত ও অপূর্ণ ধারণাকে পরিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ করেছে একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআন। এ পবিত্র গ্রন্থই খোদায়ীকে (الوهيت) পবিত্রতা ও মহত্ব দান করেছে। সে-ই আমাদের বলেছে যে, এমন সত্তাই কেবল 'ইলাহ' বা প্রভু হতে পারেন, যিনি বে-নিয়াজ, অন্য নিরপেক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও চির ীব, যিনি চিরকাল ধরে আছেন এবং চিরদিন থাকবেন, যিনি একচ্ছত্র শাসক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান, যার জ্ঞান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যার রহমত ও অনুগ্রহ সবার জন্যে প্রসারিত, যার শক্তি সবার ওপর বিজয়ী, যার হিকমত ও বুদ্ধিমত্তায় কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, যার আদল ও ইনসাফে যুলুমের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, যিনি জীবনদাতা এবং জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণাদির সরবরাহকারী। যিনি ভালো-মন্দ এবং লাভ ও ক্ষতির যাবতীয় শক্তির অধিকারী, যার অনুগ্রহ ও হেফাযতের সবাই মুখাপেক্ষী, যার দিকেই সকল সৃষ্ট বস্তু প্রত্যাবর্তনশীল, যিনি সবার হিসাব গ্রহণকারী, শাস্তি ও পুরস্কার দানের একমাত্র মালিক, পরন্তু খোদায়ী সংক্রান্ত এ গুণাবলী বিভাজ্য ও খণ্ডনীয়ও নয় যে, একই সময়ে একাধিক আল্লাহ (الله) থাকবেন এবং তারা উল্লেখিত গুণরাজি কিংবা তার একটি অংশ দ্বারা গুণান্বিত হবেন, অথবা এ কোন সাময়িক এবং কালগত ব্যাপারও নয় যে, একজন আল্লাহ কখনো ঐগুলোর দ্বারা গুণান্বিত হবেন, আবার কখনো হবেন না, কিংবা এ কোন স্থানান্তরযোগ্য জিনিসও নয় যে, আজ একজন আল্লাহর মধ্যে এর অস্তিত্ব দেখা যায়, আবার কাল দেখা যায় অন্য জনের মধ্যে।

খোদায়ী সম্পর্কে এ পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধ ধারণা পেশ করার পর কুরআন তার অনন্য বাচনভঙ্গির দ্বারা প্রমাণ করছে যে, বিশ্বপ্রকৃতির সকল বস্তু ও শক্তি নিচয়ের মধ্যে কোন একটির প্রতিও এ অর্থপ্রয়োগ সঙ্গত হতে পারে না। কেননা বিশ্বের সকল সৃষ্ট বস্তুই অন্য নির্ভর, পরাধীন এবং ধ্বংস ও বিনাশশীল। তাদের পক্ষে অন্যের উপকারী বা অপকারী হওয়া তো দূরের কথা, তারা খোদ নিজেদের থেকে অপকারিতা দূর করতেও সমর্থ নয়। তাদের ক্রিয়াকাণ্ড ও প্রভাব প্রতিক্রিয়ার উৎস তাদের আপন সত্তার মধ্যে নয়, বরং তারা সবাই অন্য কোথাও থেকে জীবনী শক্তি, কর্মশক্তি ও প্রভাব শক্তি অর্জন করে থাকে। কাজেই বিশ্বপ্রকৃতিতে এমন কোন বস্তুই নেই, যার ভেতরে প্রভুত্বের অনুমাত্র যোগ্যতা আছে এবং যে আমাদের গোলামী ও আনুগত্যের একটি অংশ মাত্রও পাবার অধিকারী হতে পারে।

এ অস্বীকৃতির পর সে খোদায়ীকে একটি মাত্র সত্তার জন্যে সুনির্দিষ্ট করে দেয়, যার নাম হচ্ছে 'আল্লাহ'। সেই সাথে সে মানুষের কাছে দাবী করে যে, আর সবাইকে বর্জন করে কেবল এরই প্রতি ঈমান আনো, এর সামনেই নত হও, একেই সম্মান করো, একেই ভালোবাসো, একেই ভয় করো, এর কাছেই

প্রত্যাশা করো, এর কাছেই কামনা করো, সর্বাবস্থায় এর ওপরই ভরসা করো, হামেশা মতে রাখো, একদিন তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে, তাঁর কাছেই হিসেব দিতে হবে, তোমাদের ভালো বা মন্দ পরিণতি তাঁর ফায়সালার ওপরই নির্ভরশীল।

আল্লাহর প্রতি ঈমানের নৈতিক উপকার

খোদায়ী গুণরাজি সম্পর্কিত এ বিস্তৃত ধারণার সাথে আল্লাহর প্রতি যে ঈমান মানব হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তার ভেতরে এমন সব অসাধারণ উপকারিতা রয়েছে, যা অন্য কোন বিশ্বাস বা প্রত্যয় দ্বারা অর্জন করা যেতে পারে না।

দৃষ্টির প্রশস্ততা

আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রথম সুফল এই যে, তা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে এতোটা প্রশস্ত করে দেয়, যতোটা প্রশস্ত আল্লাহর অসীম সাম্রাজ্য। মানুষ যতক্ষণ নিজের স্বার্থ সম্পর্কে বিবেচনা করে দুনিয়ার প্রতি তাকায়, তার দৃষ্টি এমন এক সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকে, যার মধ্যে তার শক্তি ক্ষমতা, জ্ঞান-বুদ্ধি ও কামনা-বাসনা সীমিত, এ পরিধির মধ্যেই সে নিজের জন্যে প্রয়োজন পূরণকারী তালাশ করে। এ পরিধির মধ্যে যেসব শক্তিমান রয়েছে, তাদের ভয়েই সে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়, আর যারা দুর্বল ও কমজোর, তাদের ওপর কর্তৃত্ব চালায়। এ পরিধির মধ্যেই তার বন্ধুত্ব ও শত্রুতা, প্রীতি ও ঘৃণা, সম্মান ও তাচ্ছিল্য সীমিত থাকে—যার জন্যে ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া তার কোন মানদণ্ড থাকে না। কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমানের পর তার দৃষ্টি নিজস্ব পরিবেশের সীমাতিক্রম করে গোটা বিশ্বপ্রকৃতির ওপর প্রসারিত হয়ে যায়। এরপর সে বিশ্বপ্রকৃতির ওপর নিজস্ব স্বার্থ সম্পর্কের দিক থেকে নয়, বরং খোদাওন্দে করীমের সম্পর্কের দিক থেকে দৃষ্টিপাত করে। এবার এ বিশাল জগতের প্রতিটি জিনিসের সাথে তার একটি ভিন্ন রকমের সম্পর্ক কায়েম হয়ে যায়। এবার সে তার মধ্যে কোন প্রয়োজন পূরণকারী, কোন শক্তিধর, কোন অপকারী কিংবা উপকারী দেখতে পায় না। এবার সে সম্মান বা তাচ্ছিল্য, ভয় বা প্রত্যাশার যোগ্য কাউকে খুঁজে পায় না। এবার তার বন্ধুত্ব বা শত্রুতা, প্রীতি বা ঘৃণা নিজের জন্যে নয়, বরং তা আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত হয়। সে লক্ষ্য করে যে, যে আল্লাহকে আমি মানি, তিনি শুধু আমার, আমার বংশের কিংবা আমার দেশবাসীরই সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা নন, বরং তিনি সমগ্র আসমান ও জমিনের স্রষ্টা এবং সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। তাঁর কর্তৃত্ব রাজত্ব শুধু আমার দেশ পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং তিনি আসমান ও জমিনের বাদশাহ এবং সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক। তাঁর ইবাদাত বন্দেগী শুধু আমি একাই করছি না বরং আসমান ও

জমিনের সমগ্র বস্তু নিচয়ই তাঁর সামনে আত্মসমর্পিত। وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا ـ(ال عمران : ٨٣) সবাই তাঁরই প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা কীর্তনে মশগুল। تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط ـ(بنى اسرائيل : ٤٤) এ প্রেক্ষিতে যখন তিনি বিশ্বপ্রতিকে দেখেন, তখন কেউই তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকে না, সবাই আপনা আপনিই তাঁর দৃষ্টির সামনে এসে ধরা দেয়। তাঁর সহানুভূতি, তাঁর ভালোবাসা, তাঁর খেদমত এমন কোন পরিধির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না যার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রেক্ষিতে।

কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, সে কখনো সংকীর্ণ দৃষ্টি হতে পারে না। তার দৃষ্টি এতটা প্রশস্ত যে 'আন্তর্জাতিকতা' (Internationalism) কথাটিও তার ক্ষেত্রে সংকীর্ণ। তাকে তো 'দিগ্বলয়ী' ও 'সৃষ্টিবাদী' বলা উচিত।

আত্মসম্ভ্রম

পরন্তু আল্লাহর প্রতি এ ঈমানই মানুষকে হীনতা থেকে উদ্ধার করে আত্মসম্মান ও আত্মসম্ভ্রমের উচ্চতম স্তরে উন্নীত করে দেয়। যত দিন সে আল্লাহকে চিনতো না, দুনিয়ার প্রতিটি শক্তিমান বস্তু, প্রতিটি উপকারী বা অপকারী জিনিস, প্রতিটি জমকালো প্রকাণ্ড বস্তুর সামনেই সে মাথা নত করতো। তার ভয়ে সে ভীত হতো। তার সামনে হাত প্রসারিত করতো। তার কাছে প্রার্থনা প্রত্যাশা করতো। কিন্তু যখন সে আল্লাহকে চিনেছে তখন জানতে পেরেছ যে, যাদের সামনে সে হাত প্রসারিত করছিলো, তারা নিজেরাই অন্য নির্ভর, পরমুখাপেক্ষী। يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ ـ(بنى اسرائيل : ٥٧) যাদের বন্দেগী ও আনুগত্য সে করছিলো, তাঁরা নিজেরাই তার মতো দাসানুদাস মাত্র। اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادٌ اَمْثَالُكُمْ ـ(الاعراف : ١٩٤) যাদের কাছে সে সাহায্যের প্রত্যাশা করতো, তারা তার সাহায্য তো দূরের কথা, নিজেই নিজের সাহায্য করতে সমর্থ নয়। لَايَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرًا وَّلَآ اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ـ(الاعراف : ١٩٢) কারণ প্রকৃত শক্তির মালিক তো হচ্ছেন আল্লাহ। اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ـ(البقرة : ١٦٥) তিনিই শাসনকর্তা, বিধানদাতা ও আদেশদাতা। اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ـ(الانعام : ٥٧) তিনি ছাড়া আর কোন সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক ও মদদগার নেই। وَمَا لَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ـ(البقرة : ١٠٧) সাহায্য কেবল তাঁরই কাছ থেকে আসে। وَمَا

(আল عمران : ١٢٦) النَّصْرُ اِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ـ(ال عمران : ١٢٦) রেযকদাতা একমাত্র তিনিই। اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُوْ الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ـ(الذاريات : ٥٨) আসমান জমিনের চাবিকাঠি তাঁর হাতেই নিবদ্ধ। وَلَهُ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ ـ(الشورى : ١٢) মৃত্যুদাতা ও জীবনদাতা তিনিই ; তাঁর অনুমতি ভিন্ন না কেউ কাউকে মারতে পারে, না কাউকে বাঁচাতে পারে। مَاكَانَ لِنَفْسٍ اَن تَمُوتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ(ال عمران : ١٤٥) وَاللّٰهُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ ـ(ال عمران : ١٥٦) উপকার অপকার করার আসল ক্ষমতা তাঁরই করায়ত্ত। وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ اِلاَّ هُوَ ج وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لِفَضْلِهِ ـ(يونس : ١٠٧) এরূপ জ্ঞান অর্জিত হবার পর সে তামাম দুনিয়ার শক্তিনিচয় থেকে বে-নিয়াজ বেপরোয়া ও নির্ভীক হয়ে যায়। আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তির সামনে তার মাথা নত হয় না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে তার হাত প্রসারিত হয় না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব তার মনে ঠাঁই পায় না। আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে সে প্রার্থনা ও প্রত্যাশা করে না।

বিনয় ও নম্রতা

কিন্তু এ আত্মসম্মান তার শক্তি, সম্পদ, কিংবা যোগ্যতা ও প্রতিভার বলে অর্জিত কোন মিথ্যা আত্মসম্মান নয়। এ আত্মসম্ভ্রম এমন আত্মসম্ভ্রমও নয়, যা একজন বিপথগামী লোকের মধ্যেও গর্ব ও অহংকারের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। বরং এ হচ্ছে আল্লাহর সাথে নিজের এবং সমগ্র সৃষ্টিজগতের সম্পর্ককে যথাযথরূপে উপলব্ধি করার ফলশ্রুতি। এ কারণেই আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারীদের মধ্যে আত্মসম্মানের সাথে বিনয়ের এবং আত্মসম্ভ্রমের সাথে নম্রতা ও কোমলতার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে জানে যে, আল্লাহর শক্তি ক্ষমতার সামনে আমি সম্পূর্ণ অসহায়। وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ـ(الانعام : ٦١) আল্লাহর কর্তৃত্ব থেকে বেরিয়ে আসা আমার কিংবা অন্য কোন সত্তার সাধ্যায়ত্ব নয়। يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ط لاَتَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطَانٍ ـ(الرحمن : ٣٣) আমি তো কোন্ ছার, গোটা বিশ্বজাহানই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ হচ্ছেন বে-নিয়াজ, অমুখাপেক্ষী। وَاللّٰهُ الْغَنِىُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ـ(محمد : ٣٨) আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর। لِلّٰهِ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ(البقرة : ٢٨٤) আর আমিও যা কিছু অনুগ্রহ সম্পদ পেয়েছি,

আল্লাহর কাছ থেকেই পেয়েছি। এহেন বিশ্বাসের পর গর্ব ও অহংকার কোথায় থাকতে পারে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের তো অনিবার্য সুফলই হচ্ছে এই যে, তা মানুষকে আপাদমস্তক বিনয়ী করে তোলে।

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ـ(الفرقان : ٦)

"দয়াময় আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা তারাই, যারা দুনিয়ার বুকে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে আর যখন জাহেল লোকেরা তাদের সাথে জাহেলি কথা-বার্তা বলে, তখন সালাম করে চলে যায়।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৩)

অলীক প্রত্যাশার বিলুপ্তি

স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্কের নির্ভুল পরিচিতির আর একটি ফায়দা হলো এই যে, এর দ্বারা অপরিচয়জনিত সকল অলীক প্রত্যাশা ও মিথ্যা ভরসার পরিসমাপ্তি ঘটে। সেই সাথে মানুষ খুব উত্তমরূপে বুঝে নেয় যে, তার জন্যে নির্ভুল বিশ্বাস ও সৎকার্যক্রম ছাড়া মুক্তি ও কল্যাণের আর কোন পথ নেই। পক্ষান্তরে এ পরিচয় থেকে যারা বঞ্চিত, তাদের কেউ কেউ মনে করে যে, আল্লাহর কাজে আরো অনেক ছোট ছোট আল্লাহও শরীক রয়েছে ; আমরা তাদের তোষামোদ করে সুপারিশ করিয়ে নেবো। وَيَقُوْلُوْنَ هٰـؤُلاَءِ شُفَعَاءُ نَا عِنْدَ اللّٰهِ ـ(يونس : ١٨) কেউ মনে করে আল্লাহর পুত্র সন্তান রয়েছে এবং সেই পুত্র আমাদের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে মুক্তির অধিকারকে সুরক্ষিত করে দিয়েছে। কেউ ভাবে, আমরা নিজেরাই আল্লাহর পুত্র এবং তার প্রিয়পাত্র। قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰۤؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ আমরা যা কিছুই করি না কেন, আমাদের শাস্তি হতে পারে না।

এবম্বিধ বহু ভ্রান্ত প্রত্যাশাই লোকদের হামেশা গোনাহ ও পাপচক্রে ফাঁসিয়ে রাখে। কারণ, ঐ সবের ভরসায় তারা আত্ম পরিশুদ্ধি ও কর্ম সংশোধনের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে। কিন্তু কুরআন যে আল্লাহর প্রতি ঈমানের শিক্ষা দেয়, তাতে অলীক প্রত্যাশার কোন অবকাশ নেই। সে বলে যে, আল্লাহর সাথে কোন জাতি বা সম্প্রদায়েরই বিশেষ সম্পর্ক নেই। সবাই তাঁর সৃষ্টি এবং তিনি সবার স্রষ্টা। بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ـ মহত্ব এবং বিশেষত্ব যা কিছুই রয়েছে, তা হচ্ছে 'তাকওয়ার' ওপর নির্ভরশীল। اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ(الحجرات : ١٣) আল্লাহর না কোন সন্তান আছে, আর না কোন অংশীদার ও মদদগার আছে। لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِنَ الذُّلِّ ـ(بنى اسرائيل : ١١١) তোমরা যাদেরকে তাঁর সন্তান কিংবা

অংশীদার মনে করো, তারা সবাই তাঁর বান্দাহ এবং গোলাম। بَلْ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ -(البقرة : ١١٦) তার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার মতো দুঃসাহসও কারো মধ্যে নেই। مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهِ -(البقرة : ٢٥٥) তোমরা যদি নাফরমানী করো তাহলে কোন সুপারিশকারী বা মদদগারিই তাঁর কবল থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারবে না। وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ ج وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ مِنْ وَّالٍ -। اا

আশাবাদ ও মানসিক শান্তি

এরই সাথে আল্লাহর প্রতি ঈমান মানুষের মধ্যে এমন একটা আশাপ্রদ মনোভাব সৃষ্টি করে, যা কোন অবস্থায়ই নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহ দ্বারা পরাভূত হয় না। বস্তুত মু'মিনের পক্ষে ঈমান হচ্ছে আশা-আকাঙ্খার এক অফুরন্ত ভাণ্ডার —যেখান থেকে সে আন্তরিক শক্তি ও আত্মিক প্রশান্তির চিরস্থায়ী ও অবিচ্ছিন্ন উপকরণ পেতে থাকে। তাকে যদি দুনিয়ার সমস্ত দরজা থেকেও বিমুখ করা হয়, সমগ্র সাজ-সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত করা হয়, উপায়-উপকরণাদি একে একে তার সঙ্গ ত্যাগ করে, তবু এক আল্লাহর অবলম্বন কখনো তার সঙ্গ ত্যাগ করে না। তাঁর ওপর নির্ভর করে হামেশাই সে আশা-আকাঙ্খায় উদ্দীপিত থাকে। এর কারণ এই যে, যে আল্লাহর প্রতি সে ঈমান এনেছে, তিনি বলেছেন ঃ আমি তোমাদের খুব নিকটবর্তী, তোমাদের ডাক আমি শুনে থাকি। وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ -(البقرة : ١٨٦) আমার কাছ থেকে যুলুমের ভয় করো না, কারণ আমি যালেম নই। وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ -(ال عمران : ١٨٢) বরং আমার রহমতের প্রত্যাশা করো, কারণ আমার রহমত প্রতিটি জিনিসের ওপর প্রসারিত। وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ط -(الاعراف : ١٥٦) আমার রহমত থেকে নিরাশ তো কেবল সেই হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান পোষণ করে না। اِنَّهُ لَايَاْيْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ -(يوسف : ٨٧) পক্ষান্তরে মু'মিনের জন্যে নৈরাশ্যের কোনই স্থান নেই। সে যদি কোন অপরাধ করে ফেলে তাহলে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো। وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا -(النساء : ١١٠) অন্যত্র وَقُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط -(الزمر : ٥٣) যদি দুনিয়ার সাজ

সরঞ্জাম তার সহযোগিতা না করে, তবে তাদের ভরসা বর্জন করে সে আমাকে আঁকড়ে ধরুক, অতপর ভয়-ভীতি-শঙ্কা তার কাছেও ঘেঁষবে না। আমার স্মরণ হচ্ছে اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا ـ(حم السجدة : ٣٠) এমন জিনিস, যার দ্বারা মানব হৃদয় স্থিতি ও প্রশান্তি লাভ করে। اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ـ(الرعد : ٢٨)।

ধৈর্য-স্থৈর্য ও নির্ভরতা صبر و توكل

পরন্তু এ আশাবাদই বিকাশ লাভ করে ধৈর্য-স্থৈর্য ও আল্লাহর ওপর নির্ভরতার উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়, যেখানে মু'মিনের হৃদয় এক কঠিন প্রস্তর ভূমির ন্যায় মযবুত ও সুদৃঢ় হয়ে যায়। সারা দুনিয়ার বিপদাপদ, শক্রতা, দুঃখ-কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি ও বিরুদ্ধ শক্তি একত্র হয়েও তাকে নিজের স্থান থেকে টলাতে পারে না। এ শক্তি মানুষ কেবল আল্লাহর প্রতি ঈমান ছাড়া আর কোন পন্থায় অর্জন করতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে না, সে এমনসব বস্তুগত বা কাল্পনিক উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর করে, যা আদতেই কোন শক্তির অধিকারী নয়। এদের ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি প্রকারান্তরে মাকড়সার জালকেই অবলম্বন করে থাকে। مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ـ(العنكبوت : ٤١) এরূপ দুর্বল অবলম্বনের ওপর যার জীবন নির্ভরশীল, তার পক্ষে দুর্বল হয়ে পড়া অবধারিত। ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ـ(الحج : ٧٣)। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, যে আল্লাহকে আকড়ে ধরেছে, তার অবলম্বন এমন মযবুত যে, তা কখনো চুরমার হতে পারে না। فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لاَانْفِصَامَ لَهَا ط ـ(البقرة : ٢٥٦) তার সাথে তো রয়েছে রাব্বুল আলামীনের অপরাজেয় শক্তি, তার উপরে কোন শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে ? اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ ج ـ(ال عمران : ١٢٠) তাকে সমগ্র জাহানের বিপদ-মছীবত একত্র হয়েও ধৈর্য-স্থৈর্য, সংকল্প ও দৃঢ়তার স্থান থেকে বিচ্যুত করতে পারে না ; কারণ তার মতে ভালো-মন্দ সবকিছুই আসে আল্লাহর তরফ থেকে قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط ـ(النساء : ٧٨) বিপদ মুসিবত যা কিছুই আসে, আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারেই আসে এবং তাকে বিলম্বিত করাও আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَاكَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ مَوْلٰنَا ج وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ○(التوبة : ٥١)

নবীগণ (আ) যে অতি মানবিক শক্তি দ্বারা দুনিয়ায় ভয়াবহ বিপদাপদের মুকাবিলা করেছেন, বড় বড় সাম্রাজ্য ও শক্তিমান জাতির সাথে এককভাবে লড়াই করেছেন, পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই দুনিয়া জয় করার সংকল্প নিয়ে এগিয়েছেন এবং বিপদাপদের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার মুখেও নিজের মিশনকে অব্যাহত রেখেছেন, তা হচ্ছে এ সবর ও তাওয়াক্কল তথা ধৈর্য-স্থৈর্য ও নির্ভরতার শক্তি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন কাহিনী দেখুন। নিজ দেশের স্বৈরাচারী শাসকের সাথে তিনি তর্ক করেছেন, নিঃশঙ্কাভাবে আগুনের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّهٖ سَيَهْدِيْنِ বলে কোন উপায়-অবলম্বন ছাড়াই দেশ থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। এমনভাবে হযরত হূদ (আ)-এর জীবন কাহিনী দেখুন। আদ জাতির প্রচণ্ড শক্তিকে তিনি কিভাবে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন ঃ

فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَاتُنْظِرُوْنَ○ اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ط (هود : ٥٥ - ٥٦)

"তোমরা সবাই মিলে ফন্দি খাটিয়ে দেখো এবং আমায় আদৌ কোন অবকাশ দিও না। আমি তো সেই আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার এবং তোমাদের প্রভু। এমন কোন প্রাণী নেই, যার টুটি তাঁর হাতে নিবদ্ধ নয়।"–(সূরা হূদ ঃ ৫৫-৫৬)

একইভাবে হযরত মূসা (আ)-এর জীবন কাহিনী দেখুন। একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করে ফেরাউনের প্রচণ্ড শক্তির সাথে তিনি মুকাবিলা করেছেন। ফেরাউন হত্যার হুমকি দিলে তিনি জবাব দেন যে, আমি প্রত্যেক অহংকারীর মুকাবিলায় তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেছি, যিনি আমার এবং তোমার উভয়েরই প্রভু। اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ -(المؤمن : ٢٧) মিসর ত্যাগ করার সময় ফেরাউন তাঁর পূর্ণ দলবলসহ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে। তাঁর ভীরু সম্প্রদায় ভীত হয়ে বলছে যে, দুশমনরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে اِنَّ الْمُدْرَكُوْنَ। কিন্তু তিনি অত্যন্ত মানসিক প্রশান্তির সাথে জবাব দেন ঃ মোটেই নয়, আল্লাহ আমার সাথে রয়েছেন ; তিনিই আমায় শান্তি নিরাপত্তার পথে চালিত করবেন। كَلَّا ج اِنَّ مَعِىَ رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ -(الشعراء : ٦٢) সবশেষে নবী আরবী (সা)-কে দেখুন। হিজরতের সময় একটি গিরিগুহায় তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে রয়েছেন মাত্র একজন বন্ধু। রক্ত পিপাসু কাফেররা একেবারে গুহার মুখ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তখনও তাঁর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয় না। বরং আপন সাথীকে তিনি বলেন ঃ لَاتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا -(التوبة : ٧٠) আদৌ ঘাবড়িয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।

এহেন অপরাজেয় শক্তি, এ ইস্পাত কঠিন সংকল্প, এ পর্বত তুল্য স্থিরতা একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান ছাড়া আর কিসের দ্বারা অর্জিত হতে পারে ?

বীরত্ব

এরই অনুরূপ আর একটি গুণ আল্লাহর প্রতি ঈমানের দ্বারা অস্বাভাবিক রকমে সৃষ্টি হয় ; তাহলো সাহসিকতা, নির্ভীকতা, বীর্যবত্তা ও শৌর্যশালীতা, মানুষকে দু'টি জিনিস ভীরু ও কাপুরুষ বানিয়ে দেয়। প্রথম হচ্ছে নিজের প্রাণ, পরিবার-পরিজন ও ধন-মালের প্রতি ভালোবাসা। দ্বিতীয় হচ্ছে, ভয়-ভীতি, যা এ ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত যে, হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে ক্ষয়-ক্ষতি ও ধ্বংস শক্তি নিহিত রয়েছে। আল্লাহর প্রতি ঈমান এ দু'টি জিনিসকেই মানুষের মন থেকে দূর করে দেয়। মু'মিনের শিরা-উপশিরায় এ বিশ্বাসের ধারা প্রবাহিত হয় যে, আল্লাহ সবার চেয়ে বেশী ভালোবাসা পাবার অধিকারী। (البقرة : ١٦٥) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ـ তার মনে একথা দৃঢ়মূল হয়ে যায় যে, ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততি সবই দুনিয়ার সৌন্দর্য সম্ভার মাত্র ; এগুলোর কোন না কোন সময় ধ্বংস অবধারিত। কখনো ধ্বংস হবে না, এমন অক্ষয় ও অবিনশ্বর হচ্ছে আল্লাহর কাছ থেকে প্রাপ্য জিনিস। اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً ـ(الكهف : ٤٦) দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের জন্যে ; একে রক্ষা করার জন্যে আমরা লাখো প্রচেষ্টা চালালেও মৃত্যু একদিন আসবেই, এটা সুনিশ্চিত। قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّه مُلٰقِيْكُمْ ـ(الجمعة : ٨) । اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط ـ(النساء : ٧٨) সুতরাং এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে কেন সেই অনন্ত সুখময় জীবনের জন্যে উৎসর্গ করে দেবো না, যা আল্লাহর কাছ থেকে পাওয়া যাবে ? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاۤءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه ـ(ال عمران : ١٦٩ـ١٧٠) কেন দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ও সাময়িক স্বার্থকে সেই আল্লাহর সন্তোষলাভের জন্যে নিবেদিত করে দেবো না, যিনি আমাদের জান ও মালের প্রকৃত মালিক—যিনি এর বিনিময়ে এর চেয়ে উত্তম জীবন এবং এর চেয়েও বেশী মঙ্গল দানের অধিকারী ? اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف (التوبه : ١١١)

এরপর ভয়-ভীতির কথা। মু'মিনকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ক্ষতি ও বিনাশ করার প্রকৃত শক্তি মানুষ, পশু, গোলা বারুদ, তলোয়ার, কাঠ বা পাথরের মধ্যে নেই, বরং তা রয়েছে আল্লাহর নিরংকুশ শক্তির মুঠোর মধ্যে। দুনিয়ার সকল শক্তি একত্র হয়েও যদি কারো ক্ষতি করতে চায়, আর আল্লাহরই অনুমতি না হয়, তবে তার একটি চুল পর্যন্ত বাঁকা হতে পারে না। وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ ـ(البقرة : ١٠٢) মৃত্যুর যে সময় আল্লাহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তার পূর্বে কারোই মৃত্যু আসতে পারে না। وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلاً ـ(ال عمران : ١٤٥) আর মৃত্যুর নির্ধারিত সময় যদি এসেই পড়ে, তবে কারো বাহানায় তা বিলম্বিতও হতে পারে না। قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ج ـ(ال عمران : ١٥٤) সুতরাং ব্যাপারটা যখন এই, তখন মানুষকে ভয় করার চেয়ে আল্লাহকেই ভয় করা উচিত। فَلاَ تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (ال عمران : ١٧٥) প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন এমন সত্তা, যাকে ভয় করা কর্তব্য। وَاللّٰهُ اَحَقُّ تَخْشٰهُ ـ(الاحزاب : ٣٧) খোদার পথে সংগ্রাম করতে ইতস্তত করা এমন লোকের কাজ, যাদের হৃদয়ে ঈমান নেই, কেননা তারা আল্লাহর চেয়ে মানুষকে বেশী ভয় করে। يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً ج ـ(النساء : ٧٧) নতুবা যে ব্যক্তি সাচ্চা মু'মিন, সে তো দুশমনকে দেখে ভীত হবার পরিবর্তে আরো বেশী সাহসী ও নির্ভীক হয়, কারণ সে কোন পার্থিব শক্তির ওপর নয়, বরং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ق وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ○ (ال عمران : ١٧٣)

অল্পে তুষ্টি ও আত্মতৃপ্তি

আল্লাহর প্রতি এ ঈমানই মানুষের মন থেকে লোভ-লালসা ও হিংসা-দ্বেষের ঘৃণ্য প্রবণতাকে দূর করে দেয়, যা তাকে স্বার্থ উদ্ধার করার জন্যে হীন ও অবৈধ পন্থা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানব সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে। ঈমানের সাথে মানুষের ভেতর অল্পে তুষ্টি ও আত্মতৃপ্তির সৃষ্টি হয়। অন্য মানুষের সাথে সে প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না। অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিকারে কখনো তাড়াহুড়ো করে না। হামেশা সম্মানজনক পন্থায় আপন প্রভুর অনুগ্রহ সম্পদ তালাশ করে বেড়ায় ; এবং কম বেশী যা কিছুই পায়, তাকেই আল্লাহর দান মনে করে শিরোধার্য করে নেয়। মু'মিনকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ ; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ج يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ــ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ط ـ(ال عمران : ٧٤) রেযেক আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ ; তিনি যাকে যতো ইচ্ছা দান করে থাকেন। اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ط ـ(الرعد : ٢٦) রাষ্ট্রশক্তি ও শাসন ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার করায়ত্ত ; যাকে ইচ্ছা তিনি শাসনকর্তা বানিয়ে দেন। اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ لا يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ ط(الاعراف : ١٢٨) ধন ও সম্মান তাঁরই হাতে নিবদ্ধ ; যাকে ইচ্ছা তিনি সম্মানিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা অপদস্ত করেন। وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ ال عمران : ٢٦) পরন্তু দুনিয়ার ইজ্জত, দৌলত, শক্তি, সৌন্দর্য, খ্যাতি ও অন্যান্য অনুগ্রহ সম্পদ কারো বেশী পাওয়া আর কারো কম পাওয়ার ব্যবস্থাটি আল্লাহরই নির্ধারিত। আল্লাহ তাঁর কাজের ঔচিত্য ও যথার্থ নিজেই ভালো জানেন। তাঁর নির্ধারিত ব্যবস্থাকে বদলানোর চেষ্টা করা মানুষের পক্ষে সঙ্গতও নয়, আর তাতে কামিয়াবিরও সম্ভাবনা নেই। وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ج ـ(النحل : ٧١) وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط ـ(النساء : ٣٢)

নৈতিকতার সংশোধন ও কর্মের শৃংখলা

আল্লাহর প্রতি ঈমান থেকে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় সমাজ জীবন। এর দ্বারা সমাজের লোকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়। লোকদের আত্মায় পবিত্রতা এবং কাজ-কর্মে পরহেযগারি সৃষ্টি হয়। লোকদের পারস্পরিক লেন-দেন সুস্থ ও পরিশুদ্ধ হয় ; আইনানুগত্যের চেতনা জাগ্রত হয় ; আজ্ঞানুবর্তিতা ও সংযম-শৃংখলার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং লোকেরা এক প্রচণ্ড অদৃশ্য শক্তি বলে ভেতরে ভেতরে মুক্ত শুদ্ধ হয়ে একটি সৎ ও সংহত সমাজ গঠনের উপযোগী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমানের অলৌকিক ক্ষমতা (মুজেযা), আর এ জন্যেই এটি নির্ধারিত। দুনিয়ার কোন বিচক্ষণ শক্তি, শিক্ষা-দীক্ষা বা ওয়াজ-নসিহত দ্বারা নৈতিকতার সংশোধন ও কর্ম শৃংখলা স্থাপনের কাজ এতো ব্যাপকভাবে এবং এতো গভীর ভিত্তির ওপর সম্পাদিত হতে পারে না। পার্থিব শক্তিনিচয়ের দৌড় আত্মা পর্যন্ত নয়, মাত্র দেহ পর্যন্ত ; আর দেহের ওপরও তার নিয়ন্ত্রণ সর্বত্র ও সর্বক্ষণ নয়। শিক্ষাদীক্ষা ও ওয়াজ-নসিহতের প্রভাবও শুধু বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি পর্যন্ত সীমিত থাকে, আর তাও কতকাংশে। বাকি থাকে দুষ্ট প্রবৃত্তি ; সে শুধু নিজেই তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে না, বরং বিচার-বুদ্ধিকেও পরাভূত ও আচ্ছন্ন করতে ত্রুটি করে না।

ঈমান হচ্ছে এমন জিনিস, যা তার সংস্কারক ও সংগঠক শক্তিনিচয় নিয়ে মানুষের হৃদয় ও আত্মার গভীরতম প্রদেশে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে সে এমন এক শক্তিশালী ও সচেতন বিবেকের উন্মেষ ঘটায়, যা সর্বদা ও সর্বত্র মানুষকে তাকওয়া ও আনুগত্যের সহজ-সরল পথনির্দেশ করতে থাকে। নিতান্ত অসৎ প্রবৃত্তির মধ্যেও তার ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার না করে ছাড়ে না।

এ অভাবনীয় উপকার অর্জিত হয় একমাত্র আল্লাহর কুদরত সম্পর্কিত প্রত্যয় থেকে, যা ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ। কুরআন মজিদের বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে এ বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর জ্ঞান সকল জিনিসের ওপর পরিব্যাপ্ত এবং কোন জিনিসই তার থেকে গোপন থাকতে পারে না।

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ (البقرة : ١١٥)

পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর ; তোমরা যে দিকে মুখ ফিরাবে, সেদিকেই আল্লাহ বর্তমান। নিসন্দেহে আল্লাহ অত্যন্ত প্রশস্ত এবং বিজ্ঞ।

اَيْنَ مَاتَكُوْنُوْا يَاتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ (البقرة : ١٤٨)

"তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, আল্লাহ তোমাদের সবাকেই তলব কেরে নেবেন ; নিসন্দেহে আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।"

اِنَّ اللّٰهَ لَايَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ○ (ال عمران : ٥)

নিসন্দেহে আসমান ও জমিনের কোন জিনিসই আল্লাহর কাছ থেকে গোপন নয়।–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৫)

وَعِنْدَه مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَا اِلَّا هُوْ ط وَيَعْلَمُ مَافِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○ (الانعام : ٥٩)

"তাঁর কাছেই রয়েছে গায়েবের চাবিকাঠি, যার জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কারো কাছে নেই, জলে-স্থলে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। এমন

কি মাটিতে একটি পাতা পড়লেও আল্লাহ্ তা জেনে ফেলেন। আর দুনিয়ার ঘুটঘুটে অন্ধকারে এমন কোন দানা নেই এবং এমন কোন শুষ্ক ও সিক্ত জিনিস নেই, যা এক উজ্জ্বল কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ৫৯)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ج وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ (ق : ١٦)

"আমরাই মানুষকে পয়দা করেছি, এবং আমরা এমন কথাও জানি যার ধারণা তার নফসের ভেতর জাগে। আমরা তার ঘাড়ের শিরার চেয়েও তার বেশী নিকটবর্তী।"–(সূরা কাফ ঃ ১৬)

مَايَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَاكَانُوْا ج -(المجادلة : ٧)

"তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন কানাঘুষা চলে না, যেখানে চতুর্থ আল্লাহ্ না থাকেন, পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে কোন কানাঘুষা চলে না, যেখানে ষষ্ঠ আল্লাহ্ না থাকেন। অনুরূপভাবে, এর চেয়ে কম কি বেশী লোকের মধ্যে কোন সমাবেশ হয় না, যেখানে তাদের সাথে তিনি না থাকেন—তা যেখানেই হোক না কেন।"–(সূরা আল মুজাদিলা ঃ ৭)

يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُوْنَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُوْنَ مَالَا يَرْضٰى مِنَ الْقَوْلِ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا (النساء : ١٠٨)

"তারা লোকদের কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন থাকতে পারে না, আল্লাহ্ তখনো তাদের সাথে থাকেন যখন তাঁর সন্তুষ্টির বিরুদ্ধে রাত্রি বেলায় তারা কথাবার্তা বলে। আর তারা যা কিছু করে, আল্লাহ্ তার ওপর ব্যাপ্তিময়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১০৮)

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (البقرة : ٧٧)

"তারা কি জানে না যে, তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে যা কিছুই করে, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন?"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৭৭)

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ مَايَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ (ق : ١٧-١٨)

"দু'জন নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা প্রত্যেকের ডানে ও বামে বসে নিয়ন্ত্রণ করছে ; মুখ থেকে এমন কোন কথাই বেরোয় না যে, কোন তত্ত্বাবধানকারী তা লিপিবদ্ধ করার জন্যে তৈরী থাকে না।"-(সূরা কাফ ঃ ১৭-১৮)

سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ـ

"তোমাদের মধ্য থেকে কেউ গোপনে কথা বলুক কি উচ্চ স্বরে, কেউ রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকুক আর দিনের আলোয় চলাফেরা করুক তা সামনে ও পিছনে আল্লাহর গুপ্তচর নিযুক্ত রয়েছে, যারা আল্লাহর নির্দেশে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে।"-(সূরা আর রা'দ ঃ ১০-১১)

সেই সাথে একথাও খুব ভালো করে মানব মনে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে যে, একদিন অবশ্যই তাকে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ـ(البقرة : ٢٢٣) وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ـ(البقرة : ٢٠٣) এবং তাকে প্রতিটি জিনিসের হিসেবে দিতে হবে। إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ـ(النساء : ٨٦) আল্লাহ তায়ালার ধরপাকড় অত্যন্ত কঠিন। إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ـ(البروج : ١٢)

এই যে প্রত্যয়টিকে নানাভাবে মানব মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এটিই হচ্ছে ইসলামের গোটা আইন ব্যবস্থার কার্যকরী শক্তি। ইসলাম হারাম-হালালের যে সীমাই নির্ধারণ করে দিয়েছে ; নৈতিকতা, সামাজিকতা ও পারস্পরিক লেনদেন সম্পর্কে যে বিধি-বিধানই দিয়েছে, তার প্রবর্তন আসলে সৈন্য, পুলিশ বা শিক্ষা ও সদুপদেশের ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং তা কার্যকরী শক্তি অর্জন করে এ প্রত্যয় থেকে যে, এর নিয়ামক হচ্ছে এমন এক পরাক্রমশালী শাসনকর্তা যার জ্ঞান ও ক্ষমতা প্রতিটি বস্তুর ওপরই পরিব্যাপ্ত। তাঁর বিধি-নির্দেশ আমান্যকারী না নিজের অপরাধ লুকাতে সমর্থ, আর না তাঁর জিজ্ঞাসাবাদ থেকে কোনরূপ আত্মরক্ষা করতে সক্ষম। এ কারণেই কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বিধি-নির্দেশ উল্লেখের পর এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে যে, এ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত সীমা বিশেষ ; সাবধান ! একে লঙ্ঘন করো না। تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ع (البقرة : ٢٢٩)ـ স্মরণ রেখো, তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ সবই দেখছেন। وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ـ(البقرة : ٢٣٣)

৪. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের উদ্দেশ্য

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর প্রতি ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং তার আবশ্যিক পরিশিষ্ট মাত্র। এর উদ্দেশ্য শুধু ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি স্বীকৃতি দানই নয়, বরং প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বব্যবস্থায় তাদের সঠিক স্থান উপলব্ধি করা, যাতে করে আল্লাহর প্রতি ঈমান খালেছ তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শেরক ও গায়রুল্লাহর ইবাদাতের যাবতীয় মিশ্রণ থেকে তা মুক্ত হয়ে যায়।

পূর্বেই যেমন বলা হয়েছে, ফেরেশতাদের সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা সমস্ত জাতি ও ধর্মের মধ্যেই কোন না কোন রূপে বর্তমান রয়েছে। সেই ধারণার ওপরই বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন রূপ প্রত্যয়ের ইমারত গড়ে তুলেছে। কারো মতে ফেরেশতাগণ প্রকৃতির সন্তান এবং প্রকৃতির এমন সব শক্তি, যারা বিশ্ব-ব্যবস্থার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা পরিচালনা করছে। কারো ধারণায়, তারা দেবতা, যাদের প্রত্যেকেই বিশ্বকারখানার এক একটি বিভাগের প্রধান, যেমন কেউ বাতাসের, কেউ বৃষ্টির, কেউ আলোর এবং কেউ তাপের ও কেউ আগুনের মালিক। কারো বিশ্বাস মতে, তারা আল্লাহর প্রতিনিধি ও মদদগার। কারো দৃষ্টিতে তারা বৈচিত্রের মালিক ; কারো ধারণায়, তারা চেতনা মাত্র ; কারো মতে, তারা আল্লাহর কল্পনা মাত্র। আর কেউবা তাদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে মনে করে।

আবার কেউ তাদের জড় দেহ সত্তায় বিশ্বাসী। কেউ তাদেরকে বিমূর্ত ও অশরীরী বলে গণ্য করেছেন। কেউ তাদেরকে উজ্জ্বল নক্ষত্র ও গতিশীল জ্যোতিষ্কের সাথে একীভূত করে দিয়েছেন। আর কেউবা তাদের সম্পর্কে অন্যরূপ বিস্ময়কর কল্পনা গড়ে তুলেছে। মোটকথা ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে ফেরেশতাদের সম্পর্কে এ ধারণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে যে, তারা কোন না কোনভাবে আল্লাহর খোদায়ীতে শরীকদার। এ জন্যে তাদের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে ; তাদেরকে প্রয়োজন পূরণকারী, অভিযোগ শ্রবণকারী ও সুপারিশকারী আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এই কারণে দুনিয়ায় শেরকের আধিপত্য এতো প্রবল রয়েছে।

বিশ্বব্যবস্থায় ফেরেশতাদের স্থান ঃ কুরআন একদিকে আল্লাহর অস্তিত্ব, গুণরাজি ও কার্যাবলীতে খালেছ ও পূর্ণাঙ্গ তাওহীদকে প্রতিষ্ঠিত করেছে,

অন্যদিকে শেরকের দরজাকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্যে ফেরেশতাদের সম্পর্কে এক সঠিক ও বিশুদ্ধ ধারণা পেশ করেছে। কুরআন ফেরেশতাদের রহস্য সম্পর্কে কোন আলোচনা করেনি ; কারণ এ আলোচনা নিতান্তই অবান্তর, এর ভেতরে কোনই সারবত্তা নেই। মানুষের জন্যে এর ভেতরে না কোন উপকার আছে, আর না মানুষ একে বুঝতে সক্ষম। এ ব্যাপারে আসল বিচার্য বিষয় ছিলো এই যে, বিশ্বব্যবস্থায় ফেরেশতাদের স্থান কি। কুরআন মজীদ এ প্রশ্নের অত্যন্ত সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছে। বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান নয়, তাঁর কাজের অংশীদারও নয়, বরং তাঁর বান্দাহ ও গোলাম মাত্র।

وَقَالُوْا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ط بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ○ لَايَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِاَمْرِهٖ يَعْمَلُوْنَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ○(الانبياء : ٢٦ـ٢٨)

"কাফেররা বললো ঃ দয়াময় কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। পবিত্র সেই সত্তা। তারা (ফেরেশতা) তো তাঁর সম্মানিত বান্দাহ মাত্র, তাঁর সামনে এগিয়ে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। তারা শুধু ততোটুকুই করে, তিনি যা নির্দেশ দেন। যা কিছু তাদের সামনে এবং পিছনে রয়েছে, আল্লাহ তা সবই জানেন। তারা আল্লাহর মনঃপূতজন ছাড়া আর কারো পক্ষে সুপারিশ করতে পারে না।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৬-২৮)

তারা হচ্ছে ব্যবস্থাপক বা কর্মসচিব (النازعات)। অর্থাৎ আল্লাহ তাদের ওপর যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন, তারা শুধু তারই ব্যবস্থাপনা করে থাকে। খোদায়ীর ব্যাপারে অংশীদার হওয়া তো দূরের কথা, তাদের মধ্যে এতটুকু শক্তি পর্যন্ত নেই যার কারণে একটি কেশাগ্রও নড়তে পারে। তাদের কাজ হচ্ছে শুধু বন্দেগী, দাসত্ব ও আনুগত্য করা। তারা এক মুহূর্তের জন্যেও প্রার্থনা ও ওজিফা পাঠ থেকে বিরত হয় না, বরং প্রতিটি মুহূর্তেই নিজ প্রভুর স্তুতি ও পবিত্রতা বর্ণনায় অতিবাহিত করে।

يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ج ـ(الرعد : ١٣)

"বিজলী প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে আর ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে।"–(সূরা আর রা'দ ঃ ১৩)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُوْنَ ○ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ○

"যা কিছু আসমানে রয়েছে এবং যা কিছু জমিনের বুকে বিচরণশীল, সবই আল্লাহর সামনে সেজদায় রত। আর ফেরেশতাগণও বিদ্রোহ বা অবাধ্যচরণ করে না তারা তাদের মহিমান্বিত প্রভুকে ভয় করে চলে এবং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তাই তারা পালন করে।"-(সূরা আন নাহল ঃ ৪৯-৫০)

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ۝ يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ۝(الانبياء : ١٩-٢٠)

"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে এবং যা তাঁর কাছে রয়েছে, সবই তাঁর। তারা (ফেরেশতা) তাঁর বন্দেগীর প্রতি অবাধ্যাচরণ করে না, পরিশ্রান্ত হয় না, বরং দিন-রাত তাঁরই স্তুতিতে মশগুল থাকে এবং কখনো শৈথিল্য প্রদর্শন করে না।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১৯-২০)

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝(التحريم : ٦)

"আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ করেছেন, তারা কখনো তার বিরুদ্ধাচরণ করে না, তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা শুধু তা-ই পালন করে।"

এ ধারণার মধ্যে শেরকের জন্যে কোনই অবকাশ নেই। কারণ যাদের সম্পর্কে খোদায়ীর কল্পনা করা যেত, তারা আমাদেরই মতো বাধ্য ও অনুগত বান্দাহ প্রতিপন্ন হয়েছে। তারপর আমাদের ইবাদাত বন্দেগী, বশ্যতা বাধ্যতা, সাহায্য ভিক্ষা ও নির্ভরতার কেন্দ্রবিন্দু আল্লাহ ছাড়া আর কে হতে পারে?

মানুষ ও ফেরেশতাদের তুলনামূলক মর্যাদা ঃ কেবল এখানেই শেষ নয়। কুরআন মজীদ আরো সামনে এগিয়ে মানুষ ও ফেরেশতাদের তুলনামূলক মর্যাদাও বাতলে দিয়েছে—যাতে করে মানুষ তাদের মুকাবিলায় নিজের মর্যাদাকে ভালো মতো উপলব্ধি করতে পারে। আল্লাহর কালামে যেখানে আদম সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে এ বিষয়টিকেও সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা যখন আদি মানব হযরত আদম (আ)-কে তাঁর খিলাফতের মর্যাদায় ভূষিত করেন, তখন ফেরেশতাদেরকে তাঁর সামনে সিজদা করতে আদেশ দেন, এবং ইবলিস ছাড়া সবাই তাকে সিজদা করে।(বাকারা ঃ ৪ ; আরাফ ঃ ২ ; বনী ইসরাঈল ঃ ৭; কাহাফ ঃ ৭ ; ত্বা-হা ঃ ৭ ; সাদ ঃ ৫) ফেরেশতারা তাদের স্তুতি ও পবিত্রতা কীর্তনের ভিত্তিতে আদম (আ)-এর মুকাবিলায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলো। তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন এবং পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি আদম (আ)-কে তাদের চেয়ে বেশী জ্ঞান দিয়েছেন। ইবলিস তার সৃষ্টির উপাদানকে

শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি আখ্যা দিয়ে হযরত আদম (আ)-এর উচ্চ মর্যাদা স্বীকার করতে এবং তার সামনে সিজদায় নত হতে অস্বীকার করলো। ফলে তাকে চিরকালের জন্যে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত ও পথভ্রষ্ট করে দেয়া হলো।

এ জিনিসটি একদিকে মানুষের ভেতর আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তোলে, অপরদিকে তার সমস্ত ইবাদাত স্পৃহাকে আল্লাহ পরস্তির কেন্দ্রস্থলে এনে জড় করে দেয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিশ্বজগতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া মানুষের চেয়ে আর কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। ফেরেশতারা যদিও সম্মানিত বান্দাহ (عباد مكرمون) অন্যান্য বস্তুনিচয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ; কিন্তু মানুষের সামনে তারাও সিজদায় নত হয়েছে। কাজেই মানুষের বন্দেগী ও সিজদার উপযোগী, তার সাহায্যদানকারী ও প্রার্থনা শ্রবণকারী একমাত্র বিচক্ষণ আল্লাহ ছাড়া আর কে হতে পারে ?

এভাবে ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান নির্ভুল খোদায়ী জ্ঞান ও বিচক্ষণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে আল্লাহর প্রতি ঈমানও একেবারে খালেছ, নির্ভেজাল ও পবিত্র হয়ে ওঠে।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য

কুরআন মজীদে ফেরেশতাদের আরো একটি মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। তাহলো এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মাধ্যমে পয়গম্বরের কাছে তাঁর বাণী ও বিধি-ব্যবস্থা প্রেরণ করেন। এবং এ বাণী যাতে সর্বপ্রকার ভেজাল, সন্দেহ ও আন্দাজ-অনুমান হতে পবিত্র থেকে নবীদের কাছে গিয়ে পৌঁছায় তাদের মাধ্যমেই সে ব্যবস্থা করে থাকেন। এ ফেরেশতাগণ প্রথমত নিজেরাই আজ্ঞানুবর্তী ও সৎ স্বভাব বিশিষ্ট। সর্ববিধ মন্দ প্রবৃত্তি ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। তারা আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং তাঁর নির্দেশের দ্বিধাহীন অনুগত। এ কারণেই তাদের মাধ্যমে যে পয়গাম পাঠানো হয়, তার মধ্যে তারা নিজেরা কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করে না। দ্বিতীয়ত তারা এতখানি শক্তিমান যে, তাদের এ বাণী পৌঁছানো এবং তত্ত্বাবধান কার্যে কোন শয়তানী শক্তি অণু পরিমাণ হস্তক্ষেপও করতে পারে না। এ বিষয়টি কুরআন মজীদেরও বিভিন্ন জায়গায় বিবৃত করা হয়েছে ঃ

فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

"এ এমন সম্মানিত, সমুন্নত ও পবিত্র গ্রন্থে (সহীফা) বিধৃত রয়েছে, যা অত্যন্ত সম্ভ্রমশালী ও পুণ্যবান লেখকদের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে।"

–(সূরা আবাসা ঃ ১৩-১৬)

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ○ذِى قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ○ مُّطَاعٍ ثَمَّ

اَمِيْنٍ○(التكوير : ١٩ـ٢١)

"নিসন্দেহে এ এক সম্মানিত ফেরেশতার বর্ণনা যে অতি শক্তিমান, আরশ অধিপতির কাছেও অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন। অনুগত এবং বিশ্বাসভাজন।"

عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا○ اِلاَّ مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ

يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ○ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ

وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا○

"তিনি (আল্লাহ) অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত। নিজ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না—একমাত্র তাঁর পছন্দনীয় রসূল ছাড়া। অতপর তিনি তাঁর চারদিকে তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা নিযুক্ত করেন—যাতে করে এ প্রতীতি জন্মে যে, বাণী বাহকগণ আপন প্রভুর বাণীসমূহকে যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর পরিব্যাপ্ত এবং প্রতিটি জিনিস গণনা করে থাকেন।"–(সূরা আল জ্বিন ঃ ২৬-২৮)

نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ○(النحل : ١٠٢)

"একে 'রুহুল কুদুস' (পবিত্র আত্মা) তোমার প্রভুর তরফ থেকে যথাযথ-ভাবে নাযিল করেছেন।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১০২)

اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ○(الشعراء : ١٩٢ـ١٩٣)

"নিসন্দেহে এ রাব্বুল আলামীনের অবতীর্ণ কিতাব, যা নিয়ে রুহুল আমীন (বিশ্বস্ত আত্মা) অবতরণ করেছেন।"–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ১৯২-১৯৩)

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ○ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ○ لاَّيَمَسُّهٗ اِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ ○ تَنْزِيْلٌ

مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ○(الواقعه : ٧٧ـ٨٠)

"নিশ্চয়ই এ সম্মানিত কুরআন, একটি গোপন দলিলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। একে পবিত্র (ফেরেশতা) ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।"–(সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৭৭-৮০)

এর থেকে জানা গেল যে, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান শুধু আল্লাহর প্রতি ঈমানের জন্যেই নয়, বরং কিতাবের প্রতি ঈমান এবং রসূলের প্রতি ঈমানের

জন্যেও আবশ্যক। ফল কথা, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার মানেই হলো, যে মাধ্যমটির দ্বারা আল্লাহর বাণী রসূলের কাছে পৌঁছে, তাকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলে আমাদের স্বীকার করতে হবে। সে বাণী এবং তার প্রচারক নবীদের বিশ্বাস পরিপূর্ণই হতে পারে না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ এবং তার নবীদের মধ্যে যোগসূত্র রচনাকারী মাধ্যমটির প্রতি আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করবো।

তৃতীয় উদ্দেশ্য

এছাড়া ফেরেশতাদের আরো একটি মর্যাদা কুরআন মজীদে বিবৃত হয়েছে। তাহলো এই যে, তারা আল্লাহ তায়ালার সাম্রাজ্যের কর্মচারী। গোটা বিশ্ব-প্রকৃতির ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তায়ালা যেসব কর্মচারীর দ্বারা সম্পাদন করাচ্ছেন, তারা হচ্ছে এ ফেরেশতা। দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোতে তাদের কর্মচারীদের (Services) যে মর্যাদা, আল্লাহর সাম্রাজ্যে তাদের মর্যাদা হচ্ছে ঠিক সেরূপ। তাদের মাধ্যমেই তিনি কারো ওপর আযাব নাযিল করেন, আর কারো ওপর করেন রহমত। কারো প্রাণ সংহার করেন, কাউকে জীবন দান করেন। কোথাও বৃষ্টি বর্ষণ করান, কোথাও দুর্ভিক্ষ নামিয়ে দেন। তারা প্রতিটি মানুষের ক্রিয়াকাণ্ড, কথাবার্তা ও ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত রেকর্ড করে চলেছে এবং প্রতিটি তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করছে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর দেয়া অবকাশের মধ্যে কাজ করছে, এসব কর্মচারী তার সমস্ত ভালো-মন্দ বিষয় অবহিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর নির্দেশে তার সাথে সহযোগিতা করতে থাকে। এবং তার সমস্ত কাজই সম্পাদন করে যায়। কিন্তু তার কার্যকাল শেষ হওয়া মাত্র সে খাদেমই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যায়, যে এক মুহূর্ত পূর্ব পর্যন্ত তার খিলাফতের কারখানাটি চালিত করছিলো। যে বাতাসের জোরে একদা মানুষ বেঁচেছিলো, সহসা তাই তার লোকালয়কে বিপর্যস্ত করে দেয়। যে পানির দ্বারা মানুষ জীবন ধারণ করে, হঠাৎ তাই তাকে ডুবিয়ে মারে। যে মাটিতে মানুষ মায়ের কোলের ন্যায় নিশ্চিন্তে বসবাস করে, হঠাৎ তা-ই এক ঝাকুনিতে তাকে ধূলিস্মাৎ করে দেয়। একটি মাত্র নির্দেশের দেরী, সেটি আসার সাথে সাথেই খলিফা সাহেবের নিটকতম আর্দালী তার হাতে অমনি কড়া লাগিয়ে দেয়। এ চিত্রটি কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত সবিস্তারে আঁকা হয়েছে।

এ দৃষ্টিতে ফেরেশতার প্রতি ঈমান হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমানের এক আবশ্যিক অংশ। এর মানে হলো, মানুষকে জগত সম্রাটের সাথে সাথে তার কর্মচারীদের প্রতিও স্বীকৃতি দিতে হবে। এছাড়া মানুষ এ বিশাল সাম্রাজ্যে নিজের মর্যাদাকে (Position), না সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে, আর না সে মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থেকে কাজ করতে পারে।

৫. রসূলের প্রতি ঈমান

নবুওয়াতের তাৎপর্য

তাওহীদের পর ইসলামের দ্বিতীয় মৌল বিশ্বাস হচ্ছে 'নবুওয়াত' (রিসালাত)। যেরূপ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে তাওহীদ হচ্ছে প্রকৃত দ্বীন, তেমনি আনুগত্যের ক্ষেত্রে নবুওয়াত হচ্ছে প্রকৃত দ্বীন। নবুওয়াত (রিসালাত)-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পয়গম্বরি বা বার্তাবাহক। যে ব্যক্তি একজনের বাণী অন্যজনের কাছে নিয়ে পৌছায়, তাকে বলা হয় নবী (রসূল) বা বাণী বাহক। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় নবী বলা হয় তাঁকে, যিনি আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে নিয়ে পৌছান এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে সৎপথে চালিত করেন। এ কারণেই কুরআনে নবী বা রসূলের জন্যে 'পথপ্রদর্শক'(هادى) শব্দটিও ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি শুধু বাণীই পৌছান না, লোকদেরকে সহজ-সরল পথেও চালিত করেন।

আল্লাহ একজন দিশারী তো মানুষের মনের ভেতরই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সে খোদায়ী ইলহামের আলোকে ভালো ও মন্দ চিন্তাধারা এবং ভ্রান্ত ও সঠিক কর্মধারার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে মানুষকে চিন্তা ও কর্মের সরল পথ দেখিয়ে থাকে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝ (الشمس : ٧-١٠)

"মানব প্রকৃতির এবং সেই সত্তার শপথ যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন। পরে তার পাপ ও তার পরহেযগারী তার প্রতি ইলহাম করেছেন। নিসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল এবং ব্যর্থ হলো যেস, যে তাকে দমন করলো।"-(সূরা আশ শামস ঃ ৭-১০)

কিন্তু এ দিশারীর নির্দেশ যেহেতু সুস্পষ্ট নয়, বরং মানুষকে মন্দ কাজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে তার সাথে আরো বহু মানসিক ও বাহ্যিক শক্তিনিচয় জড়িত হয়ে আছে এবং সেহেতু দুনিয়ার অসংখ্য বাঁকা পথের মধ্য থেকে সত্যের সোজা পথ বের করার এবং সে পথে নির্ভয়ে চলার ব্যাপারে ঐ স্বাভাবিক দিশারীর একক নির্দেশ মানুষের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে না। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা বাহির থেকে এ অভাব পূরণ করে দিয়েছেন। এবং মানুষের কাছে তাঁর পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, যাতে করে তাঁরা খোদায়ী জ্ঞান ও

প্রজ্ঞার আলোকে এ অন্তর্নিহিত দিশারীর সাহায্য করতে পারেন। এবং অস্পষ্ট স্বাভাবিক ইলহামের প্রভা অজ্ঞানতা ও বিভ্রান্তিকর শক্তির চাপে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, তাকে উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর সাহায্যে সুস্পষ্ট করে তোলেন।

এটাই হচ্ছে নবুওয়াতের মর্যাদার আসল ভিত্তি। যাঁরা এ মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছেন, তাঁদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা এক অসাধারণ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন। তার সাহায্যে তাঁরা কোন আন্দাজ-অনুমান ও কল্পনার ভিত্তিতে নয়, বরং নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে এমন সব বিষয়ের তাৎপর্য পরিজ্ঞাত হয়েছেন, যে ব্যাপারে সাধারণ লোকেরা মতানৈক্য পোষণ করে থাকে। পরন্তু এ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তারা দুনিয়ার বাঁকা পথগুলোর মধ্য থেকে সত্যের সোজা ও স্বচ্ছ পথটিও নির্ভুলভাবে চিনে নিয়েছেন।

নবী এবং সাধারণ নেতাদের মধ্যে পার্থক্য

বাহ্যিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা সকল যুগেই মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে। এ দাবি কেউ কখনো করেনি যে, মানুষের জন্যে শুধু তার অন্তর্নিহিত দিশারীর নির্দেশই যথেষ্ট। বাপ-দাদা, বংশ-গোত্র ও জাতির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, শিক্ষক পণ্ডিত, ধর্মগুরু, রাজনৈতিক নেতা, সমাজ সংস্কারক এবং এ ধরনের অন্য যেসব লোকের বুদ্ধিমত্তা নির্ভরযোগ্য মনে হতো, তারা হামেশাই দিশারীর মর্যাদা লাভ করতেন এবং তাঁদের অনুসরণও করা হতো। কিন্তু যে জিনিসটি এক নবীকে অন্যান্য নেতাদের ওপর বিশিষ্টতা দান করে, তা হচ্ছে 'খোদায়ী জ্ঞান'। অন্যান্য নেতাদের কাছে খোদায়ী জ্ঞান নেই। তারা শুধু আন্দাজ-অনুমান ও কল্পনার ভিত্তিতেই মত পোষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাদের এ মতামত ও সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রবৃত্তির লালসাও শামিল হয়ে পড়ে। এ কারণেই তারা যে প্রত্যয় ও কানুন তৈরি করেন, তার মধ্যে সত্য ও মিথ্যা উভয়েরই ভেজাল থাকে। তাদের নির্ধারিত পন্থায় কখনো পুরোপুরি সত্য থাকে না। এ নিগূঢ় সত্যের দিকেই কুরআন বরাবর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে ঃ

اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ج (النجم : ٢٣)

"তারা যে বস্তুটির অনুসরণ করে, তা নিছক অনুমান এবং প্রবৃত্তির লালসা বৈ কিছুই নয়।"–(সূরা আন নাজম ঃ ২৩)

وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلاَّ الظَّنَّ ج وَاِنَّ الظَّنَّ لاَيُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (النجم : ٢٨)

"তাদের কাছে কোন সত্যিকার জ্ঞান নেই, তারা শুধু আন্দাজ-অনুমানের পায়রুবি করে চলে। আর অনুমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তা সত্যের প্রয়োজনকে কিছুমাত্র পূরণ করে না।"-(সূরা আন নজম ঃ ২৮)

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ ـ(الروم : ٢٩)

"কিন্তু যালেমরা কোনরূপ জ্ঞান ছাড়াই তাদের প্রবৃত্তির লালসার অনুসরণ করলো।"-(সুরা আর রূম ঃ ২৯)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ۝

ثَانِىَ عِطْفِهٖ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ـ(الحج : ٩-٨)

"লোকদের মধ্যে কেউ এমন আছে যে, অহংকারের সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আল্লাহ সম্পর্কে কোনরূপ জ্ঞান, হেদায়াত ও উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই তর্ক করে, যাতে করে (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে।"-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৮-৯)

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط ـ(القصص : ٥٠)

"তার চেয়ে বড়ো পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহর কাছ থেকে আগত হেদায়াতের পরিবর্তে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো।"

পক্ষান্তরে নবী বা রসূলকে আল্লাহর তরফ থেকে 'জ্ঞান' দান করা হয়। তাঁর নেতৃত্ব অনুমান ও প্রবৃত্তির লালসার দ্বারা চালিত হয় না, বরং তিনি আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের আলোকে যে সোজা পথটি স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট দেখতে পান সেদিকে মানুষকে চালিত করেন। তাই কুরআনে যেখানেই নবীগণকে 'পয়গম্বরির' (রিসালাত) মর্যাদায় অভিষিক্ত করার কথা উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, তাদেরকে 'জ্ঞান' দান করা হয়েছে। উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বারা নবুওয়াতের ঘোষণা করানো হয়েছে নিম্নরূপ ঃ

يٰٓاَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَآءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاْتِكَ فَاتَّبِعْنِىْٓ اَهْدِكَ صِرَاطًا

سَوِيًّا ـ(مريم : ٤٣)

"হে প্রিয় পিতা ! বিশ্বাস করো, আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। সুতরাং তুমি আমার অনুসরণ করো, আমি তোমায় সোজা পথে চালিত করবো।"-(সূরা মরিয়ম ঃ ৪৩)

হযরত লূত (আ)-কে নবুওয়াত দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে ঃ

وَلُوْطًا اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط(الانبياء : ٧٤)

"লূতকে আমরা বিচার শক্তি ও জ্ঞান দান করেছি।"–(সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৪)

হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط(القصص : ١٤)

"তিনি যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হন এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠেন, তখন আমরা তাকে বিচার শক্তি ও জ্ঞান দান করলাম।"–(সূরা কাসাস ঃ ২)

হযরত দাউদ (আ) ও সোলাইমান (আ)-এর নবুওয়াতি প্রাপ্তির কথাও এভাবেই উল্লেখিত হয়েছে ঃ

وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز(الانبياء : ٧٩)

"তাদের প্রত্যেককেই আমরা হেকমত ও জ্ঞান দান করেছি।"

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍo(البقرة : ١٢٠)

"তুমি যদি জ্ঞান লাভের পরও তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে তোমাকে রক্ষাকারী আর কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী থাকবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১২০)

পয়গম্বরির মর্যাদা এবং সাধারণ নেতাদের মুকাবিলায় পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাতের পর এবার পয়গম্বরি সম্পর্কে কুরআনের পেশকৃত নীতিগত বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত।

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও নবীর প্রতি ঈমানের সম্পর্ক

সর্বপ্রথম কথা হলো এই যে, নবীর কাছে যখন এক অসাধারণ জ্ঞানের মাধ্যম রয়েছে এবং আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয়েছে, তখন আল্লাহ সম্পর্কে একমাত্র তাঁর পেশকৃত বিশ্বাসই নির্ভুল হতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা কিংবা অন্যান্য বিজ্ঞানী দার্শনিকদের ভিত্তিতে কোন বিশ্বাস নির্ধারণ করে, তবে আল্লাহ সম্পর্কে তার প্রত্যয় শুধু যে নির্ভুল হবে না তাই নয়, বরং দ্বীনের মৌল বিষয় সংক্রান্ত এবং সাধারণ মানবীয় বিচার-বুদ্ধির সীমা বহির্ভূত অতি প্রাকৃতিক বিষয় সম্পর্কেও কোন যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে না। ফলকথা ঈমান ও প্রত্যয়ের সুষ্ঠুতা নির্ভর করে সম্পূর্ণ রূপে নবীর প্রতি ঈমানের ওপর। এ সম্পর্ক সূত্র ছিন্ন করে চিন্তার পাত্রকে নির্ভুল জ্ঞানের দ্বারা পূর্ণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এ কারণেই

কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় নবীর প্রতি ঈমানের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ○ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ○

"কতো জনপদ তাদের প্রভু এবং তাঁর নবীদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করাতে আমরা তাদের কাছ থেকে কঠিন হিসেব গ্রহণ করেছি। এবং তাদেরকে বড়ো বড়ো শাস্তি দান করেছি, এর দ্বারা তারা নিজেদের কৃতকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেছে। আর শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণাম হয়েছে অমঙ্গলজনক।"
–(সূরা আত ত্বালাক ঃ ৮-৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَيَقُوْلُوْنَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَّنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَّخِذُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا ج وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ○ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اُولٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○ (النساء : ١٥٠-١٥٢)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং রসূলের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং বলে যে, আমরা কাউকে মানবো আর কাউকে অস্বীকার করবো আর তার মধ্য থেকে কোন পথ বের করে নিতে ইচ্ছুক, সে নিশ্চিতভাবে কাফের। আর কাফেরদের জন্যে আমরা এক অপমানকর আযাবের ব্যবস্থা করে রেখেছি। যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি এবং তাদের কারো মধ্যে তারা পার্থক্য সৃষ্টি করেনি, তাদেরকে শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতিফল দান করবেন। আল্লাহ বড়োই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ১৫০-১৫২)

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ط وَسَاءَتْ مَصِيْرًا ○ (النساء : ١١٥)

"যে ব্যক্তি হেদায়াত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার পরও রসূলের সাথে তর্ক করে এবং ঈমানদার লোকদের পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে, তাকে আমরা সেই পথেই

ফিরিয়ে দেবো, যে পথে সে নিজে ফিরে গিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবো ; আর এটা অত্যন্ত খারাপ জায়গা।"

-(সূরা আন নিসা ঃ ১১৫)

এ ধরনের অসংখ্য আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও রসূলের প্রতি ঈমানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীদের অস্বীকার করে এবং তাদের শিক্ষাগ্রহণ করতে চায় না, সে আল্লাহকে মানুক বা না-মানুক, উভয় অবস্থায়ই তার গোমরাহী সমান। কারণ প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ সম্পর্কে যে বিশ্বাস গঠন করা হবে, তা তাওহিদী বিশ্বাস হলেও কদাচ তা নির্ভুল ও নির্ভেজাল হতে পারে না।

কালেমার ঐক্য

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, কেবল নবীর প্রতি ঈমানই গোটা মানব জাতিকে একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। মতানৈক্যের ভিত্তি হচ্ছে আসলে অজ্ঞানতা। লোকেরা কোন জিনিসের তাৎপর্য অবহিত না হলে, নিছক অনুমানের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং তার ফলে স্বভাবতই তাদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হবে। কারণ অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা হচ্ছে অন্ধকারে হাতড়ানোর মতো। কোথাও আলো না থাকলে পঞ্চাশ ব্যক্তি একটি জিনিসকে হাতড়িয়ে দেখে পঞ্চাশ রূপ বিভিন্ন মত প্রকাশ করবে। কিন্তু আলো আসার পর আর কোন মতানৈক্য বাকি থাকবে না, বরং সকল চক্ষুষ্মান ব্যক্তি একই বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছবে। সুতরাং নবীগণকে যখন অলৌকিক জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছে তখন তাদের ধারণা, শিক্ষা ও কর্মপন্থায় মতানৈক্যের সৃষ্টি হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়। এ কারণেই কুরআন বলছে যে, সমস্ত নবীই একই দলভুক্ত ; সবার শিক্ষা ও দ্বীন মূলত একই। একই ছিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে সবাই আহ্বান জানিয়েছেন। আর মু'মিনের জন্যে সবার প্রতি ঈমান আনাই আবশ্যক। যে ব্যক্তি নবীদের মধ্য থেকে কোন একজন নবীকেও অস্বীকার করবে, সে সকল নবীর প্রতি অস্বীকৃতির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। এবং তার অন্তরে ঈমানের চিহ্নমাত্র বাকী থাকবে না। কারণ যে শিক্ষাকে সে অস্বীকার করছে, তা শুধু একজন নবীরই শিক্ষা নয়, বরং তা সমস্ত নবীরই শিক্ষা।

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ط اِنِّى بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ○ وَاِنَّ هٰذِهٖٓ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ○ فَتَقَطَّعُوْٓا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ط كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوْنَ ○ (المؤمنون : ٥١-٥٣)

"(আল্লাহ নবীদের বললেন ঃ) হে নবীগণ ! পবিত্র জিনিস থেকে খাও এবং সৎকাজ করো, তোমরা মূলত একই দলভুক্ত আর আমি তোমাদের প্রভু। সুতরাং তোমরা আমায় ভয় করে চলো। কিন্তু পরবর্তীকালে লোকেরা পরস্পরে মতানৈক্য করে নিজেদের ধর্মকে আলাদা আলাদা করে নিয়েছে। আর এখন অবস্থা এই যে, যাদের কাছে যা রয়েছে তা নিয়েই তারা আনন্দিত।"–(সূরা আল মু'মেনুন ঃ ৫১-৫৩)

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۚ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ ۚ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ○ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا ○

"হে মুহাম্মদ ! আমরা সেভাবে তোমার প্রতি অহী নাযিল করেছি, যেভাবে নূহ এবং তার পরবর্তী নবীদের প্রতি নাযিল করেছিলাম। আর সেভাবে আমরা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইয়াকুব খান্দান, ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুন এবং সোলাইমানের প্রতি অহী প্রেরণ করেছি এবং দাউদকে জবুর দান করেছি। আর আমরাই সেসব নবীকে প্রেরণ করেছি, যাদের কথা ইতিপূর্বে তোমাদের বলেছি এবং সেসব নবীকেও, যাদের কথা তোমাদের বলিনি। আর তোমাদের পূর্বে আল্লাহ তায়ালা মূসার সাথেও কথা বলেছেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৬৩-১৬৪)

এ ধরনের বহু আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত নবী একই সত্য দ্বীনের দিকে লোকদের আহ্বান জানাতে এসেছিলেন এবং প্রত্যেক কওমের কাছেই তারা প্রেরিত হয়েছেন। وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ ۚ ـ(يونس : ٤٧) وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ـ(الرعد : ٧) এদের মধ্যে যেসব নবীর কথা কুরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের প্রতি স্পষ্টভাবে ঈমান আনা আবশ্যক। আর যেসব নবীদের নাম আমাদের বলা হয়নি, তাঁদের সম্পর্কে সঠিক প্রত্যয় হচ্ছে এই যে, তাঁরা সবাই ইসলামেরই আহ্বায়ক ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন জাতি তাদের শিক্ষাকে বদলে দিয়েছে এবং পরস্পরে মতানৈক্য করে নিজেদের জন্যে পৃথক পৃথক ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। আমরা বৌদ্ধ, কৃষ্ণ, জরদশত, কনফুসস প্রমুখকে এ জন্যেই নবী বলতে পারি না যে, তাঁদের সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্টত কিছু উল্লেখ নেই। কিন্তু আমাদের প্রত্যয় হচ্ছে এই যে, ভারত, চীন, জাপান, ইরান, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং অন্যান্য সমস্ত দেশেই আল্লাহর নবীরা এসেছেন

এবং হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর ন্যায় একই ইসলামের দিকে সবাই আহ্বান জানিয়েছেন। সুতরাং আমরা কোন জাতির ধর্মগুরুকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চাই না, বরং ইসলামের ছিরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত ভ্রান্ত মত ও পথ আজ দুনিয়ায় প্রচলিত, আমরা কেবল সেগুলোকেই অস্বীকার করি।

নবীদের সম্পর্কে কুরআনের এ শিক্ষা অতুলনীয়। দুনিয়ার কোন ধর্মেই এরূপ শিক্ষা বর্তমান নেই। কুরআনের সত্যতার এ একটি উজ্জ্বল প্রমাণ। পরন্তু এর মধ্যে মানবজাতির জন্যে এক বিশ্বজনীন ঐক্য এবং এক সুনিশ্চিত মিলনবাণী নিহিত রয়েছে।

নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ

নবুওয়াত বিশ্বাসের অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, শুধু ঈমান ও ইবাদাতের ব্যাপারেই নয়, জীবনের সকল বাস্তব ক্ষেত্রেই আল্লাহর রসূলের আল্লাহর অনুসৃত পন্থার অনুসরণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ যে 'জ্ঞান' ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁদেরকে সম্মানিত করেছিলেন, তা দ্বারা ভ্রান্ত ও যথার্থ পন্থাগুলোর পার্থক্য তাঁরা সুনিশ্চিতভাবেই জানতে পারেন। এ কারণেই তাঁরা যা কিছু বর্জন বা গ্রহণ করতেন এবং যা কিছু নির্দেশ দিতেন, তা সবই করতেন আল্লাহর ইঙ্গিতে। সাধারণ মানুষ বছরের পর বছর, এমন কি যুগের পর যুগ অভিজ্ঞতা লাভ করেও ভ্রান্তি ও যথার্থের পার্থক্য সৃষ্টিতে পুরোপুরি সফলকাম হতে পারতো না, আর কিছুটা সাফল্য অর্জিত হলেও, তা অকাট্য বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতো না, বরং তা নিছক আন্দাজ-অনুমান ও অনুসন্ধানের ওপর নির্ভরশীল হতো এবং তাতে ভ্রান্তির আশংকা অবশ্যই থেকে যেতো। পক্ষান্তরে আল্লাহর নবীগণ জীবনের ক্রিয়া-কাণ্ডে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং যে পথে চলার শিক্ষা দিয়েছেন, তা করেছিলেন 'জ্ঞানের' ভিত্তিতে। এ জন্যেই তাতে ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। আর এ কারণেই কুরআন মজীদ বারবার নবীদের আনুগত্য এবং তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিচ্ছে। তাদের অনুসৃত পন্থাকে শরীয়ত, সোজা পথ ও ছিরাতে মুস্তাকীম বলে অভিহিত করছে। এবং অন্যান্য মানুষের আনুগত্য বর্জন করে কেবল নবীদেরই আনুগত্য করার এবং তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণের তাকিদ করছে। কারণ তাঁদের আনুগত্য হচ্ছে ঠিক আল্লাহরই আনুগত্য এবং তাদের অনুসরণ হচ্ছে খোদায়ী ইচ্ছার অনুসরণ।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ ط -(النساء : ٦٤)

"আমরা যে নবী পাঠিয়েছি, কেবল আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করার জন্যেই পাঠিয়েছি।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৬৪)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ ج -(النساء : ٨٠)

"যে ব্যক্তি নবীর আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।"

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ج فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ (ال عمران : ٣١-٣٢)

"হে মুহাম্মদ ! বলে দাও ঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার আনুগত্য করো। (তাহলে) আল্লাহ তোমাদের ভালো-বাসবেন এবং তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী। (লোকদের) বলো, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করো, এরপরও যদি তারা পাশ কাটিয়ে যায়, তবে নিশ্চিত যেনো, আল্লাহ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১-৩২)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُوْنَ ۝ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَايَعْقِلُوْنَ (الانفال : ٢٠-٢٢)

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, আর তোমরা যখন তাঁর নির্দেশ শুনেছো তখন তাঁর থেকে পাশ কাটিয়ে যেয়ো না। তোমরা এমন লোকদের মতো হয়ো না, যারা বলে যে, 'আমরা শুনেছি' অথচ তারা কিছুই শুনে না। আল্লাহর কাছে তারাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম পশু, যারা কিছুই বোঝে না।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ২০-২২)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ط وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

"কোন বিষয়ে যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল ফায়সালা করে দেন, তখন নিজেদের ব্যাপারে কোন ফায়সালার অধিকার বাকী রাখা কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীর জন্যে জায়েয নয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যতা করলো, সে স্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলো।" -(সূরা আল আহযাব ঃ ৩৬)

فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاءَهُمْ ط وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ط -(القصص : ٥٠)

"অতপর তারা যদি তোমার কথা না মানে, তবে জেনে রেখো, তারা শুধু প্রবৃত্তির লালাসারই অনুসরণ করে চলছে। আর এমন ব্যক্তির চেয়ে অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর নির্দেশ বর্জন করে আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে ?"-(সূরা আল কাসাস ঃ ৫০)

এরূপ আরো অনেক আয়াতে নবীর আনুগত্য ও অনুসরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরন্তু সূরায়ে আহযাবে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, যারা আখেরাতের সাফল্য এবং আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার আশা করে, আল্লাহর রসূলের জীবন হচ্ছে তাদের জন্যে এক অনুকরণযোগ্য আদর্শ।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهُ كَثِيْرًا (الاحزاب : ٢١)

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের জীবনে এক সর্বোত্তম নমুনা বর্তমান ছিল এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি আশাবাদী এবং খুববেশী করে আল্লাহর স্মরণ করে।"-(সূরা আহযাব ঃ ২১)

নবুওয়াত বিশ্বাসের গুরুত্ব

আনুগত্য ও অনুসরণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলীর সাথে নবুওয়াত সম্পর্কিত প্রত্যয় হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির প্রাণ, তার জীবনীশক্তি, তার প্রতিষ্ঠা শক্তি এবং তার বিশিষ্ট প্রকৃতির মূল ভিত্তি।

প্রত্যেক সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থায় তিনটি জিনিস মূলভিত্তির কাজ করে। প্রথমত, চিন্তা পদ্ধতি ; দ্বিতীয়ত, নৈতিক বিধান এবং তৃতীয়ত, সমাজ বিধান। দুনিয়ার সকল সংস্কৃতিতে এ তিনটি জিনিস তিনটি ভিন্ন উপায়ে সংগৃহীত হয়। চিন্তা পদ্ধতি আহৃত হয় এমন সব চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞানীদের শিক্ষা থেকে, যারা কোন না কোন কারণে বড়ো বড়ো মানব গোষ্ঠীর মানসিকতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে বসেছেন। নৈতিক বিধান গ্রহণ করা হয় এমন সব রাষ্ট্রনায়ক, সংস্কারক ও ধর্ম নেতার কাছ থেকে, যাঁরা বিভিন্ন যুগে বিশেষ বিশেষ জাতির ওপর কর্তৃত্ব লাভ করেছেন। আর সমাজ বিধান প্রণয়ন করে থাকেন এমন লোকেরা, জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে যাদের দক্ষতা ও নৈপুণ্যের ওপর নির্ভর করা হয়। এভাবে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাতে অনিবার্যরূপে তিনটি মৌল ত্রুটি লক্ষ্য করা যায় ঃ

এক ঃ এ তিনটি ভিন্ন উপায় থেকে যে উপকরণ সংগৃহীত হয়, তা দ্বারা এমন এক বিচিত্রধর্মী মিক্‌চার তৈরী হয়, যার মেজায প্রতিষ্ঠায় হয়তো বা

শতাব্দীকাল চলে যায়। তথাপি তার ভেতরে বহু অসংলগ্নতা, অসমতা ও অসামঞ্জস্যতা বাকি থেকে যায়। দুনিয়ায় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অসংখ্য। সবারই চিন্তা পদ্ধতি পৃথক পৃথক এবং পরস্পর থেকে মূলতই ভিন্ন। সাধারণত মানব জীবনের বাস্তব সমস্যাবলীর সাথে এদের কোনরূপ নিবিড় সম্পর্ক থাকে না, বরং এদের অধিকাংশই মানুষের প্রতি বিতৃষ্ণতার কারণে প্রসিদ্ধ। এহেন উৎস থেকে দুনিয়ার মানুষ তাদের চিন্তা পদ্ধতি আহরণ করে। দ্বিতীয় উপকরণ যে দলটির কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাদের মধ্যেও ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, চিন্তাধারা ও মানসিকতার দিক থেকে প্রচুর মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। এ দলটির মধ্যে যদি কোন বিষয়ে ঐক্য থাকে, তবে তা হচ্ছে এই যে, এর প্রতিটি ব্যক্তিই কল্পনার জগতের অধিবাসী এবং অতিরিক্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রবণতার অনুসারী। নিরেট বাস্তব সমস্যাবলীর সাথে এদের সম্পর্ক খুবই কম। আর তৃতীয় উপাদানটির উৎসও পরস্পর বিভিন্ন, অবশ্য তাদের মধ্যে একটি বিষয় ঐক্য রয়েছে, তাহলো এই যে, তাদের ভেতর কোমল অনুভূতি খুবই কম। অতিরিক্ত বাস্তব বাদিতা তাদেরকে নিঠুর ও নিরস বানিয়ে দিয়েছে। স্পষ্টত এরূপ বিচিত্র ও পরস্পর বিরোধী উপকরণাদির সঠিক ও সুসম মিশ্রণ খুবই কঠিন ব্যাপার, বরং তাদের অনৈক্য ও বৈপরিত্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল না করে কিছুতেই পারে না।

দুই ঃ এ উপায়গুলো থেকে যে তিনটি উপাদান অর্জিত হয়, তাতে যেমন স্থায়িত্বের শক্তি নেই, তেমনি নেই ব্যাপকতার যোগ্যতা। বিভিন্ন জাতির ওপর বিভিন্ন চিন্তানায়ক, রাষ্ট্রনেতা ও আইন বেত্তা প্রভাব বিস্তার করে থাকেন এবং তার ফলে তাদের চিন্তা পদ্ধতি, নৈতিক বিধান ও সমাজ বিধানে নীতিগত পার্থক্য সূচিত হয়। পরন্তু একটি জাতির ওপরও প্রথম যুগে যেসব বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, রাষ্ট্রনায়ক ও আইন বেত্তা প্রভাব বিস্তার করেন, পরবর্তী যুগগুলোতে তাঁদের প্রভাব বজায় থাকে না, বরং যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব প্রভাব বিস্তারকারী এবং তাঁদের প্রভাবও বদলে যেতে থাকে। এভাবে সংস্কৃতিগুলো এক দিকে জাতীয় রূপ ধারণ করে এবং সেগুলোর বিরোধের ফলে জাতিসমূহের মধ্যে এমন বিরোধের আগুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, যা প্রকৃতপক্ষে শান্তির তৃণরাশিতে অগ্নি সংযোগকারী বিদ্যুৎ শলাকা তুল্য। অন্যদিকে প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র তাহজিব ও তমদ্দুন স্থায়ীভাবে এক টলটলয়মান অবস্থার মধ্যে থাকে এবং একটি সুনির্দিষ্ট পথে বিকাশ লাভ করার পরিবর্তে হামেশা তার মধ্যে মৌল পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। আর সে পরিবর্তন কখনো বিবর্তনের দিকে, কখনো বিপ্লবের দিকে গতিশীল হয়।

তিন ঃ উপাদানত্রয়ের উল্লেখিত উৎসগুলোর মধ্যে কোন একটিতেও পবিত্রতার চিহ্নমাত্র থাকে না। জাতি তার চিন্তানায়কদের কাছ থেকে যে

চিন্তাপদ্ধতি, দিশারীদের কাছ থেকে যে নৈতিক বিধান এবং আইন বেত্তাদের কাছ থেকে যে সমাজ বিধান লাভ করে, তা সবই হচ্ছে মানবীয় প্রচেষ্টার ফল। আর এ মানবীয় প্রচেষ্টার ফল হওয়া সম্পর্কে এর অনুসারীরাও পুরোপুরি সচেতন থাকে। এর অনিবার্য ফল হচ্ছে এই যে, অনুসরণ কখনো পূর্ণত্ব লাভ করে না। অনুসারীরা তাদের অনুসরণের চরম অবস্থায়ও ঈমানী ভাবধারায় পরিপ্লুত হতে পারে না। তারা নিজেরাই উপলব্ধি করে যে, তাদের সংস্কৃতির মৌল উপাদানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা এবং সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পরন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাও তা ভ্রান্তিগুলো স্বপ্রমাণ করতে থাকে। তার ফলে স্বভাবতই সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এভাবে কোন চিন্তাপদ্ধতি বা আইনশাস্ত্র কখনো জাতির ওপর নিজের পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে এবং সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীল করে তোলার অবকাশ পায় না।

পক্ষান্তরে নবীর প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে যে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তা উল্লেখিত তিনটি বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে থাকে।

প্রথমত, তাতে সংস্কৃতির তিনটি উপকরণ একই উৎস থেকে আহৃত হয়। একই ব্যক্তি চিন্তাপদ্ধতি নির্ধারণ করেন, নৈতিক বিধান নিরূপণ করেন এবং সমাজ বিধানের নীতিও প্রণয়ন করেন। তিনি যুগপৎ চিন্তার জগত, নৈতিক জগত ও কর্ম জগতের দিশারী। তিন জগতের সমস্যাবলীর ওপরই তাঁর দৃষ্টি সমান প্রসারিত। তাঁর মধ্যে সহনশীলতা, কোমল অনুভূতি এবং কর্মনৈপুণ্য এ তিনটি উপাদানের এক সুষম সমন্বয় ঘটে এবং প্রতিটি উপাদানের সঙ্গত পরিমাণ নিয়ে তিনি সংস্কৃতির বটিকায় এমনভাবে শামিল করে দেন যে, কোন অংশেই কম-বেশী হয় না। অংশগুলোর মধ্যে কোন অসংলগ্নতা ও অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয় না। বরং বটিকার মেজায প্রকৃতি ইপ্সিত মানের সুসম ও সুসঙ্গত হয়ে ওঠে। এ বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে মানবীয় শক্তি সামর্থের ঊর্ধে। কিন্তু প্রভুর হেদায়াত ছাড়া এটি সম্পাদন করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়ত, এর কোন উপাদানই জাতিগত বা কালগত হয় না। আল্লাহর নবী যে চিন্তাপদ্ধতি, নৈতিক বিধি ও সমাজ বিধান নির্ধারণ করে দেন, তা জাতিগত প্রবণতা বা কালগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তা সত্য ও সততার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আর সত্য ও সততা হচ্ছে এমন জিনিস, যা প্রাচ্য পাশ্চাত্য, কালো-সাদা, অনার্য-আর্য ও প্রাচীন-আধুনিকের সকল সীমারেখা থেকে ঊর্ধে। যে জিনিসটি সত্য এবং সত্যাশ্রয়ী তা দুনিয়ার প্রত্যেক কোণ, প্রত্যেক জাতি এবং সময় ও কালের প্রত্যেক আবর্তনেই একইরূপ সত্য ও সত্যাশ্রয়ী। সূর্য জাপানেও যেমন সূর্য, জিব্রালটারেও তেমনি সূর্য। হাজার বছর পূর্বে সূর্য যেমন ছিল হাজার বছর পরেও ঠিক তেমনি থাকবে। সুতরাং কোন

সংস্কৃতি বিশ্বজনীন, মানবিক এবং স্থায়ী সংস্কৃতি হতে পারলে তা একমাত্র আল্লাহর রসূলের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতিই হতে পারে। কারণ আপন মূলনীতি ও মৌল ভিত্তি অপরিবর্তিত রেখে প্রত্যেক দেশ, জাতি ও যুগের উপযোগী হবার মতো যোগ্যতা কেবল এর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে।

তৃতীয়ত, এ সংস্কৃতি পূর্ণ পবিত্রতার মর্যাদা অধিকার করে আছে। এর অনুসারীগণ এ প্রত্যয় বরং ঈমান পোষণ করে যে, এ সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আল্লাহর নবী। তাঁর কাছে রয়েছে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান। তাঁর জ্ঞানের মধ্যে সংশয় বা দ্বিধার লেশ মাত্রও নেই। (لَارَيْبَ فِيْهِ) তাঁর কথাবার্তায় না আন্দাজ-অনুমানের স্থান আছে, আর না আছে প্রবৃত্তির তাড়না। তিনি যা কিছুই পেশ করেন, আল্লাহর পক্ষ থেকেই করেন। তাঁর পদস্খলন ঘটার কিংবা ভ্রান্ত পথে চালিত হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى - عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى -(النجم : ٢-٥) "তোমাদের সংগী না পথভ্রষ্ট হয়েছে না বিভ্রান্ত। সে নিজের ইচ্ছায় বলে না। এটাতো একটা অহী যা তার প্রতি নাযিল করা হয়। তাকে মহাশক্তিধর শিক্ষা দিয়েছেন।"–(সূরা আন নাজম ঃ ২-৫) এরূপ ঈমান ও প্রত্যয় যখন নবীর অনুগামীদের শিরা-উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়, তখন তারা পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে নবীর অনুবর্তন করতে থাকে। তার অন্তরে কোন সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্থান থাকে না। তার অন্তরে কখনো এরূপ আশংকা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে না যে, এ পন্থাটি হয়তো নির্ভুল নয় বরং অপর কোন পন্থা সত্যাশ্রয়ী কিংবা অন্তত এর চেয়ে উত্তম। স্পষ্টত এরূপ সংস্কৃতিই হবে ইপ্সিত মানের মযবুত। এর অনুসরণ হবে নিতান্তই মযবুত। এর মধ্যে দুনিয়ার অন্যান্য সংস্কৃতির চেয়ে বেশী শৃংখলাবোধ (Discipline) পরিলক্ষিত হবে। এর চিন্তা পদ্ধতি, নৈতিক বিধি ও সমাজ বিধানে বেশী সংহতি, ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা কায়েম হবে।

বস্তুত আল্লাহর নবীগণ ছিলেন এ সংস্কৃতিরই নির্মাতা। শত শত বছর ধরে এঁরা দুনিয়ার প্রত্যেক অংশে এর জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন। ক্ষেত্র যখন পুরোপুরি তৈরী হলো, তখন শেষ নবী মুহাম্মদ (সা) এসে এর জন্যে পূর্ণাঙ্গ ইমারত গড়ে তুললেন।

নবুওয়াতে মুহাম্মদীর বিশিষ্ট প্রকৃতি

এ পর্যন্ত যা কিছু বিবৃত হয়েছে তা ছিলো নবুওয়াত সংক্রান্ত সাধারণ বিধি ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তা ছাড়াও কয়েকটি বিষয় রয়েছে, যা বিশেষভাবে নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (সা)-এর সাথে সম্পৃক্ত। একথা নিসন্দেহ যে, নবুওয়াতের মর্যাদার দিক থেকে মুহাম্মাদ (সা) এবং অন্যান্য নবীদের মধ্যে মূলত কোন পার্থক্য নেই। কারণ, কুরআন মজীদের স্পষ্ট ঘোষণা এই যে, لَانُفَرِّقُ بَيْنَ

(البقرة : ٢٨٥) اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ـ নবীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বৈধ নয়। সুতরাং নীতিগতভাবে সমস্ত নবীর বেলায়ই একথা প্রযোজ্য যে, তাঁরা সবাই আল্লাহর তরফ থেকে প্রেরিত। সবাইকে 'প্রজ্ঞা' এবং 'জ্ঞান' দান করা হয়েছে। সবাই একই ছিরাতুল মুস্তাকীমের দিকে আহ্বানকারী। সবাই মানব জাতির জন্যে দিশারী ও পথপ্রদর্শক। সবারই আনুগত্য ফরয এবং সবার জীবন চরিতই মানবজাতির জন্যে অনুকরণযোগ্য আদর্শ। কিন্তু কার্যত আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি ব্যাপারে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে অন্যান্য নবীদের মুকাবিলায় একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র দান করেছেন। এ স্বাতন্ত্র নিছক কোন মামুলী ও হালকা ব্যাপার নয় যে, এর প্রতি লক্ষ্য রাখা বা না রাখার কারণে কোন ফলোদয় হবে না বরং প্রকৃতপক্ষে ইসলামের সমগ্র ব্যবস্থায় এর একটি মৌল গুরুত্ব রয়েছে। আর কার্যত ইসলামের সকল প্রত্যয় ও কানুনের ভিত্তি নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর এ বিশিষ্ট মর্যাদার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই নবুওয়াত সম্পর্কে কারো ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিশুদ্ধ হতে পারে না, যতক্ষণ না সে এ বিশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনবে।

পূর্ববর্তী নবুওয়াত ও নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর পার্থক্য

এ জিনিসটি অনুধাবন করার জন্যে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার।

এক ঃ কুরআনী ইঙ্গিত, প্রাচীন ইতিহাস এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমান থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবীদের সংখ্যা কয়েক সহস্রাধিক হওয়াই উচিত। কুরআন বলছে ঃ (فاطر : ٢٤) وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ـ "এমন কোন জাতি ছিল না, যার কাছে কোন সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।" আর একথা সুস্পষ্ট যে, দুনিয়ার এতো বিপুল সংখ্যক মানব গোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আমাদের ইতিহাস তার না হদিস দিতে পেরেছে আর না দিতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক জাতির জন্যে যদি একজন নবীও এসে থাকেন, তবু নবীদের সংখ্যা সহস্রের সীমা অতিক্রম করে যাওয়াই উচিত। কোন কোন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে নবীদের সংখ্যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এ বিপুল সংখ্যার মধ্যে কুরআন মজীদে যে সকল নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে, তাঁদের সংখ্যা অঙ্গুলি দ্বারাই গণনা করা চলে। এঁদের সাথে যদি আমরা সেসব ধর্মগুরুর নামও শামিল করে নেই, যাদের নবুওয়াত সম্পর্কে কুরআন মজীদে কোন ইংগিত নেই, তবু এ সংখ্যা দশকের সীমা অতিক্রম করে না। এভাবে অসংখ্য নবীর নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে যাওয়া এবং তাদের শিক্ষার নিদর্শনাদি বিলুপ্ত হওয়ায় একথাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের আগমন ঘটেছিল বিশেষ বিশেষ যুগ এবং বিশেষ জাতির জন্যে। তাঁদের কাছে এমন

কোন জিনিস্ ছিলো না, যা স্থিতি ও স্থায়িত্ব দান করতে এবং বিশ্বজনীন ব্যাপ্তি দান করতে পারে।

দুই ঃ পরন্তু যে সকল নবী ও ধর্মগুরুর নাম আমরা জানি, তাঁদের জীবনী ও শিক্ষা ধারার ওপর কল্প-কাহিনী ও বিকৃতির এতো আবরণ পড়ে আছে যে, তাঁদের সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার কোন তুলনাই নেই। তাঁদের যেসব নিদর্শন বর্তমানে দুনিয়ায় বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর প্রতি কাল্পনিক বিশ্বাস পরিহার করে নিছক ঐতিহাসিক মানদণ্ডে যাচাই করে দেখলেই আপনাকে স্বীকার করতে হবে যে, তার কোন একটি জিনিসের ওপরও নির্ভর করা চলে না। আমরা তাঁদের প্রকৃত জীবন-কাল পর্যন্ত নির্দেশ করতে পারি না। তাঁদের প্রকৃত নাম পর্যন্ত আমরা অবহিত নই। তাঁরা বাস্তবিকই দুনিয়ায় বর্তমান ছিলেন কিনা, এটাও আমরা চূড়ান্তভাবে বলতে পারি না। বুদ্ধ, জারদশত এবং ঈসার ন্যায় মশহুর ব্যক্তিরা ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন, না নিছক কল্পনার মানুষ ছিলেন, ঐতিহাসিকরা সে সম্পর্কেও সন্দেহ করেছেন। পরন্তু তাঁদের জীবন চরিত সম্পর্কে আমাদের যা কিছু জানা আছে, তা এতোই সংক্ষিপ্ত এবং অস্পষ্ট যে, তাকে জীবনের কোন একটি বিভাগেও তাদেরকে অনুকরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা চলে না। তাঁদের প্রচারিত শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থাও প্রায় এরূপ। যে সকল গ্রন্থ ও শিক্ষা-দীক্ষা তাঁদের নামে প্রচলিত, তার কোন একটির প্রামাণিকতাও তাঁদের পর্যন্ত পৌঁছে না। বরং আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক এ উভয় দিক দিয়েই এমন বলিষ্ঠ প্রমাণাদি বর্তমান রয়েছে, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ সকল গ্রন্থ ও শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ও রদবদল হয়েছে। এর থেকে সত্যই প্রতিভাত হয় যে, মুহাম্মদ (সা)-এর পূর্বে যত নবী ও ধর্মগুরু অতিক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের নবুওয়াত ও ধর্মীয় নেতৃত্ব খতম হয়ে গিয়েছে।

তিন ঃ প্রায় সকল নবী ও ধর্মগুরু সম্পর্কেই একথা সপ্রমাণিত যে, তাঁরা যে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে আগমন করেছিলেন, তাঁদের শিক্ষা ছিলো ঠিক সেইসব জাতির জন্যেই নির্দিষ্ট। তাদের কেউ কেউ নিজেরাই একথা প্রকাশ করেছেন আর কারো কারো সম্পর্কে ঘটনাপ্রবাহই এটা প্রমাণ করে দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) কন্‌ফিউশাস, জারদশত এবং কৃষ্ণের শিক্ষা কখনো তাঁদের স্বজাতির সীমা অতিক্রম করেনি। সেমেটিক এবং আর্যজাতিগুলোর অন্যান্য নবী ও ধর্মগুরুর অবস্থাও একই রূপ। অবশ্য বুদ্ধ এবং ঈসার অনুসারীগণ তাঁদের শিক্ষাকে অন্যান্য জাতির কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। কিন্তু তাঁরা নিজেরা কখনো না এর জন্যে চেষ্টা করেছেন, আর না কখনো এ দাবী করেছেন যে, তাঁদের বাণী সমগ্র বিশ্বের জন্যে। বরং ঈসা (আ) থেকে খোদ ইঞ্জিলেই একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি শুধু বনী ইসরাঈলদের হেদায়াতের জন্যেই দুনিয়ায় এসেছিলেন।

চার ঃ সমস্ত নবী ও ধর্মগুরুদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ (সা)-ই এমন পুরুষ, যাঁর জীবন চরিত ও শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে আমাদের কাছে নির্ভুল প্রামাণ্য এবং সুনিশ্চিত তথ্যাবলী বর্তমান রয়েছে এবং সে সবের সত্যতার সন্দেহের কোন অবকাশ মাত্র নেই। তাই কোনরূপ প্রতিবাদের ভয় না করেই বলা হয় যে, দুনিয়ার কোন ঐতিহাসিক পুরুষ সম্পর্কেই আজ এতো নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ভাণ্ডার বর্তমান নেই। এমন কি কোন সন্দিগ্ধ ব্যক্তি যদি তার সততায় সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে সমস্ত দুনিয়ার ইতিহাস ভাণ্ডারকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে হবে। কারণ এতো বড়ো প্রামাণ্য ভাণ্ডারের সত্যতায় সন্দেহ পোষণের পর এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ইতিহাসের সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যার একটি স্তুপ মাত্র এবং তার একটি বর্ণের ওপর নির্ভর করা চলে না।

পাঁচ ঃ এভাবে সমস্ত নবী ও ধর্মগুরুর মধ্যে কেবল মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবনধারা ও জীবন বৃত্তান্তই আমাদের সামনে সবিস্তারে বর্তমান রয়েছে। কেবল জাতিসমূহের ধর্মগুরুদের মধ্যেই নয়, বরং দুনিয়ার সমস্ত ঐতিহাসিক পুরুষের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) ছাড়া এমন আর কোন পুরুষ নেই, যার জীবন চরিতের এতো খুঁটিনাটি বিষয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুরক্ষিত রয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জামানা এবং বর্তমান যুগের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকলে তা হচ্ছে এই যে, সে যুগে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর দৈহিক সত্তা বর্তমান ছিলো আর আজ তা নেই। কিন্তু জীবনের সাথে যদি দৈহিক অস্তিত্বের শর্ত আরোপ করা না হয়, তবে আমরা বলতে পারি যে, হযরত (সা) আজো বেঁচে আছেন এবং যতদিন দুনিয়ায় তাঁর জীবন চরিত থাকবে, ততদিনই তিনি বেঁচে থাকবেন। হাদীস ও জীবনী গ্রন্থাবলীতে দুনিয়ার মানুষ আজো হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জীবনকে ততোটা নিকট থেকেই দেখতে পারে, যতোটা নিকট থেকে তার সমকালীন লোকেরা দেখতে পারতো। কাজেই এটা সম্পূর্ণ সঙ্গত-ভাবেই বলা যেতে পারে যে, নবীগণ এবং অন্যান্য ধর্মগুরুদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ (সা)-এরই যথার্থ এবং পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করা সম্ভব।

ছয় ঃ হযরত (সা)-এর শিক্ষা সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নবীগণ এবং ধর্মগুরুদের এমন কেউ নেই, যার আনীত ধর্মগ্রন্থ ও প্রচারিত শিক্ষা আজো নির্ভুল আকারে বর্তমান রয়েছে এবং বিশ্বাস্য ও নির্ভরযোগ্য পন্থায় নিজস্ব বাহক ও প্রচারকের সাথে তার যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে। এ সৌভাগ্যের অধিকারী হচ্ছেন একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সা)। তাঁর আনীত গ্রন্থ কুরআন অবিকল সেই ভাষায়ই বর্তমান রয়েছে, যে ভাষায় হযরত (সা) তাকে পেশ করেছিলেন। আর কুরআন ছাড়াও তিনি নিজস্ব ভাষায়

যেসব হেদায়াত দিয়েছিলেন, তাও প্রায় নির্ভুল আকারেই সুরক্ষিত রয়েছে। এবং ইনশাআল্লাহ চিরকালই সুরক্ষিত থাকবে। কাজেই নবী ও ধর্মগুরুদের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষার অনুসরণ নিশ্চিত ও সংশয়াতীতভাবে করা যেতে পারে।

সাত ঃ অতীতকালে নবী ও ধর্মগুরুদের শিক্ষা ও জীবনী সম্পর্কে যে তথ্য ভাণ্ডার বর্তমান দুনিয়ায় বিদ্যমান, সে সবের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সেখানে সত্য ও সততা, কল্যাণ ও মঙ্গল, সচ্চরিত্র এবং সদাচরণের যত পবিত্র দৃষ্টান্তই আপনি পাবেন, তার প্রতিটি জিনিসই আপনি মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষা ও জীবনীতে পাবেন। এরূপে তাঁর পরে মানব সমাজে যত নেতার আবির্ভাব হয়েছে, তাদের শিক্ষা এবং জীবনীতেও আপনি এমন কোন সত্য, সততা এবং পুণ্য ও মঙ্গল খুঁজে পাবেন না, যা মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষা ও জীবন চরিতে বর্তমান নেই। পরন্তু হযরত (সা)-এর শিক্ষা ও জীবনীতে সত্য জ্ঞান, সৎ-কর্মশীলতা এবং সুনীতির এমন আর একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার খুঁজে পাওয়া যাবে না, যা দুনিয়ার কোন অতীত ও বর্তমান ধর্মগুরুর শিক্ষা ও জীবনীতে পাওয়া যাবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো এই যে, খোদায়ী জ্ঞান, নৈতিক চরিত্র এবং পার্থিব আচরণ সম্পর্কে ইসলামের বাইরে থেকে কোন নির্ভুল কথা মানুষ চিন্তাই করতে পারে না। কাজেই এ সত্য অনস্বীকার্য যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষা ও জীবন চরিত হচ্ছে সমস্ত মঙ্গলের সমষ্টি। 'সত্য' বলে যা কিছু ছিলো, তা মুহাম্মাদ (সা) প্রকাশ করে দিয়েছেন, সোজা পথ যাকে বলা হতো, তা তিনি উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দিক থেকে মানুষের নৈতিক চরিত্র ও আচার-ব্যবহারকে সুস্থ রাখার জন্যে এবং দুনিয়ায় সঠিকভাবে জীবন যাপন করার জন্যে যতো সুনীতি ও সুনিয়ম হতে পারতো, তা সবই তিনি স্পষ্টভাবে পেশ করে দিয়েছেন। এখন আর তাতে সংযোজন ও পরিবর্ধনের কোনই অবকাশ নেই।

আট ঃ নবী ও ধর্মগুরুদের গোটা দলের মধ্যে একমাত্র মুহাম্মাদ (সা)-ই দাবী করেছেন যে, তাঁর দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্যে আর কার্যতও তিনি নিজের জীবদ্দশায়ই বিভিন্ন দেশের রাজরাজড়াদের কাছে আমন্ত্রণ লিপি পাঠিয়েছেন এবং তাঁর দাওয়াত পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে এবং মানব জাতির প্রত্যেক গোষ্ঠীর কাছে পৌছেছে। এ বিশেষত্ব একমাত্র হযরত (সা) ছাড়া আর কেউ অর্জন করতে পারেনি। কেউ কেউ তো বিশ্বজনীনতার দাবীও করেনি আর তাঁরা বিশ্বজনীন মর্যাদাও লাভ করেনি। আর কারো কারো ধর্ম বিশ্বজনীন মর্যাদা লাভ করেছে বটে ; কিন্তু তাঁরা নিজেরা কখনো সেরূপ দাবীও করেনি আর তার জন্যে চেষ্টাও করেনি। বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (সা) হচ্ছেন একমাত্র

ব্যক্তি, যিনি বিশ্বজনীনতার দাবীও করেছেন, তার জন্যে চেষ্টাও করেছেন এবং কার্যত বিশ্বজনীনতা লাভও করেছেন।

নয় ঃ দুনিয়ায় নবীদের আগমনের তিনটি মাত্র কারণই থাকতে পারে। প্রথমত, কোন জাতির হেদায়াতের জন্যে পূর্বে কোন নবী আসেনি এবং لكل قوم هاد অনুযায়ী তার জন্যে এক বা একাধিক নবীর প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পূর্বে কোন নবী এসেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর নবুওয়াতের লক্ষণাদি বিলীন হয়ে গেছে; তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর আনীত কিতাব বিকৃত হয়ে গেছে ; তাঁর জীবন সংক্রান্ত নিদর্শনাদি মুছে গেছে এবং লোকদের পক্ষে তাঁর উত্তম আদর্শের অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তৃতীয়ত, পূর্ববর্তী নবী বা নবীদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ বিধায় তাতে অধিকতর সংযোজন ও পরিবর্ধনের আবশ্যক। এ তিনটি কারণ ছাড়া নবীদের আগমনের আর কোন চতুর্থ কারণ নেই, আর বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতে থাকতেও পারে না।[১] কোন জাতির জন্যে নবীও এসেছেন, তাঁর শিক্ষা এবং জীবনী নির্ভুল আকারে সুরক্ষিতও রয়েছে, তাতে কোন সংযোজন-পরিবর্ধনেরও প্রয়োজন নেই, আর তা সত্ত্বেও তারপর কোন দ্বিতীয় নবী পাঠিয়ে দেয়া হবে —এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। নবুওয়াতের পদটি নিছক কোন মর্যাদার ব্যাপর নয় যে, তা কোন সৎকাজের বিনিময়ে পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে। বরং এ হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের খেদমত, যা এক সুনির্দিষ্ট কাজের জন্যে প্রয়োজন মতো কারো ওপর ন্যস্ত করা হয়। উপরন্তু এ পদটি এতো ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ ধরনেরও নয় যে, কোন বিগত শিক্ষার প্রতি নিছক দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যেই কাউকে এটি অর্পণ করা হয়। এ কাজের জন্যে তো সত্যাশ্রয়ী আলেম এবং মুজাদ্দিদগণ-ই যথেষ্ট। কাজেই বিচার-বুদ্ধি চূড়ান্তভাবে এ দাবীই করছে যে, উল্লেখিত কারণত্রয়ের মধ্যে কোন একটি কারণ না ঘটা পর্যন্ত কোন নবী আসতে পারে না। আর আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (সা)-এর সাথে এ তিনটি কারণই বিদূরিত হয়ে গেছে। তাঁর দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির জন্যে, সুতরাং এখন বিভিন্ন জাতির জন্যে পৃথক পৃথক নবী আসার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর আনীত কিতাব এবং তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শন সম্পূর্ণ নির্ভুল আকারেই সুরক্ষিত রয়েছে; কোন নতুন কিতাব বা হেদায়াত আসারও প্রয়োজন নেই। তার শিক্ষা ও হেদায়াত পূর্ণাঙ্গ এবং সম্পূর্ণ। এ ক্ষেত্রে না সত্যজ্ঞানের মধ্য থেকে কিছু গোপন রয়ে গেছে, আর না সৎকাজের জন্যে হেদায়াত ও অনুকরণযোগ্য পেশ করার

১. একটি কারণ অবশ্য এ হতে পারে যে, একজন নবীর সাহায্যের জন্যে তাঁর সাথে অপর একজন নবী প্রেরণের প্রয়োজন হয়েছে। এ রকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত কুরআনেও পাওয়া যায়। কিন্তু এটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কারণ মদদগার নবীর নবুওয়াত সেই নবুওয়াতেরই পরিশিষ্ট মাত্র, যার সাহায্যার্থে তাঁকে উজীর হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

ব্যাপারে কোন ক্রুটি হয়েছে। কাজেই এতে পরিবর্ধনকারীরও কোন প্রয়োজন নেই। যখন এ তিনটি কারণ বর্তমান নেই,—অথচ নবীর আগমনের কারণ এ তিনটি বিষয়ের ওপরই নির্ভরশীল— তখন স্বভাবতই স্বীকার করতে হবে যে, নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (সা)-এর পর নবুওয়াতের দরজা চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। যদি আজ এ দরজা খোলা থাকে তবে তার অর্থ এই হবে যে, আল্লাহ অনর্থক কাজও করেন, অথচ আল্লাহ এর থেকে মুক্ত শুদ্ধ ও পবিত্র। তাঁর দ্বারা কখনো কোন অনর্থক কাজ সম্পাদিত হয় না।[১]

নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (সা)-এর তিনটি বিশেষাত্মক মর্যাদাকে কুরআন অত্যন্ত বিস্তৃত ও সুস্পষ্টভাবে পেশ করেছে।

সাধারণ দাওয়াত

কুরআন বলছে ঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝

"(হে মুহাম্মাদ !) বলে দাও, লোক সকল ! আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত নবী, যিনি আসমান-জমিনের সাম্রাজ্যের মালিক, যিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং যিনি জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। কাজেই ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর 'উম্মী' নবী ও রাসূলের প্রতি, যিনি আল্লাহ এবং তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান পোষণ করেন। তাঁর অনুসরণ করো, যাতে করে তোমরা সোজা পথে চলতে পারো।"
—(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৮)

وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۤفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

"(হে মুহাম্মাদ !) আমরা তোমায় সমগ্র মানব জাতির জন্যেই সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী বানিয়ে পাঠিয়েছি, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই সে সম্পর্কে অনবহিত।"—(সূরা সাবা ঃ ২৮)

---

১. ব্যাপারটা শুধু এটুকুই নয় যে, নিষ্প্রয়োজনে একজন নবী প্রেরণ করা একটি অনর্থক কাজ, বরং তা বিচার-বুদ্ধিরও পরিপন্থী। নবুওয়াতের কাজ সম্পূর্ণ হবার পর তো এর দরজা বন্ধ হয়েই যাওয়া উচিত, যাতে করে এক নবীর অনুসরণে সারা দুনিয়ার মানুষ একত্রিত হতে পারে। নচেত এ দরজাটি খোলা থাকলে প্রত্যেক নতুন নবীর আগমনেই লোকদের মধ্যে নতুন করে কুফর ও ঈমানে পার্থক্য সূচিত হবে এবং একত্রিত লোকেরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করবে।

يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُوْلُ بِالْحَقِّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ط وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط (النساء : ١٧٠)

"হে লোক সকল ! তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে এ নবী তোমাদের কাছে 'সত্য' সহকারে এসেছেন, কাজেই তোমরা ঈমান পোষণ করো ; এটা তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। আর যদি কুফরী করতে থাকো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহই আসমান ও জমিনের অধিপতি।"-(সূরা নিসা ঃ ১৭০)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ○(الانبياء : ١٠٧)

"(হে মুহাম্মাদ !) আমরা তোমায় বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত বানিয়ে পাঠিয়েছি।"-(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৭)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا○

"তিনি পবিত্র যিনি তাঁর বান্দার ওপর হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী কিতাব পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে সতর্ককারী হন।"-(সূরা আল ফুরকান ঃ ১)

এর থেকে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

প্রথমত, মুহাম্মাদ (সা)-এর দাওয়াত কোন যুগ, কোন জাতি বা দেশের জন্যে নির্দিষ্ট নয়, বরং তিনি চিরকালের জন্যে সমগ্র মানব জাতির দিশারী ও পথপ্রদর্শক।

দ্বিতীয়ত, তাঁর প্রতি ঈমান পোষণ এবং তাঁর অনুসরণ করার জন্যে সমগ্র মানব জাতিই আদিষ্ট।

তৃতীয়ত, তার প্রতি ঈমান পোষণ এবং তাঁর অনুসরণ ছাড়া সৎপথ পাওয়া যেতে পারে না।

এ তিনটি বিষয়ই প্রত্যয়বাদের অন্তর্ভুক্ত কারণ যে বিশ্বজনীন সংস্কৃতির নাম ইসলাম, তার বিশ্বজনীনতা ও অসীমতা এ প্রত্যয়ের ওপরই নির্ভরশীল। বস্তুত নবী করীম (সা)-এর প্রচারিত দ্বীনের বাইরেও সুপথ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, এটা যদি স্বীকার করা হয়, তবে ইসলামী দাওয়াতের সার্বজনীনতাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ইসলামী আদর্শের বিশ্বজনীনতাও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতা

هُوَ الَّذِىْ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ٧

"তিনিই আপন রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ পাঠিয়েছেন, যাতে করে তিনি সমগ্র দ্বীনের ওপর তাকে বিজয়ী করে তুলতে পারেন।"

–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৩)

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ط (المائدة : ٣)

"আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার অনুগ্রহ সম্পদকে সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকেই দ্বীন রূপে মনোনীত করলাম।"

এর থেকে জানা গেল যে, যে জিনিসটাকে হেদায়াত বলা হয় এবং 'সত্য দ্বীন' বলতে যে জিনিসটাকে বুঝায়, তা সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণরূপে আরবী নবী (সা) -এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। সর্ববিধ দ্বীনের ওপর তাঁর নবুওয়াত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। তাঁরই মাধ্যমে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এবং পূর্বেকার নবীদের মাধ্যমে হেদায়াতের যে অমীয়ধারা অল্প অল্প করে নেমে আসছিলো, এবার তা পূর্ণত্বের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এরপর হেদায়াত, দ্বীন এবং সত্য জ্ঞানের মধ্যে এমন কোন জিনিস বাকী নেই, যা প্রকাশ করার জন্যে অপর কোন নবী বা রসূল আসার প্রয়োজন হতে পারে। এরূপ স্পষ্টতর ভাষায় দ্বীনের পরিপূর্ণতা এবং নেয়ামতের সম্পূর্ণতার কথা ঘোষণা করার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে পূর্ববর্তী নবুওয়াতগুলোর সাথে আনুগত্য ও অনুসরণের সম্পর্ক ছিন্ন হতে এবং ভবিষ্যতের জন্যে নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। এ দু'টি জিনিস, অর্থাৎ পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহের রহিতকরণ এবং নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি হচ্ছে রিসালাতে মুহাম্মাদী (সা)-এর পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য। কুরআন মজীদে এ দু'টি জিনিসকেই স্পষ্টভাষায় বিবৃত করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহের রহিতকরণ

পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহের রহিতকরণ কথাটির তাৎপর্য এই যে, পূর্বেকার নবীগণ যা কিছু পেশ করেছিলেন, এখন তা সবই রহিত হয়ে গিয়েছে। তাঁদের নবুওয়াত ও সত্যবাদিতার প্রতি মোটামুটি বিশ্বাস রাখা আবশ্যক বটে, কারণ তারা সবাই ইসলামী দাওয়াতের আহ্ববায়ক ছিলেন। তাঁদেরকে বিশ্বাস করা ইসলামকে বিশ্বাস করারই নামান্তর। কিন্তু কার্যত এখন আনুগত্য ও অনুসরণের সম্পর্ক তাদের থেকে ছিন্ন হয়ে শুধু মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষা ও জীবনাদর্শের সাথেই যুক্ত হয়ে গেছে। এ জন্যে যে, নীতিগতভাবে পূর্ণত্বের পর অপূর্ণতার কোনই প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়ত, পূর্বতন নবীদের শিক্ষাদীক্ষা ও জীবন

চরিত বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে ; যার ফলে কার্যত তাদের নির্ভুল অনুসরণ আর সম্ভব ছিলো না। এ কারণে কুরআন মজীদের যেখানেই রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সেখানে الرسول। কিংবা النبى। শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বিশেষভাবে মুহাম্মাদ (স)-কেই বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ۝

"তাদের বল, আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য কবুল কর। অতপর তারা যদি তোমাদের দাওয়াত কবুল না করে, তবে আল্লাহ সেইসব লোকদেরকে —যারা তাঁর ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে।— কিছুতেই ভালবাসতে পারে না।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩২)

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ -(النساء : ٥٩)

"আল্লাহ আনুগত্য কর। আনুগত্য কর রসূলের এবং সেই সবলোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পন্ন।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৫৯)

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

"যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করে সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই আনুগত্য করে।"-(সূরা

আর এ কারণেই যেসব জাতি পূর্বতন নবীদের কারো প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তাদেরকেও মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ঈমান পোষণ এবং তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ۟ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ۝ يَّهْدِىْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ (المائدة : ١٥-١٦)

"হে কিতাবধারীগণ ! তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের কাছে এমন বহু কথা বিবৃত করবেন, যা তোমরা কিতাব থেকে গোপন করে ফেলেছিলে। পরন্তু যিনি বহু কথা থেকে তোমাদের ক্ষমাও করে দিবেন। তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে নূর এবং খোলাখুলি

বর্ণনাকারী কিতাব এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তুষ্টির অনুসারী লোকদের শান্তির পথপ্রদর্শন করবেন, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের মধ্যে নিয়ে আসবেন। আর তাদেরকে সহজ-সরল পথে চালিত করবেন।"
—(সূরা আল মায়েদা ঃ ১৫-১৬)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى
التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ
كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ
اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا نِ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ
وَيُمِيْتُ ص فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ
وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ (الاعراف : ١٥٧-١٥٨)

"কিতাবধারীদের মধ্যে ঈমানদার লোক হচ্ছে তারা, যারা এ 'উম্মী' নবী-রসূলের অনুসরণ করে চলে, যাঁর কথা তারা নিজস্ব তাওরাত ও ইঞ্জিলেই লিপিবদ্ধ দেখতে পায়। তিনি তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেন এবং দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখেন। তাদের জন্যে পবিত্র দ্রব্যাদি হালাল করে দেন, অপবিত্র দ্রব্যাদি হারাম ঘোষণা করেন এবং তাদের ওপর থেকে সমস্ত বোঝা ও বেড়ি অপসারিত করে দেন। কাজেই যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করেছে এবং তাঁর সাথে অবতীর্ণ নূরের অনুসরণ করেছে, তারাই হচ্ছে কল্যাণপ্রাপ্ত। হে মুহাম্মাদ ! বলে দাও ঃ লোক সকল ! আমি তোমাদের প্রতি সেই আল্লাহর প্রেরিত রসূল, যিনি আসমান ও জমিনের গোটা সাম্রাজ্যের অধিপতি। তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দানকারী। কাজেই ঈমান আনো আল্লাহ এবং তাঁর 'উম্মী' রসূল ও নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ এবং তাঁর বাণীর প্রতি ঈমান এনেছে। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, যাতে করে তোমরা সোজা পথে চলতে পারো।"—(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭-১৫৮)

এ সুস্পষ্ট আয়াত কয়টিতে পূর্বতন ধর্মসমূহের রহিতকরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার অর্থ এবং তাৎপর্য বাতলে দেয়া হয়েছে। তার কারণও বিবৃত করা হয়েছে, তার স্বাভাবিক পরিণাম ফলও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এও বলে দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে হেদায়াত ও কল্যাণ প্রাপ্তি নবী উম্মী (সা)-এর অনুসরণের সাথে ওতপ্রোত জড়িত। পরন্তু এও বুঝিয়ে বলা হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতি বিশ্বাসী এবং অন্যান্য জাতির কাছে যে দ্বীন পাঠানো হয়েছিলো, নবী উম্মী (সা)-এর প্রচারিত দ্বীন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে তারই সংস্কার ও পরিপূর্ণতা মাত্র।

খতমে নবুওয়াত

এভাবে দ্বীনের পরিপূর্ণতার অপর পরিণাম ফল খতমে নবুওয়াতকেও কুরআন মজীদে স্পষ্টতর ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط
وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا ○(الاحزاب : ٤٠)

"মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল এবং খাতামুন নাবীয়্যিন। আর আল্লাহ সকল বিষয়ে অবহিত।"
-(সূরা আল আহযাব ঃ ৪০)

নবুওয়াতের দরজা বন্ধ করা সম্পর্কে এ ঘোষণাটি এতোই সুস্পষ্ট যে, কারো অন্তরে যদি বক্রতা ও কুটিলতা না থাকে, তবে এর পরে সে ইসলামের ভিতর নবুওয়াতের দরজা খোলার কোন অবকাশই বের করতে পারে না। আয়াতে উল্লেখিত خاتم শব্দে ت অক্ষরে 'জবর' দিয়ে পড়া হোক আর 'জের' দিয়ে উভয় অবস্থাতে একই ফল দাঁড়াবে ; আর তা হলো এই যে, যে আল্লাহর জ্ঞানের বিপরীত কোন কিছুই ঘটতে পারে না, তাঁর জ্ঞান অনুসারেই নবুওয়াতের দরজা চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে গেছে।

নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর প্রতি বিশ্বাসের আবশ্যিক উপাদান

দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতা, পূর্ববর্তী দ্বীনসমূহের রহিতকরণ এবং খতমে নবুওয়াতের এ তিনটি বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রত্যয়বাদের অন্তর্ভুক্ত এবং নবুওয়াতের ভিত্তি হচ্ছে এ বিশ্বাসের আবশ্যিক অঙ্গ। ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াতের ভিত্তি হচ্ছে এই যে, মানব জাতির জন্যে দাওয়াতে মুহাম্মাদী রূপে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম প্রবর্তন করা হয়েছে, যার মধ্যে পূর্বেকার সমস্ত

দাওয়াতের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এবং ভবিষ্যতের জন্যে এমন কোন অসম্পূর্ণতা বাকী রাখা হয়নি, যা পুরো করার কখনো প্রয়োজন হতে পারে। এ পূর্ণাঙ্গ দ্বীন চিরকালের জন্যে ইসলাম ও কুফর, হক ও বাতিলের মধ্যে এক সুনির্দিষ্ট ও চিরস্থায়ী পার্থক্য কায়েম করে দিয়েছে। এরপর কেয়ামত পর্যন্ত এতে আর কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে না। বস্তুত যা কিছু ইসলাম এবং হক তা মুহাম্মাদ (সা) স্পষ্টত বাতলে দিয়ে গেছেন। এরপর এ জাতীয় আর কোন নতুন জিনিস আসার সম্ভাবনা নেই যে, তার স্বীকৃতির ওপর লোকদের মুসলিম ও হক প্রাপ্ত হওয়া নির্ভর করবে। পক্ষান্তরে যে জিনিসকে মুহাম্মাদ (সা) কুফর ও বাতিল বলে আখ্যা দিয়েছেন, তা চিরকালের জন্যেই কুফর ও বাতিল। তার কোন জিনিস যেমন আজ হক ও ইসলাম হতে পারে না, তেমনি তা ছাড়া অপর কোন জিনিসের ভিত্তিতে কুফর ও ইসলামের নতুন পার্থক্যও সৃষ্টি করা যেতে পারে না। এহেন সুদৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয় ভিত্তির ওপরই বিশ্বব্যাপী স্থায়ী মিল্লাত ও ইসলামী সংস্কৃতির গগণচুম্বী ইমারত নির্মাণ করা হয়েছে। এরূপ ভিত্তির ওপর তার নির্মাণ এ জন্যেই করা হয়েছে, যাতে করে দুনিয়ার মানুষ চিরদিনের জন্যে একই মিল্লাত, একই দ্বীন এবং একই সংস্কৃতির অনুসরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। সে মিল্লাত হবে এমন, যার পূর্ণত্ব ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে তাদের ভয় থাকবে না। আস্থা ও নির্ভরতার ওপরই ইসলামের সার্বজনীন দাওয়াতের ভিত্তি স্থাপিত, আর এর ওপরই ইসলামের স্থিতি ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি বলে যে, ইসলামের অবতরণের পরও পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর অনুসরণ বৈধ, সে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কাছ থেকে সার্বজনীন দাওয়াতের অধিকারই ছিনিয়ে নিতে চায়। কারণ ইসলাম ছাড়া অন্যান্য পন্থায়ও যখন হেদায়াত প্রাপ্তি সম্ভব হবে, তখন সমগ্র মানব জাতিকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো অনর্থক হয়ে দাঁড়াবে। আর যে ব্যক্তি বলে যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর শিক্ষাধারায় প্রত্যেক যুগের প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যেতে পারে, সে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের কাছ থেকে স্থায়িত্বের অধিকার হরণ করে নিতে চায়। কারণ যে দ্বীন অসম্পূর্ণ এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাপেক্ষ, তার চিরকালের জন্যে হেদায়াত প্রাপ্তির মাধ্যম হবার দাবী করলে তার সে দাবী হবে অসত্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলে যে, ইসলামে মুহাম্মাদ (সা)-এর পরও নবী আসার অবকাশ রয়েছে, সে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের স্থিতিশীলতার ওপরই আঘাত হানতে চায়। কারণ নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্ত রাখার মানেই হচ্ছে এই যে, ইসলামের একতা ও সংঘবদ্ধতার মধ্যে হামেশাই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার আশংকা বর্তমান থাকবে। পরন্তু নতুন নবী আসার ফলে কুফর ও ইসলামের এক নতুন বিভেদের উন্মেষ হবে এবং এমন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আল্লাহ, মুহাম্মাদ (সা) এবং কুরআনের প্রতি

ঈমান পোষণকারী লোকেরা দলে দলে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে। কাজেই নবুওয়াতের দরজা উন্মোচন হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ফিতনা ও বিভ্রান্তির দরজা উন্মোচনের শামিল। ইসলামের মূলোৎপাটনের যতোগুলো সম্ভাব্য কারণ রয়েছে, তার মধ্যে নতুন নবুওয়াতের দাবীই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ও বিপজ্জনক কারণ। মুসলিম জাতির সংগঠন পদ্ধতি এ ভিত্তির ওপরই কায়েম করা হয়েছে যে, যারা মুহাম্মাদ (সা) এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনবে, তারা সবাই মুসলমান এবং ঈমানদার। তারা এক মিল্লাত এক জাতি। পরস্পরে তারা ভাই-ভাই। সুখ-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে তারা একে অপরের অংশীদার। এখন যদি কেউ কেউ এসে বলে যে, মুহাম্মাদ (সা) এবং কুরআনের প্রতি ঈমান পোষণই যথেষ্ট নয়, তার সাথে আমার প্রতিও ঈমান আনা আবশ্যক, আর যে ব্যক্তি আমার প্রতি ঈমান না আনবে সে মুহাম্মাদ (সা) এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা সত্ত্বেও কাফের, পরন্তু এর ভিত্তিতেই সে মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ইসলামের বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মুহাম্মাদ (সা) কর্তৃক গঠিত একজাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে, কুরআন যাদেরকে إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ বলে ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সে ছিন্ন করে দেয়, তাদের নামায ইত্যাদি পৃথক করে দেয়, তাদের মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক ভেঙে ফেলে, এমন কি তাদের মধ্যে রোগ পরিচর্যা, শোক-সহানুভূতি, জানাযায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি সম্পর্কও বাকী না রাখে,—তবে তার চেয়ে ইসলামের, ইসলামী জাতীয়তার, ইসলামী সংস্কৃতির এবং ইসলামী সমাজ পদ্ধতির দুশমন আর কে হতে পারে?

এ আলোচনা থেকে অনায়াসেই বোঝা যেতে পারে যে, নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর সাথে দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণতা, পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর রহিতকরণ এবং খতমে নবুওয়াতে বিশ্বাস কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামের স্থিতি ও স্থায়িত্ব এবং তার প্রবর্তনের জন্যে তার ঈমানের অন্তর্ভুক্তি কেন আবশ্যক।

---

৬. কিতাবের প্রতি ঈমান

ইসলামের পরিভাষায় ‘কিতাব’ বলতে বুঝায় এমন গ্রন্থকে, যা মানুষের পথনির্দেশের জন্যে আল্লাহর তরফ থেকে রসূলের প্রতি অবতরণ করা হয়। এ অর্থের প্রেক্ষিতে কিতাব হচ্ছে সেই পয়গামের সরকারী বিবৃতি (Official Version) অথবা ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী ‘খোদায়ী কালাম’ যা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে এবং যাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দুনিয়ায় পয়গম্বর প্রেরিত হয়ে থাকে। এখানে এ আলোচনার অবকাশ নেই যে, ‘কিতাব’ কি অর্থে আল্লাহর কালাম এবং তার কালামুল্লাহ্ হবার স্বরূপ কি ? এটা নিরেট খোদায়ী সম্পর্কিত আলোচনা। এর সাথে আলোচ্য বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে আমরা শুধু এ দিকটির ওপর আলোকপাত করবো যে, ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি রচনায় ঈমান বিল কিতাবের (কিতাবের প্রতি ঈমান) ভূমিকা কি ? আর এর জন্যে শুধু এটুকু জেনে নেয়াই যথেষ্ট যে, পয়গম্বরের মাধ্যমে মানুষকে যে শিক্ষাদান করা উদ্দেশ্য, তার মূলনীতি ও মৌল বিষয়াদি আল্লাহর তরফ থেকে পয়গম্বরের হৃদয়ে প্রত্যাদিষ্ট হয়। তার ভাষা এবং অর্থ কোনটাতেই পয়গম্বরের নিজস্ব বুদ্ধি ও চিন্তা, তাঁর ইচ্ছা ও আকাংখার বিন্দু পরিমাণ দখল থাকে না। এ কারণেই তা শব্দ এবং অর্থ উভয় দিক থেকেই আল্লাহর কালাম—পয়গম্বরের নিজস্ব রচনা নয়। পয়গম্বর একজন বিশ্বস্ত দূত হিসেবে এ কালাম আল্লাহর বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকেন। তদুপরি তিনি আল্লাহর দেয়া দূরদৃষ্টির সাহায্যে তার অর্থ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এ সকল খোদায়ী মূলনীতির ভিত্তিতে নৈতিকতা, সামাজিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এক পূর্ণাঙ্গ কাঠামো গড়ে তোলেন। শিক্ষা, প্রচার, সদুপদেশ এবং নিজের পূত চরিত্রের দ্বারা লোকদের ধ্যান-ধারণা, ঝোঁক-প্রবণতা ও চিন্তাধারায় এক মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে তাকওয়া, পবিত্রতা, নির্মলতা ও সদাচরণের ভাবধারা সঞ্চারিত করেন। শিক্ষাদীক্ষা ও বাস্তব পথ নির্দেশের দ্বারা তাদেরকে এমনিভাবে সুসংহত করেন যে, নতুন মানসিকতা, নতুন চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, নতুন রীতিনীতি এবং নতুন আইন-কানুনের সাথে এক নতুন সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। পরন্তু তিনি তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব এবং সেই সাথে নিজের শিক্ষাদীক্ষা ও পূত চরিত্রের এমন নিদর্শন রেখে যান, যা হামেশা এ সমাজ এবং এর পরবর্তী বংশধরদের জন্যে আলোকবর্তিকার কাজ করে।

নবুওয়াত ও কিতাবের সম্পর্ক

'নবুওয়াত' এবং 'কিতাব' উভয়েই এক আল্লাহর তরফ থেকে আগত। উভয়ে একই খোদায়ী বিষয়ের অপরিহার্য অঙ্গ এবং একই উদ্দেশ্যে ও একই দাওয়াতের পূর্ণতার মাধ্যম। সেই আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর হেকমত যেমন রসূলের ভেতর রয়েছে, তেমনি রয়েছে কিতাবের পৃষ্ঠায়। যে শিক্ষায় শাব্দিক বর্ণনাকে বলা হয় 'কিতাব', তারই বাস্তব নমুনা হচ্ছে রসূলের জীবন।

মানুষের প্রকৃতিই (ফিতরাত) কতকটা এ ধরনের যে, নিছক কিতাবী শিক্ষা থেকে সে কোন অসাধারণ ফায়দা লাভ করতে পারে না। তার জ্ঞানের সাথে সাথে একজন মানবীয় শিক্ষক এবং দিশারীও প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যিনি নিজস্ব শিক্ষার দ্বারা সেই জ্ঞানকে লোকদের হৃদয়ে দৃঢ়মূল করে দেবেন এবং তার প্রতিমূর্তি হয়ে আপন কর্মের দ্বারা লোকদের মধ্যে এ শিক্ষারই অভিপ্রেত প্রাণ চেতনার সঞ্চার করবেন। মানবীয় শিক্ষকের পথনির্দেশ ও শিক্ষা-দীক্ষা ছাড়া শুধুমাত্র কোন গ্রন্থ দুনিয়ার কোন জাতির মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনধারায় বিপ্লব সৃষ্টি করতে পেরেছে, গোটা মানবেতিহাসে এমন একটি দৃষ্টান্তও আপনারা খুঁজে পাবেন না। যে সকল দিশারী বিভিন্ন জাতির চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডে প্রচণ্ড বিপ্লব সৃষ্টি করেছেন তাঁরা যদি স্বকীয় শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ বাস্তব নমুনা হয়ে জন্মলাভ না করতেন এবং তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শবাদ শুধু গ্রন্থাকারেই প্রকাশিত হতো, তবে মানব প্রকৃতির কোন দুঃসাহসী রসহ্যবেদীই এ দাবী করতে পারতো না যে, উক্ত দিশারীদের বাস্তব শিক্ষার দ্বারা যেসব বিপ্লব সৃষ্টি হতো, নিছক এ কিতাবের দ্বারাই সেরূপ বিপ্লব সংঘটিত হতো।

অন্যদিকে মানব প্রকৃতির এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, সে মানবীয় দিশারীর সাথে সাথে তার প্রচারিত শিক্ষার একটি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা তা কাগজে লিপিবদ্ধ হোক কি অন্তরে সুরক্ষিত থাকুক—পেতে চায়। যে সকল নীতির ভিত্তিতে কোন দিশারী জাতির চিন্তাধারা, কর্মকাণ্ড নৈতিকতা ও তমদ্দুনের ভিত্তি স্থাপন করেন, তা যদি মূল আকারে সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে ধীরে ধীরে তার শিক্ষার ছাপ নিশ্চিহ্ন হতে থাকে। তাঁর সে ছাপ মুছে যাবার সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবন ধারা এবং সামাজিক ব্যবস্থা ও আইন-কানুনের ভিত্তিও ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। এমনকি, শেষ পর্যন্ত সে জাতির কাছে শুধু কিচ্ছা-কাহিনীই বাকী থেকে যায়। তার ভেতর একটি শক্তিশালী সমাজ ও সভ্যতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার শক্তি আর থাকে না। এ কারণেই যেসব দিশারীর শিক্ষা সুরক্ষিত থাকেনি, তার অনুগামীরা ভ্রান্তি ও গোমরাহীর আবর্তে পড়ে গেছে। তাঁদের সংগঠিত জাতি চিন্তা, বিশ্বাস, কর্মধারা, নৈতিকতা ও তমদ্দুনের সকল প্রকার বিকৃতির মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যেসব নির্ভুল ও সঠিক নীতির

ভিত্তিতে শুরুতে এ জাতির সংগঠন করা হয়েছিল, তাঁদের তিরোধানের পর সেসব নীতি ধরে রাখার মত কোন জিনিসও আর অবশিষ্ট থাকেনি।

বিশ্বস্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির এ প্রকৃতি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। এ কারণে তিনি মানব জাতির হেদায়াতের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় থেকেই তার জন্যে নবুওয়াত ও প্রত্যাদেশ উভয় ধারা এক সাথে প্রবর্তন করেন। এ দিকে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী লোকদেরকে তিনি নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন, অন্যদিকে তাঁদের প্রতি আপন কালামও অবতরণ করেন। যাতে করে এ দু'টি জিনিস মানব প্রকৃতির দু'টি দাবীই পূরণ করতে পারে। নবী যদি কিতাব ছাড়া আসতেন কিংবা কিতাব নবী ছাড়া আসতো, তাহলে বিচার-বুদ্ধির উদ্দেশ্য কখনো পূর্ণ হতো না।

আলোকবর্তিকা ও পথপ্রদর্শকের কুরআনী দৃষ্টান্ত

নবুওয়াত এবং কিতাবের এ সম্পর্ককে কুরআন মজীদ একটি উপমার সাহায্যে বিবৃত করেছে। তার বিভিন্ন জায়গায় নবীকে পথিকৃত ও পথপ্রদর্শকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যার কাজ হচ্ছে পথভ্রষ্ট লোকদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করা। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ـ(الرعد : ٧) وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا ـ(الانبياء : ٧٣) وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ـ(النازعات : ١٩) فَاتَّبِعْنِىْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ـ(مريم : ٤٣)

অন্যদিকে সে কিতাবকে দীপ্তি (نور) জ্যোতি (ضياء) 'উজ্জ্বল' (برهان) 'দলীল'(فرقان) 'পার্থক্যকারী'(منير) 'আলোদানকারী' (مبين) 'বর্ণনাকারী' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করেছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ ـ(الاعراف : ١٥٧) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً ـ(الانبياء : ٤٨) قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ ـ(النساء : ١٨٤) قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتَابٌ مُّبِيْنٌ ـ(المائدة : ١٥)

এ উপমাগুলো নিছক কবিত্ব নয়, বরং এগুলো এক গুরুত্বপূর্ণ সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে। এর আসল বক্তব্য হলো এই যে, সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক বুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞান থেকে এতোটা আলোক ও পথনির্দেশ লাভ করে না, 'যা

দ্বারা' সে সত্যের সহজ-সরল পথে চলতে পারে। এ অপরিচিত ও অন্ধকার পথে তার এমন একজন অসাধারণ পথিকৃতের প্রয়োজন, যিনি এ পথের নিয়ম কানুন সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। সেই সাথে তাঁর হাতে একটি আলোকবর্তিকা থাকা দরকার যাতে করে তার সাহায্যে পথের কোথাও গর্ত রয়েছে, কোথাও পা পিছলে যায়, কোথাও কাঁটার ঝোপ রয়েছে, কোথাও থেকে বাঁকা ও ভ্রান্ত পথ বেরিয়ে গেছে ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হয়ে পথ চলতে পারে। আর তার অনুগামী লোকেরাও সে আলোয় পথের চিহ্ন দেখে সোজা পথের লক্ষণাদি জেনে নিয়ে এবং বাঁকা পথের মোড় ও বাঁকগুলো সম্পর্কে অবহিত হয়ে পূর্ণ দূরদৃষ্টির সাথে তার অনুসরণ করতে পারে। বস্তুত রাতের অন্ধকারে পথিকৃত ও আলোকবর্তিকার মধ্যে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, নবী ও কিতাবের মধ্যেও রয়েছে ঠিক সেই সম্পর্ক। আমরা যদি পথিকৃতের হাত থেকে আলোকবির্তকা ছিনিয়ে নেই এবং তাকে নিয়ে নিজেরাই চলতে শুরু করি, তবে পথিমধ্যে আমরা এমন সব তেমাথা, চৌমাথা এবং এক প্রকার রাস্তার সাক্ষাত পাবো, যেখানে গিয়ে হয় আমাদের হয়রান ও পেরেশান হয়ে থমকে যেতে হবে নতুবা সে বর্তিকার আলোয় কোন ভ্রান্ত পথে চলতে হবে। কারণ নিছক প্রদীপের অস্তিত্ব মানুষকে পথিকৃতের সাহায্য থেকে অমুখাপেক্ষী করতে পারে না। ঠিক তেমিন পথিকৃতের হাতে যদি আলোকবর্তিকা না থাকে, তবে আমাদের শুধু অন্ধ অনুগামীর মতো তাকে আকড়ে ধরে চলতে হবে এবং আলো ছাড়া আমাদের মধ্যে এতটুকু দূরদৃষ্টির সৃষ্টি হবে না, যাতে করে সোজা পথকে আমরা বাঁকা পথ থেকে পৃথক করে দেখতে পারি এবং সোজা পথের যেসব জায়গায় মানুষ হোচট খেয়ে বসে কিংবা তার পা পিছলে যায়, সেসব নাজুক জায়গা আমরা চিনে নিতে পারি। কাজেই আমাদের রাতের অন্ধকারে অপরিচিত পথ চলার জন্যে যেমন একজন অভিজ্ঞ ও সুপরিচিত পথনির্দেশকের প্রয়োজন হয় এবং পথের নিদর্শনাদি দেখার উপযোগী একটি প্রদীপেরও আবশ্যক হয় এবং এ দু'টির মধ্যে কোন একটি থেকেও আমরা বেপরোয়া হতে পারি না, ঠিক তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের অপরিচিত জগতে—যেখানে নিছক আমাদের বিবেক-বুদ্ধির আলো কোন কাজে আসে না—আমাদের রসূল ও কিতাবের একইরূপ প্রয়োজন। এর মধ্যে কোন একটির অনুসরণ ছেড়ে আমরা সোজা পথ পেতে পারি না।

নবী হচ্ছেন এমন অভিজ্ঞ পথিকৃত, যিনি আল্লাহর দেয়া দূরদৃষ্টির সাহায্যে হেদায়াতের ছিরাতুল মুস্তাকীমকে জেনে নিয়েছেন। তিনি এ পথের খুঁটিনাটি বিষয় এমনভাবে অবহিত, কোন পথে অংসখ্য বার যাতায়াত করলে একজন পথিকৃত যেমন তার প্রতিটি পদক্ষেপের পুঙ্খানুপঙ্খ বিবরণ অবহিত হয়ে থাকে।

এহেন দূরদৃষ্টিকেই বলা হয় 'বুদ্ধিমত্তা' (حكم) 'জ্ঞান' (علم) 'পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধি' (شرح صدر) 'খোদায়ী শিক্ষা (تعليم الهى) ও 'খোদায়ী হেদায়াত' (هدايت ربانى) যা বিশেষভাবেই নবীদেরকে দান করার কথা কুরআনে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ -(الم نشرح) وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا -(الانبياء : ٧٩) وَاَنزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ -(النساء : ١١٣) اِتَّبِعُوْا مَنْ لاَّيَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ -(يس : ٢١)

আর কিতাব হচ্ছে এমন উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা, যার সাহায্যে নবী শুধু তাঁর অনুসারীদেরকে সোজা পথেই চালিত করেন না, বরং তাদেরকে এমন জ্ঞানের দীপ্তি, চিন্তার আলো এবং সত্যের প্রভা দ্বারা মণ্ডিত করে দেন যা এক উচ্চতর পর্যায়ে আল্লাহর তরফ থেকে তিনি লাভ করেছেন। সেই সাথে তাদেরকে শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা এতখানি যোগ্য করে তোলেন যে, যদি তারা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলে এবং ঐ আলোকবর্তিকাটি হাতে রাখে, তবে শুধু নিজেরাই সুপথ লাভ করবে না, বরং অন্যান্য লোকের জন্যেও পথপ্রদর্শক ও দিশারীতে পরিণত হবে।

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ -(ابراهيم : ١)

"এ কিতাবকে আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসবে।"
-(সূরা ইবরাহীম ঃ ১)

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ -

"আমরা তোমার প্রতি জিকর (কুরআন) অবতরণ করেছি এ জন্যে যে, লোকদের জন্যে সেই হেদায়াতকে সুস্পষ্ট করে তুলবে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে ; সম্ভবত তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।"-(সূরা

উপরন্তু এক উন্নত ভঙ্গিতে কুরআন এও বলে দিয়েছে যে, বস্তুজগতে প্রদীপ ও পথিকৃতের মধ্যে যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে, আত্মিক জগতে তা নবী ও কিতাবের মধ্যে নেই। বরং সেখানে এতদুভয়ের মধ্যে এক ঐক্য সূত্র রয়েছে। তাই কোন কোন জায়গায় যে জিনিস দ্বারা কিতাবকে তুলনা করা হয়েছে, সেই জিনিস দ্বারাই অন্যত্র রসূলকেও তুলনা করা হয়েছে। এরূপ এর বিপরীত তুলনাও করা

হয়েছে ঃ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ـ(الاحزاب : ٤٥ـ٤٦) হে নবী । আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী স্বরূপ সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর প্রতি আহবানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।" এ আয়াতে রসূলকে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা বলে উল্লেখ করেছে। আবার اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِيْ لِلَّتِيْ هِيَ اَقْوَمُ ـ(بنى اسـرائيل : ٩) "সত্য কথা এই যে, এই কুরআন সেই পথ দেখায়, যা পুরোপুরি সোজা ঋজু।" আয়াতে কিতাবকে বলা হয়েছে পথিকৃত।

এ থেকে জানা গেল যে, কিতাব ও রসূলের সম্পর্ক মূলত অবিচ্ছেদ্য। মানুষের হেদায়াত প্রাপ্তির জন্যে উভয়েরই সমান প্রয়োজন। ইসলাম যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বাস্তব কর্মব্যবস্থা এবং যে কৃষ্টি ও তমদ্দুনকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তার প্রতিষ্ঠা, স্থিতি এবং দায়িত্বকে অবিকল ও অবিকৃত রাখার জন্যে নবুওয়াত ও কিতাবের সাথে হামেশা তার সম্পর্ক বজায় রাখা অপরিহার্য। এ তীব্র প্রয়োজনের ভিত্তিতেই নবুওয়াত ও কিতাবকে পৃথক পৃথকভাবে ঈমানের দু'টি অপরিহার্য অঙ্গ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটির ওপরই ঈমান আনার জন্যে বারবার তাকিদ করা হয়েছে। যদি তাকিদ করা উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে এরূপ করার কোনই প্রয়োজন ছিল না, কেননা রসূলের সত্যতা স্বীকার তাঁর আনীত কিতাবেরই সত্যতা প্রমাণ করে আর কিতাবের সত্যতা স্বীকার তার ধারক-বাহকেরই সত্যতা প্রমাণের শামিল।

সকল আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান

এ ঈমান প্রসঙ্গেই ইসলাম এমন সমস্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে, যা আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর নবীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমান হবার জন্যে যেমন সমস্ত নবী ও রসূলের প্রতি ঈমান আনা জরুরী, তেমনি সকল কিতাবের প্রতিও ঈমান আনা প্রয়োজন। তাই কুরআনে বারবার বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج (البقرة : ٤)

"পরহেযগার হচ্ছে তারা যারা ঈমান আনে তোমার ওপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতিও।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪)

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ـ (البقرة : ٢٨٥)

"রসূল এবং সমস্ত মু'মিন ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি তাঁর সকল কিতাবের প্রতি এবং তাঁর নবীদের প্রতি।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৫)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ـ (ال عمران : ٣)

"আল্লাহ তোমার প্রতি সত্যের সাথে কিতাব নাযিল করেছেন, যা ইতিপূর্বে আগত সমস্ত কিতাবের সত্যতা প্রমাণ করে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩)

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ص لَانُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ز وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ○ (ال عمران : ٨٤)

"বলো ঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি, আমাদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক এবং ইয়াকুব সন্তানদের ওপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি আর মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীদেরকে যা তাদের প্রভুর তরফ থেকে দেয়া হয়েছিলো। আমরা তাদের কারো মধ্যেই পার্থক্য করি না এবং আমরা তাদের আজ্ঞানুবর্তী।"
–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৪)

اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ـ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ○ اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ط يُسْحَبُوْنَ ○ فِي الْحَمِيْمِ لا ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ○ (المؤمن : ٧٠-٧٢)

"যারা এ কিতাব এবং অন্য যেসব কিতাবের সাথে আমরা নবী পাঠিয়েছিলাম, সেসব অস্বীকার করেছে, তারা খুব শীগ্‌গীরই এর পরিণাম ফল জানতে পারবে। যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল পরিহিত থাকবে ; তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে উত্তপ্ত পানির মধ্যে, অতপর নিক্ষেপ করা হবে অগ্নিগর্ভে।"–(সূরা আল মু'মেন ঃ ৭০-৭২)

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج (الحديد : ٢٥)

"নিসন্দেহে আমরা নবীদেরকে স্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ পাঠিয়েছিলাম এবং তৎসহ কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছিলাম, যেন লোকেরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়।"–(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৫)

এ সাধারণ বর্ণনার সাথে কতিপয় গ্রন্থের নামোল্লেখ করেও তাদের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাওরাতকে হেদায়াত, জ্যোতি, (نـور), ফুরকান, দীপ্তি (ضياء), ইমাম ও রহমত নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।–(আল কাসাস ঃ ৫, আল মায়েদা ঃ ৬, আল আম্বিয়া ঃ ৪, আহক্বাফ ঃ ২) এবং 'ইঞ্জিলকেও হেদায়াত, জ্যোতি (نـور) ও উপদেশমালা (مـوعظت) নামে অভিহিত করা হয়েছে, (আল মায়েদা ঃ ৪)। ফলকথা, যেসব গ্রন্থের কথা কুরআনে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের প্রতি সবিস্তারে এবং যাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি, তাদের প্রতি সাধারণভাবে ঈমান আনতে হবে—এটা ইসলামের অন্যতম নীতি। ইসলামী প্রত্যয় অনুসারে দুনিয়ায় এমন কোন জাতি নেই, যার মধ্যে আল্লাহর নবী তাঁর কাছ থেকে গ্রন্থ নিয়ে আসেনি। আর দুনিয়ার বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতো গ্রন্থ এসেছে, তা ছিলো সব একই উৎস থেকে উৎসারিত নির্ঝরিণী, একই সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মি। সমস্ত গ্রন্থই 'ইসলাম' নামক সত্য, সত্যতা, হেদায়াত ও জ্যোতি (نـور) সহ এসেছিলো। এ কারণে 'মুসলিম' ব্যক্তি মাত্রেই সে সবের প্রতি ঈমান আনে। আর যে ব্যক্তি এর কোন একটি গ্রন্থও অবিশ্বাস করে, সে সবকিছু অস্বীকার এবং প্রকৃত উৎস অস্বীকার করার দায়ে অপরাধী।

নিছক কুরআনের অনুসরণ

কিন্তু ঈমানের পর যেখান থেকে কার্যত অনুসরণের সীমা শুরু হয়, সেখানে অন্যান্য গ্রন্থাবলী থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করে শুধু কুরআনের সাথেই সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন। এর কতিপয় কারণ রয়েছে ঃ

প্রথমত, আসমানী গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেকগুলোই এখন অনুপস্থিত। আর যেগুলো বর্তমানে পাওয়া যায়, তার মধ্যে কুরআন ছাড়া আর কোন কিতাবই মূল ভাষা ও অর্থে সুরক্ষিত নেই। তাতে খোদায়ী কালামের সাথে মানবীয় কালাম ও ভাষা এবং অর্থ উভয় দিক দিয়ে যুক্ত হয়ে গেছে। ঐ সকল গন্থে প্রবৃত্তি পূজার অনিবার্য ফলস্বরূপ হেদায়াতের সাথে গোমরাহী মিশ্রিত হয়ে গেছে। এখন তাতে কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যা আছে সেটা পার্থক্য করাই কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েছে। যেসব গ্রন্থের উপর বিভিন্ন জাতি তাদের ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছে এবং যেগুলো আসমানী গ্রন্থ বলে সন্দেহ হয়, সেগুলোর অবস্থা হচ্ছে এরূপ। কোন কোনটিতে আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হবার ধারণাই বর্তমান নেই। কোন কোনটি সম্পর্কে এ তথ্যটুকু পর্যন্ত জানা যায় না

যে, তা আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকলে কোন্ নবীর কাছে এবং কোন্ যুগে অবতীর্ণ হয়েছিলো। কোন কোনটির ভাষার এমন মৃত্যু ঘটেছে যে, আজ তার সঠিক অর্থ নির্ণয় করা পর্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কোন কোনটিতে মানবীয় কামনা এবং ভ্রান্ত মতবাদ ও কুসংস্কারের স্পষ্ট মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কোনটিতে শিরক্, গায়রুল্লাহর পূজা এবং এ ধরনেরই অন্যান্য ভ্রান্ত প্রত্যয় ও আচরণের স্পষ্ট শিক্ষা রয়েছে যা কোনক্রমেই সত্য হতে পারে না। যে সকল গ্রন্থের অবস্থাই এরূপ, তা কখনো মানুষকে নির্ভুল জ্ঞান ও সঠিক আলো দান করতে পারে না। আর মানুষ তার অনুসরণ করে গোমরাহী থেকেও নিরাপদ হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, কুরআন ছাড়া বর্তমানে আর যতো গ্রন্থাবলী রয়েছে—তা আসমানী হোক, কি আসমানী হবার সন্দেহযুক্ত হোক—তার শিক্ষাধারা ও বিধি-ব্যবস্থায় হয় সংকীর্ণ গোত্রীয় জাতীয়তার প্রভাব সমুজ্জ্বল অথবা বিশেষ যুগের চাহিদা প্রবলতর। তা কখনোই সকল যুগে সকল মানব জাতির জন্যে হেদায়াত ও পথনির্দেশের মাধ্যম হয়নি আর হতেও পারে না।

তৃতীয়ত, একথা নিসন্দেহ যে, এ গ্রন্থাবলীর প্রত্যেকটিতে কিছু কিছু সত্য ও যথার্থ শিক্ষা বর্তমান রয়েছে এবং তাতে মানুষের স্বভাব-চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের পরিশুদ্ধির জন্যে অনেক ভালো নীতি ও বিধি-বিধানও রয়েছে ; কিন্তু কোন গ্রন্থেই সমস্ত পুণ্য ও কল্যাণের সমাহার ঘটেনি ; কোনটিতেই একাকী মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগে নির্ভুল পথনির্দেশ করতে পারে না।

কিন্তু কুরআন মজীদ এ তিনটি ক্রটি হতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ঃ

এক ঃ রসূলে করীম (সা) যে ভাষায় কুরআন পেশ করেছিলেন, তা ঠিক সে ভাষায়ই সুরক্ষিত রয়েছে। প্রথম দিন থেকে শত-সহস্র লক্ষ মানুষ প্রত্যেক যুগে তাকে মুখস্থ করেছে। লক্ষ-কোটি মানুষ প্রত্যহ তা তেলাওয়াত করছে। হামেশা তার কপি লিপিবদ্ধ করে আসছে। কখনো তার অর্থ বা বাচনে কোন পার্থক্য দেখা যায়নি। কাজেই এ ব্যাপারে কোন শোবা-সন্দেহের অবকাশ নেই যে, নবী করীম (সা)-এর জবান থেকে যে, কুরআন শোনা গিয়েছিলো, তাই আজ দুনিয়ায় বর্তমান এবং চিরকাল বর্তমান থাকবে। এতে কখনো একটি শব্দের রদবদল না হয়েছে, না হতে পারে।

দুই ঃ কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা আজো একটি জীবন্ত ভাষা। আজ দুনিয়ায় কোটি কোটি আরবী ভাষাভাষী লোক বর্তমান। কুরআন অবতরণকালে যেসব পুস্তক এ ভাষার শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ সাহিত্য ছিলো, আজ পর্যন্ত তাই রয়েছে। মৃত ভাষাগুলোর পুস্তকাদি বুঝতে আজ যেসব অসুবিধা দেখা দেয়, এসব সাহিত্যের অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করতে তেমন কোন অসুবিধ-াই নেই।

তিন ঃ কুরআন পুরোপুরি সত্য ও অভ্রান্ত এবং আদ্যপান্ত খোদায়ী শিক্ষায় পরিপূর্ণ। এতে কোথাও মানবীয় আবেগ, প্রবৃত্তির লালসা, জাতীয় বা গোত্রীয় স্বার্থপরতা এবং মূর্খতাজাত গোমরাহীর চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ভেতর আল্লাহর কালামের সাথে মানবীয় কালাম অণু পরিমাণও মিশ্রিত হতে পারেনি।

চার ঃ এতে সকল মানব জাতিকেই আমন্ত্রণ জানান হয়েছে এবং এমন আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র নীতি ও আচরণ বিধি পেশ করা হয়েছে, যা কোন দেশ, জাতি এবং যুগ বিশেষের জন্যে নির্দিষ্ট নয়। এর প্রতিটি শিক্ষা যেমন বিশ্বজনীন, তেমনি চিরস্থায়ীও।

পাঁচ ঃ পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থাবলীতে যেসব সত্যতা, মৌলিকতা এবং কল্যাণ ও সৎকাজের কথা বিবৃত হয়েছিলো, এতে তার সবই সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। কোন ধর্মগ্রন্থ থেকে এমন কোন সত্য ও সৎকাজের কথা উদ্বৃত করা যাবে না, কুরআনে যার উল্লেখ নেই। এমন পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের বর্তমানে মানুষ স্বভাবতই অন্য গ্রন্থ থেকে অমুখাপেক্ষিই হয়ে যায়।

ছয় ঃ কুরআন হচ্ছে আসমানী হেদায়াত খোদায়ী শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ (Latest Edition) গ্রন্থ। অতীতের গ্রন্থাবলীতে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যেসব বিধি-ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিলো, এতে তা বাদ দেয়া হয়েছে এবং অতীতের গ্রন্থাবলীতে অনুপস্থিত এমন অনেক নতুন শিক্ষাও এতে সংযোজিত করা হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি পূর্ব পুরুষদের নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী হেদায়াতের অনুসারী তার পক্ষে এ সর্বশেষ গ্রন্থের পুরনো গ্রন্থাবলীর নয় —অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক।

এ সকল কারণেই ইসলাম সকল গ্রন্থ থেকে অনুসরণের সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল কুরআনকেই অনুসরণের উপযোগী ঘোষণা করেছে এবং একমাত্র এ গ্রন্থকেই কর্মবিধি ও কর্ম প্রণালী হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে সমগ্র দুনিয়াকে আহ্বান জানিয়েছে।

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ط

"আমি এ কিতাবকে তোমার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি লোকদের মধ্যে আল্লাহর দেয়া সত্যজ্ঞান সহ বিচার-ফয়সালা করতে পারো।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১০৫)

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ لا أُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○(الاعراف : ١٥٧)

"অতএব যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং যারা তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করেছে এবং তার সাথে অবতীর্ণ নূরের অনুসরণ করে চলেছে, তারাই কল্যাণপ্রাপ্ত।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭)

আর এ কারণেই যেসব জাতির কাছে আগে থেকেই কোন আসমানী কিতাব বর্তমান রয়েছে, তাদেরকেও কুরআনের প্রতি ঈমান আনার এবং তার অনুসরণ করে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাই বারবার কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اٰمِنُوْا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ـ

"হে কিতাবপ্রাপ্ত লোক সকল ! আমাদের অবতীর্ণ এ কিতাবের (কুরআন) প্রতি ঈমান আনো যা তোমাদের কাছে রক্ষিত গ্রন্থাবলীর সত্যতা স্বীকার করে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪৭)

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ○ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ (المائدة : ١٥-١٦)

"হে কিতাবধারীগণ ! তোমাদের কাছে আমাদের নবী এসেছেন ; তিনি তোমাদের জন্যে এমন অনেক জিনিস প্রকাশ করে দিচ্ছেন, যা তোমরা কিতাব থেকে গোপন করছিলে আর অনেক বিষয়ে ক্ষমাও করে দিচ্ছেন। তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে জ্যোতি এবং স্পষ্টবাদী কিতাব এসেছে ; এর মাধ্যমে আল্লাহ এমন লোকদেরকে শান্তির পথ প্রদর্শন করেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরণ করে এবং তিনি নিজ অনুমতিক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে টেনে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল-সোজা পথ প্রদর্শন করেন।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১৫-১৬)

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ ج وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلاَّ الْفٰسِقُوْنَ ـ (البقرة : ٩٩)

"আমরা তোমার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি এবং তা কেবল ফাসেক লোকেরাই অবিশ্বাস করে থাকে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৯৯)

কুরআন সংক্রান্ত বিস্তৃত প্রত্যয়

যে গ্রন্থকে মানুষের জন্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের নির্ভুল পথনির্দেশক আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং যাকে বাস্তব জীবনের জন্যে অবশ্য পালনীয় বিধানরূপে

নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তার অনুসরণ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হতে পারে না, যতক্ষণ মানুষ তার অভ্রান্ত ও সত্যাশ্রয়ী হবার এবং সকল দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত হবার দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ না করবে। কারণ তার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে যদি কোনরূপ সন্দেহ জাগ্রত হয়, তবে তার ওপর তার আস্থা ও নিশ্চিন্ততা থাকবে না এবং পূর্ণ নির্ভরতার সাথেই তার অনুসরণ করা যাবে না। এ কারণেই কুরআনের প্রতি ঈমানের (ঈমান বিল কুরআনের) আবশ্যিক অঙ্গগুলো খোদ কুরআন মজীদেই বিবৃত করে দেয়া হয়েছে। যথা ঃ

এক ঃ কুরআন যে অর্থে অবতীর্ণ হয়েছিলো, সেই অর্থেই সুরক্ষিত রয়েছে। কোনরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি তাতে হয়নি। এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ সাক্ষ্য বহন করছে ঃ

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝

"একে সংগ্রহ করা এবং পড়িয়ে দেয়া আমাদের কাজ ; অতএব আমরা যখন একে পড়ি, তখন তুমি সেই পড়ার অনুসরণ করো। পরন্তু এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমাদের কাজ।"–(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ১৭-১৯)

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى ۝ اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰهُ ط ـ(الاعلى : ٦ـ٧)

"আমরা তোমাকে এমনভাবে পড়াব যে, তুমি ভুলতে পারবে না—অবশ্য আল্লাহ যা ভুলাতে চান তার কথা স্বতন্ত্র।"–(সূরা আল আ'লা ঃ ৬-৭)

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ (الحجر : ٩)

"এ 'জিকর'কে (কুরআন) আমরাই নাযিল করেছি আর আমরাই এর সংরক্ষণকারী।"–(সূরা আল হিজর ঃ ৯)

وَاتْلُ مَآاُوْحِىَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ ج لَامُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِهٖ ج

"তোমার প্রতি তোমার প্রভুর তরফ থেকে যা কিছু অহী পাঠানো হয়েছে তার তেলাওয়াত করো ; তার কথা পরিবর্তন করার সাধ্য কারো নেই।"
–(সূরা আল কাহাফ ঃ ২৭)

দুই ঃ কুরআনের অবতরণে কোন শয়তানী শক্তির বিন্দু পরিমাণও দখল নেই।

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ۝ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ ۝ (الشعراء : ٢١٠ـ٢١٢)

"একে নিয়ে শয়তান অবতরণ করেনি ; এ কাজ তাদের করারও নয় আর তারা করতেও পারে না। বরং তাদেরকে অহী শোনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে।"–(সূরা আশ শুয়ারা ঃ ২১০-২১২)

তিন ঃ কুরআনে খোদ নবীর কামনা-বাসনারও স্থান নেই।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ۝ (النجم : ٣-٤)

"তিনি নিজের খুশী মতো কিছু বলছেন না, বরং এ হচ্ছে তার প্রতি অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ (অহী) মাত্র।"–(সূরা আন নাজম ঃ ৩-৪)

চার ঃ কুরআনে মিথ্যা ও অসত্যের আদৌ ঠাঁই নেই।

وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۝ لاَّيَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهٖ ط تَنْزِيْلٌ

مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ۝ (حم السجدة : ٤١-٤٢)

"নিশ্চিতরূপে এ এক সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত কিতাব ; মিথ্যা না এর সামনে থেকে আসতে পারে, না পারে পেছন থেকে। এ এক প্রাজ্ঞ ও প্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।"–(সূরা হা-মীম-আস সাজদাহ ঃ ৪১-৪২)

পাঁচ ঃ কুরআন আগাগোড়া সত্য ; কোন আন্দাজ-অনুমান নয়, বরং প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে এ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে কোন বক্রতা ও কুটিলতার স্থান নেই ; এ মানুষকে সোজা পথ দেখিয়ে দেয়।

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ لا وَيَهْدِىْ

اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ (سبا : ٦)

"যারা জ্ঞানবান লোক, তারা তোমার প্রতি তোমার প্রভুর কাছ থেকে অবতীর্ণ এ কিতাবকে মনে করে যে, এ-ই হচ্ছে সত্য ; এ মানুষকে পরাক্রান্ত ও প্রশংসিত আল্লাহর দিকে চালিত করে।"–(সূরা সাবা ঃ ৬)

وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ۝ (الحاقة : ٥١)

"নিসন্দেহে তা নিশ্চিত সত্য।"–(সূরা আল হাক্কা ঃ ৫১)

وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنٰهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

"আমরা তাদের কাছে এমন একখানি কিতাব নিয়ে এসেছি, যাকে আমরা প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে মু'মিনদের জন্যে বিস্তৃত হেদায়াত ও রহমত স্বরূপ বানিয়েছি।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৫২)

قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِىْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط -(الفرقان : ٦)

"হে মুহাম্মদ ! বলে দাও যে, যিনি আসমান ও জমিনের সমস্ত রহস্য জানেন, এ কিতাব তিনিই নাযিল করেছেন।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬)

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ ج فِيْهِ ج -(البقرة : ٢)

"এ কিতাবে কোন কথাই সন্দেহের ভিত্তিতে বলা হয়নি।"

وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ○ قَيِّمًا -(الكهف : ١-٢)

"আল্লাহ তার মধ্যে কোন বক্রতা রাখেনি, তা একেবারে সোজা।"

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ -(بنى اسرائيل : ٩)

"নিসন্দেহে এ কুরআন এমন পথপ্রদর্শন করে, যা একেবারে সোজা।"

ছয় ঃ কুরআনের বিধি-বিধান ও শিক্ষা ধারায় কোন রদবদল করার কারো, এমন কি খোদ পয়গম্বরেরও নেই।

قُلْ مَايَكُوْنُ لِىْٓ اَنْ اُبَدِّلَهٗ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِىْ ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَايُوْحٰٓى اِلَىَّ ج اِنِّىْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّىْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○(يونس : ١٥)

"(হে মুহাম্মদ !) বলে দাও, আমি এ কিতাবকে নিজের তরফ থেকে বদলাবার অধিকারী নই। আমি তো কেবল সেই অহীরই আনুগত্য করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করি তো আমার কঠিন দিন সম্পর্কে ভয় হয়।"–(সূরা ইউনুস ঃ ১৫)

সাত ঃ যে জিনিস কুরআনের পরিপন্থী, তা মোটেই অনুসরণ যোগ্য নয়।

اِتَّبِعُوْا مَآاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ط

"যা কিছু তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ করো এবং তাকে ছেড়ে অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের মাত্রই অনুসরণ করো না।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩)

এ হচ্ছে কুরআন মজীদ সম্পর্কে ইসলামের বিস্তৃত প্রত্যয় এবং এর প্রতিটি অংশের প্রতি বিশ্বাস পোষণই অত্যাবশ্যক। যার প্রত্যয়ের মধ্যে এর কোন একটি অংশেরও অভাব থাকবে সে কখনো কুরআনের নির্ভুল ও পূর্ণাংগ আনুগত্য করতে পারবে না। বরং সে 'ইসলাম' নামক সোজা পথ থেকেই বিচ্যুত হয়ে যাবে।

ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর

এক কিতাব ও এক রসূলের প্রতি ঈমান, তারই আনুগত্য-অনুসরণ, তারই গড়া ছাঁচে মানসিকতার পুনর্গঠন, সেই এক উৎস থেকে গোটা আকীদা, ইবাদাত, নৈতিকতা, লেনদেন ও সামাজিক বিধানের উৎসারণ এবং সেই ঈমান, আনুগত্য ও অনুসরণের সূত্রে গোটা মুসলিম সমাজের সংযুক্তিকরণই ইসলামকে একটি স্থায়ী সংস্কৃতি এবং সকল প্রকার বংশগত, ভাষাগত, বর্ণগত ও ভৌগলিক পার্থক্য সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করে। অবশ্য জ্ঞান-বুদ্ধি, অন্বেষণ, অনুসন্ধান, দৃষ্টিভংগি ও ঝোঁক প্রবণতার পার্থক্যের ফলে কুরআনের আয়াত ও রসূলের সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়নে এবং তাদের মর্ম ও লক্ষ্য অনুধাবনে পার্থক্য সূচিত হতে পারে। কিন্তু এ পার্থক্য হচ্ছে নেহাতই খুঁটিনাটি ও ছোটখাট বিষয়ের ; এটা ফিকাহ ও কালামশাস্ত্রের বিভিন্ন মযহাবকে আলাদা-আলাদা দ্বীন এবং তাদের অনুসারীদেরকে পৃথক পৃথক জাতিতে পরিণত করে না। ইসলামী মিল্লাতের আসল ভিত্তিমূল হচ্ছে আল্লাহর রসূল হিসেবে মুহাম্মদ (সা)-কে একমাত্র অনুসরণীয় রূপে বরণ করা এবং আল্লাহর কিতাব হিসেবে কুরআন মজীদকে একমাত্র আইন গ্রন্থ রূপে স্বীকার করা আর দু'টি জিনিসকেই গোটা আকীদা-বিশ্বাস ও আইনের উৎস বলে ঘোষণা করা। এ মৌলিক বিষয়ে যারা একমত, খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে যতই মতানৈক্য থাকুক, তারা সবাই মিলে এক জাতি। আর এ মৌলিক বিষয়ে যারা একমত নয়, তারা পরস্পরে যতো জাতিতেই বিভক্ত হোক, কুরআনের দৃষ্টিতে তারা একটি ভিন্ন জাতি।

বস্তুত যেসব বিষয়ের ওপর ইসলামের ভিত্তি নির্ভরশীল, কুরআন হচ্ছে তার পূর্ণাংগ সংকলন। যে ব্যক্তি কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে, সে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর নবী এবং পরকালের প্রতিও ঈমান এনেছে। কারণ এ গোটা ঈমানিয়াতের বিস্তৃত বিবরণ কুরআনেই বর্তমান রয়েছে। আর 'ঈমান বিল কুরআনের' (কুরআনের প্রতি ঈমান) নিশ্চিত সুফল হলো মানুষের পরিপূর্ণ ঈমান লাভ। এভাবে কুরআন মজীদে ইসলামী শরীয়তের সকল মূলনীতি ও মৌল বিধানও উল্লেখিত রঁয়েছে এবং সেসব নীতি ও বিধানকে শরীয়ত প্রণেতা নিজের কথা ও কাজ দ্বারা সুস্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি নির্ভুল ঈমানের সাথে কুরআন ও সুন্নাতে রসূলকে জীবনের যাবতীয় বিষয়াদিতে অবশ্য পালনীয় আইন বলে ঘোষণা করে, সে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে মুসলমান। আর এহেন ঈমান ও আইন পালনের সমষ্টিকেই বলা হয় ইসলাম। যেখানে এ দু'টি জিনিস বর্তমান থাকবে সেখানে ইসলামও থাকবে। আর যেখানে এ দু'টি থাকবে না, সেখানে ইসলামও থাকবে না।

৭. শেষ দিবসের প্রতি ঈমান

শেষ দিবস বলতে বুঝায় মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। এ জন্যে একে পরকালের জীবন এবং পরলোকও বলা হয়। কুরআন মজীদে সম্ভবত এমন কোন পৃষ্ঠাই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাতে এই পরকালের কোন উল্লেখ নেই। নানাভাবে ও ভঙ্গিতে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে এবং একে মানুষের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা হয়েছে। এর সত্যতা সম্পর্কে যুক্তি-প্রমাণ দেয়া হয়েছে। এর বিস্তৃত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানানো হয়েছে। স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে ঃ যে ব্যক্তি এই শেষ জীবনের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, তার সমস্ত কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যায় ঃ

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ـ (الاعراف : ١٤٧)

"বস্তুত আমাদের নিদর্শনসমূহকে যে কেউ মিথ্যা মনে করবে এবং পরকালে কাঠগড়ায় দাঁড়ানোকে অস্বীকার করবে তার সকল আমল নষ্ট হয়ে গেল।"-(সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৪৭)

قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِلِقَاءِ اللّٰهِ ـ (الانعام : ٣١)

"ক্ষতিগ্রস্ত হলো সেসব লোক যারা আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাত হওয়ার সংবাদকে মিথ্যা মনে করেছে।"-(সূরা আল আন'আম ঃ ৩১)

বস্তুত যে পরকাল বিশ্বাসকে এতোটা গুরুত্ব সহকারে পেশ করা হয়েছে, তাকে মানব মনে স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভূত কতিপয় প্রশ্নের জবাব বলা যেতে পারে।

কতিপয় স্বাভাবিক প্রশ্ন

মানুষ সুখের চেয়ে বেশী দুঃখ এবং আরামের চেয়ে বেশী কষ্ট-ক্লেশ অনুভব করে। আর এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, যে জিনিস মানুষের অনুভূতিকে বেশী আঘাত করে, তা ততোবেশী তার চিন্তাশক্তিকে ক্রিয়াশীল করে তোলে। আমরা যখন কোন জিনিস লাভ করি, তখন তার খুশীতে এটা চিন্তা করেই দেখি না যে, এটা কোত্থেকে এলো কিভাবে এলো এবং কদ্দিন থাকবে ? কিন্তু কোন জিনিস যখন আমাদের হারিয়ে যায়, তখন তার শোকাঘাত আমাদের চিন্তাশক্তির ওপর এক প্রচণ্ড চাবুক লাগিয়ে দেয় এবং আমরা তখন ভাবতে থাকি ঃ এটা কি করে হারানো গেলো ? কোথায় গেলো ? কোথায় রয়েছে ? এটা কি আর কখনো পাওয়া যাবে ? এ কারণেই জীবন এবং তার উন্মেষের প্রশ্ন আমাদের কাছে ততোবেশী গুরুত্ব রাখে না, যতোটা গুরুত্ব

রাখে মৃত্যু এবং তার পরিণতি সংক্রান্ত প্রশ্ন। যদিও দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ এবং এতে নিজের অস্তিত্ব দেখে আমাদের মনে অবশ্যই এ প্রশ্ন জাগে যে, এটা কি রকমের হট্টগোল ? এটা কিভাবে সৃষ্টি হলো ? কে সৃষ্টি করলো ? কিন্তু এ সবকিছু হচ্ছে আসল মুহূর্তের চিন্তা ! বিশিষ্ট ও প্রগাঢ় চিন্তাশীল লোকেরা ছাড়া সাধারণ লোকেরা এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় না। পক্ষান্তরে মৃত্যু ও তার তিক্ততার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিটি মানুষকেই। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই এমন বহু সময় আসে, যখন সে নিজ চোখের সামনে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে। অসহায় ও দুর্বল লোকেরাও মৃত্যুবরণ করে, শক্তিমান ও শক্তিশালী ব্যক্তিরাও মৃত্যুবরণ করে। দুঃখজনক মৃত্যুও সংঘটিত হয়, শিক্ষামূলক মৃত্যুও ঘটতে দেখা যায়। এভাবে সবাইকে চলতে দেখে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে নিজেরও এ যাত্রা পথে চলার দৃঢ়প্রতীতি জন্মে। এসব দৃশ্য দেখে মৃত্যুর প্রশ্ন মনে তোলপাড় সৃষ্টি করে না—মৃত্যু জিনিসটা কি, মানুষ এ দরজা অতিক্রম করে কোথায় যায়, এ দরজার পিছনে কী রয়েছে, বরং সত্যই কিছু আছে কিনা—এসব প্রশ্ন আলোড়িত করে তোলে না, এমন মানুষ হয়তো খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

এটা তো সাধারণ ও অসাধারণ সবারই ভেবে দেখা একটি সাধারণ প্রশ্ন। একজন মামুলি কৃষক থেকে শুরু করে এক বিরাট দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক পর্যন্ত সবাই এ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে থাকে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আরো কতিপয় প্রশ্ন রয়েছে, যা প্রায় প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে খোঁচাতে থাকে এবং জীবনের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা এ খোঁচানীকে আরো বাড়িয়ে দেয়। দুনিয়ায় আমাদের এ কয়েক বছরের জীবন, এর প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি দণ্ড কোন না কোন কাজে, কোন না কোন চেষ্টায় ব্যয়িত হয়। যাকে আমরা স্থিতি মনে করি, তাও একরূপ গতি। যাকে আমরা বেকার মনে করি, তাও এক প্রকার কাজ। এর প্রতিটি কাজে ভালো কাজের ফল ভালো এবং মন্দ কাজের ফল মন্দ হওয়া একান্তই আবশ্যক। সৎ প্রচেষ্টার সুফল এবং অসৎ প্রচেষ্টার কুফল অবশ্যই প্রকাশ পাওয়া উচিত। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনে আমাদের সকল প্রচেষ্টার পরিণতি, যাবতীয় প্রয়াসের ফলাফল সমস্ত ক্রিয়া-কর্মের প্রতিদান কি আমরা পেয়ে থাকি ? একজন দুষ্কৃতিকারী সমগ্র জীবন দুষ্কর্মের মধ্যে অতিবাহিত করেছে। কোন কোন দুষ্কর্মের ফল সে নিসন্দেহে দুনিয়ায় লাভ করেছে। কোন দুষ্কর্মের ফলে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কোন দুষ্কর্মে সে দুঃখ-কষ্ট, মুসীবত ও অশান্তিতে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সেই সাথে বহু দুষ্কর্মের পুরোপুরি ফল সে এ দুনিয়ায় ভোগ করেনি। বহু দুষ্কর্ম লোক চক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে, যার ফলে তার দুর্নাম এবং অপমান পর্যন্ত হয়নি। আর দুর্নাম হয়ে থাকলেও যে বেচারার

ওপর সে যুলুম করেছিলো, তার ক্ষয়-ক্ষতির কী প্রতিকার হলো ? তাহলে এ দুষ্কৃতিকারীর এহেন যুলুম-পীড়ন এবং অসহায় মযলুম লোকদের ধৈর্য-স্থৈর্য কি বিফলে যাবে ? এ সবের কোন ফলাফল কি কখনো প্রকাশ পাবে না ?

সৎকর্মের অবস্থাও হচ্ছে অনুরূপ। বহু সৎলোক জীবন ভর সৎকাজ করে গেছে এবং তার পুরোপুরি সুফল তারা দুনিয়ায় পায়নি। বরং কোন কোন সৎকর্মের ফলে তাদের উল্টো দুর্নাম ও অপমান সইতে হয়েছে। কোন সৎ-কাজের জন্যে তাদের নিপীড়ন করা হয়েছে। কঠোর দণ্ড দেয়া হয়েছে। আর কোন কোন সৎকর্ম তো দুনিয়ার সামনেই প্রকাশই পায়নি। তাহলে এ বেচারাদের সমস্ত সৎকাজ কি বিফলে গেছে ? এতো কঠিন শ্রম ও প্রচেষ্টার পর তারা চিত্তের প্রশান্তি লাভ করেছেন—কেবল এটুকু ফলাফলই কি যথেষ্ট ?

এ প্রশ্নটি তো শুধু ব্যক্তি ও ব্যষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এরপর জাতি, শ্রেণী, বস্তু এবং এ গোটা দুনিয়ার পরিণামের সাথে সম্পৃক্ত আরো একটি প্রশ্ন রয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষ মরে যাচ্ছে এবং তার স্থলে অন্য মানুষ জন্মগ্রহণ করছে। গাছ-পালা পশু-পাখীর বিলুপ্তি ঘটছে, আবার তাদের স্থলে অন্য গাছ-পালা ও পশু-পাখী উৎপন্ন হচ্ছে। কিন্তু জন্ম ও মৃত্যুর এ ধাপ কি এমনই অব্যাহত থাকবে ? এ কি কোথাও গিয়ে শেষ হবে না ? এই যে হাওয়া, পানি, মাটি, আলো, উত্তাপ তথা প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সাহায্যে গোটা বিশ্ব কারখানা এক বিশেষ ধারায় পরিচালিত হচ্ছে, সবই কি অবিনশ্বর ? এ সবের জন্যে কি কোন আয়ুষ্কাল নির্ধারিত নেই ? এদের নিয়ম-শৃংখলা ও বিন্যাস ব্যবস্থায় কি কোন পরিবর্তন সূচিত হবে না ?

ইসলাম এ সকল প্রশ্নেরই সুষ্ঠু সমাধান করে দিয়েছে। বস্তুত পরকালীন জীবনের বিশ্বাস হচ্ছে এ প্রশ্নাবলীরই স্বাভাবিক জবাব। কিন্তু এ সমাধান, এর সত্যতা এবং এর নৈতিক ও তামাদ্দুনিক ফলাফল সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে খোদ মানুষ এসব প্রশ্নের সমাধান প্রচেষ্টায় কতখানি সফলকাম হয়েছে, তা যাচাই করে দেখা দরকার।

পরকালীন জীবনের অস্বীকৃতি

একদল বলেন যে, জীবন বলতে যা কিছু বুঝায়, তা এ দুনিয়ার জীবনেই শেষ। মৃত্যুর মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, এরপর জীবন চেতনা, অনুভূতি ও কর্মফল বলতে কিছু নেই।

اِنَّ هٰـؤُلَاۤءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۝ اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ

"এই লোকেরা বলে আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আরতো কিছুই নেই। তারপর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে না।"–(সূরা দোখান ঃ ৩৪-৩৫)

وَقَالُوْا مَاهِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلاَّ الدَّهْرُ ج

"এই লোকেরা বলে ঃ জীবন তো শুধু আমাদের এই দুনিয়ারই জীবন। জীবন ও মৃত্যু সবতো এখানেই। আর কালের আবর্তন ছাড়া আমাদেরকে আর কেউ ধ্বংস করে না।"-(সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৪)

পক্ষান্তরে এ বিশ্বকারখানা যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলতে থাকবে অনন্তকাল ধরে। এর নিয়ম-শৃংখলা এমন যে, এ কখনো বিপর্যস্ত হবার নয়।

যারা এ ধরনের কথা বলে, তারা কোন জ্ঞান সূত্রের সাহায্যে এ প্রমাণ্য তথ্য জানতে পেরেছেন যে, মৃত্যুর পর বাস্তবিকই কিছু নেই এবং এ বিশ্ব কারখানা সত্য সত্যই অবিনশ্বর—এ ভিত্তিতেই তারা একথা বলেন না। বরং তারা শুধু নিজেদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর নির্ভর করে একথা বলছেন। তাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ হলো এই যে, মৃত্যুর পরবর্তী কোন অবস্থা তারা অনুভব করেননি। আর বিশ্ব ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবার কোন লক্ষণও তারা দেখতে পাননি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কোন জিনিসকে অনুভব না করাই কি তার অস্বীকৃতির জন্যে যথেষ্ট প্রমাণ ? তাহলে আমাদের অনুভূতিই কি বস্তুর অস্তিত্ব এবং অনুভূতিহীনতাই কি তার অনস্তিত্ব নির্দেশ করে ? তাই যদি হয় তো আমি বলবো ঃ যে জিনিসটি আমি যখন অনুভব করি, আসলে তখনি তা জন্মলাভ করে আর যখন তা আমার অনুভূতির বাইরে চলে যায়, তখন তার স্বাভাবিক বিলুপ্তিও ঘটে। আমি যে দরিয়াকে বইতে দেখেছিলাম, তার সৃষ্টি হয়েছে তখনি, যখন আমি তাকে বইতে দেখেছি, আর যখন তা আমার দৃষ্টি পথ থেকে অপসৃত হয়েছে, তখন তার অস্তিত্বও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি আমার এহেন উক্তিকে নির্ভুল বলে মেনে নিবে ? তা যদি না হয় তাহলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ উক্তিকে কিভাবে সত্য বলে মানতে পারে যে, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা যেহেতু আমাদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার কাছে ধরা পড়েনি, এ কারণেই মৃত্যুর পর আর কোন অবস্থাই নেই।

পরন্তু মৃত্যু ও ধ্বংস সম্পর্কে নিছক ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেমন ভুল, তেমিন জীবন ও অস্তিত্ব সম্পর্কেও নিছক ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সে সবের কোন ভিত্তি নেই। আমরা এ বিশ্ব ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত হতে দেখেনি বলেই যদি এর চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর হবার সিদ্ধান্ত নির্ভুল হয়, তাহলে আমিও এক মযবুত ইমারত দেখে বলতে পারি যে, এটি চিরকাল কায়েম থাকবে ; কারণ আমি একে ধ্বসে পড়তেও দেখিনি কিংবা ভবিষ্যতে ধ্বসে পড়ার ইঙ্গিতবহ কোন ফাটল তো আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমার এ যুক্তিধারা কি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে ?

চরিত্রের ওপর পরকাল-অবিশ্বাসের প্রভাব

দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ আজ এ ব্যাপারে প্রায় একমত যে, এ বিশ্ব ব্যবস্থা একদিন না একদিন অবশ্যই বিপর্যস্ত হবে। বিশ্বের চিরন্তনতা সংক্রান্ত প্রাচীন মতবাদের প্রবক্তা সম্ভবত আজ আর পণ্ডিত মহলে কেউ নেই। কিন্তু তবু মৃত্যুকেই চূড়ান্ত ধ্বংস আখ্যা দান করার মতো লোক এখনো অনেক রয়েছে এবং উপরিউক্তি অযৌক্তিক ধারণাই হচ্ছে তাদের এ মতবাদের ভিত্তি। কিন্তু এর অযৌক্তিকতার কথা বাদ দিলেও এ একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, এ মতবাদ দ্বারা মানুষ কখনো চিত্তের প্রশান্তি লাভ করতে পারে না। বরং জীবনের ঘটনাবলী দেখে মানব মনে যেসব প্রশ্নের উদ্ভব হয়, এ মতবাদে তার বেশীর ভাগ প্রশ্নেরই সমাধান বাকী থেকে যায়। সর্বোপরি মানুষের জীবন ও চরিত্র গঠনের ভিত্তি এ মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে তা অবশ্যই দু'টি অবস্থার সম্মুখীন হবে। প্রথমত, অবস্থা প্রতিকূল হলে এ মতবাদের ফলে এক প্রচণ্ড রকমের নৈরাশ্য, হতাশা ও উৎসাহহীনতা মানুষের ওপর চেপে বসবে। কারণ মানুষ যখন তার সৎকাজের কোন পরিণাম ফল দুনিয়ায় দেখতে পাবে না, তখন তার কর্মশক্তি শিথিল ও স্তিমিত হয়ে যাবে। যখন সে অন্যায় যুলুমের কোন প্রতিকারের উপায় দেখবে না, তখন তার মনোবল ভেঙে পড়বে। যখন সে দুনিয়ায় দুষ্কৃতি কদাচার ও যুলুমের বিকাশ-বৃদ্ধি দেখবে, তখন স্বতই ভাববে যে, সৃষ্টি জগতে সাফল্য ও সমৃদ্ধি শুধু দুষ্কৃতিরই আর কল্যাণ ও সৎকাজের জন্যে রয়েছে শুধু অবনতি। পক্ষান্তরে অবস্থা অনুকূল হলে মানুষ এ মতবাদের প্রভাবে এক আত্মপূজারী পশুতে পরিণত হবে। সে ভাববে যেদিনটি বিলাস-ব্যসনে ও সুখ-সম্ভোগে অতিবাহিত হবে, কেবল তাই হবে সার্থক। দুনিয়ার কোন রসাস্বাদ ও সুখ-সম্ভোগ থেকে যদি সে বঞ্চিত হয়, তাহলে তা পূরণ করার মতো কোন জীবন আর ফিরে পাবে না। কাজেই সে নির্বিচারে যুলুম-পীড়ন চালাবে। লোকদের অধিকার হরণ করবে। নিজের কল্যাণ লাভ এবং প্রবৃত্তির বাসনা পূরণের জন্যে নিকৃষ্টতম কাজ করতেও সে পরোয়া করবে না। এহেন ব্যক্তির ধারণায় বড়োজোর সেই সব সৎকাজ, ভদ্রতা ও শালীনতাই স্থান পাবে, যা দ্বারা তার সুনাম, সুখ্যাতি, সম্মান কিংবা অন্য কোনরূপ পার্থিব কল্যাণ অর্জিত হবে। অনুরূপভাবে যেসব অপরাধ ও পাপাচারের পরিণাম ফল কোন পার্থিব শাস্তি, দৈহিক পীড়ন কিংবা বৈষয়িক ক্ষতিপূরণ আত্মপ্রকাশ করতে পারে, কেবল সেগুলোকেই সে অপরাধ ও পাপাচার বলে গণ্য হবে। আর যেসব সৎকাজের কোন সুফল এ দুনিয়ায় প্রকাশ পাবার নয়, তার দৃষ্টিতে সেগুলো করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু হবে না। আর যেসব দুষ্কৃতির কোন ক্ষতি এ দুনিয়ায় বরণ করার নয়, তার দৃষ্টিতে সেগুলো ঠিক পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হবে।

যদি কোথাও গোটা সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা এমন মতবাদ ও মানসিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তার সম্পূর্ণ নৈতিক ধ্যান-ধারণাই বদলে যাবে।

তার গোটা নৈতিক ব্যবস্থা স্বার্থপরতা ও আত্মপূজার বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে সৎকাজ হবে পার্থিব কল্যাণের সমার্থক আর দুষ্কৃতি হবে বৈষয়িক ক্ষতির নামান্তর। সেখানে মিথ্যা যদি পার্থিব ক্ষতির কারণ হয় তবেই তা হবে গোনাহ বলে বিবেচিত আর কল্যাণের মাধ্যম হলে তা হবে ঠিক পুণ্যের কাজ বলে সাব্যস্ত। সততা যদি দুনিয়ায় কল্যাণ লাভের মাধ্যম হয় তো তা হবে সুকৃতি, আর ক্ষতিকর হলে তার চেয়ে বড়ো দুষ্কৃতি আর কিছুই হবে না। বিলাস-ব্যসন ও সুখ-সম্ভোগের জন্যে ব্যভিচার হবে আশীর্বাদ স্বরূপ আর যদি তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবেই তা হবে আপত্তিকর জিনিস। ফলকথা, এ পার্থিব জীবনের পর কোন ভালো কিংবা মন্দ পরিণাম দেখা দেয়ার ভয় কিংবা আশা যেখানে না থাকে, সেখানে মানুষ শুধু এ দুনিয়ায় প্রকাশ পাবার মতো কর্মফলের প্রতিই লক্ষ্য রাখবে এবং এতে করে তার ক্রিয়া-কর্মের নৈতিক মূল্যবোধে এমন পরিবর্তন সূচিত হবে, যা আদৌ কোন সভ্য সমাজের উপযোগী হতে পারে না। বরং একথা বলাই অধিকতর সমীচিন হবে যে, এহেন নৈতিক মূল্যমান নিয়ে কোন মানব গোষ্ঠীর পক্ষে পশুর চেয়েও নিকৃষ্টতর পর্যায়ে না নেমে উপাই নেই।

কেউ বলবেন যে, শাস্তি ও পুরস্কারের জন্যে দুনিয়ায় শুধু বৈষয়িক ও দৈহিক লাভালাভই নয়, বরং মানুষের মধ্যে বিবেক নামক একটি শক্তিরও অস্তিত্ব রয়েছে। তার পীড়ন, তার আর্তনাদও এ দুনিয়ায় দুষ্কৃতির জন্যেও যথেষ্ট শাস্তি। আর তার প্রশান্তি মানুষের সৎকাজের জন্যে যথেষ্ট পুরস্কার। কিন্তু আমি বলবো দুনিয়ায় এমন বহু দুষ্কৃতি রয়েছে, যেগুলোর বৈষয়িক ফায়দা দেখেই মানুষ বিবেকের দংশন সহ্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়, আবার বহুত সৎকাজের জন্যে মানুষকে এতো কুরবানী করতে হয় যে, শুধু বিবেকের প্রশান্তিই তার যথেষ্ট পুরস্কার হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বিবেকের প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, কোন নৈতিক মতাদর্শ সৃষ্টি করা তার কাজ নয়, বরং এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর ফলে যে নৈতিক আদর্শ মানব মনে প্রবিষ্ট হয়, তার বিবেক তারই সমর্থন করতে শুরু করে। এ কারণেই একজন হিন্দুর বিবেক যেসব বিষয়ে পীড়িত বোধ করে, একজন মুসলমানের বিবেক সেসব বিষয়ে কোন পীড়া অনুভব করে না। কাজেই কোন সমাজের নৈতিক মতাদর্শ যদি বদলে যায় এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের মানদণ্ডও পরিবর্তিত হয়, তবে তার সাথে সাথে বিবেকের গতি মুখও ঘুরে যাবে। এ সমাজ যেসব ক্রিয়া-কাণ্ডকে অন্যায়ভাবে ছেড়ে দিবে, সে সবের জন্যে এর বিবেক কোনরূপ পীড়াবোধ করবে না আর যেসব ক্রিয়া-কাণ্ড সৎকাজ বলে স্বীকৃতি পাবে না, সে সবের জন্যে কোন প্রশান্তিও অনুভব করবে না।

জন্মান্তরবাদ

দ্বিতীয় দল জন্মান্তরবাদ পেশ করেছে। এর সারকথা হলো ঃ মৃত্যু অর্থ চূড়ান্ত ধ্বংস নয়, বরং দেহান্তর প্রাপ্তি মাত্র। আত্মা এ দেহ ত্যাগ করার পর অপর কোন দেহ অবলম্বন করে। আর মানুষ তার প্রথম জীবনে নিজস্ব কৃতকর্ম ঝোঁকপ্রবণতার বলে যে যোগ্যতা অর্জন করে, এ দ্বিতীয় দেহ কিংবা অধিকতর বিশুদ্ধ কথায় দ্বিতীয় খাঁচাটি তারই উপযোগী হয়ে থাকে। তার কৃতকর্ম যদি মন্দ হয় এবং তার প্রভাবে তার ভেতর নিকৃষ্ট যোগ্যতার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার আত্মা নিম্নমানের জৈবিক কিংবা উদ্ভিদ স্তরে নেমে যাবে। আর যদি ভাল কৃতকর্মের বলে সে ভালো যোগ্যতার সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে তার আত্মা উচ্চস্তরের দিকে উন্নীত হবে। ফলকথা, এ মতবাদ অনুসারে শাস্তি ও পুরস্কার সবকিছুই এ দুনিয়া এবং এ দেহজগতেই সীমাবদ্ধ। আত্মাগুলো শুধু পূর্ববর্তী কৃতকর্মের ফল ভোগ করার জন্যে বারবার এ দুনিয়ার খাঁচা বদল করে আসে।

এক কালে এ মতবাদটি খুবই জনপ্রিয় ছিলো। হযরত ঈসা (আ)-এর কয়েক শতক আগে গ্রীস দেশে পিথাগোরাস, আম্বেজুকলাশ প্রমুখ দার্শনিক এর প্রবক্তা ছিলেন। মিসরের প্রাচীন ইতিহাসেও এর কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহুদীদের মধ্যেও বহিপ্রভাবের ফলে জন্মান্তরবাদ ঢুকে পড়েছিলো। কিন্তু বর্তমানে এ মতবাদটি ভারতোদ্ভূত ধর্মগুলোতে (যথা ব্রাহ্মণ্যবাদ, বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ইত্যাদি) পাওয়া যায় কিংবা পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য অষ্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অসভ্য বা আধা সভ্য জাতিগুলোর মধ্যে দেখা যায়। বাকী সমস্ত সভ্য জাতিগুলো একে বর্জন করেছে। কারণ মানুষ এ পর্যন্ত জ্ঞান-বুদ্ধির উন্নতির ফলে দুনিয়া এবং এর জীবন ধারা সম্পর্কে যতোটা অবগতি লাভ করেছে, তা জন্মান্তরবাদের সকল ভিত্তিকেই অস্বীকার করে। খোদ ভারতোদ্ভূত ধর্মগুলোতে আমরা এ মতবাদের ইতিহাসের প্রতি দৃকপাত করলে দেখতে পাই যে, প্রাচীন বৈদিক ভারতে এ চিন্তাধারার কোন অস্তিত্বই ছিলো না। তখনকার আর্যরা বিশ্বাস করতো যে, মৃত্যুর পর মানুষ অপর এক জীবন লাভ করে, যা সৎকর্মশীলদের জন্যে সম্পূর্ণ আরামদায়ক আর দুষ্কৃতিকারীদের জন্যে সম্পূর্ণ কষ্টদায়ক। তারপর হঠাৎ করে এ মতবাদে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং পরবর্তী যুগের ভারতীয় সাহিত্যে জন্মান্তরবাদ এক দার্শনিক বিশ্বাস রূপে পাওয়া যায়। এ পরিবর্তনের কারণটা এখনো অনুসন্ধান করা হয়নি। কোন কোন গবেষকের ধারণা হচ্ছে এই যে, আর্যদের মধ্যে এ চিন্তাধারা এসেছে দ্রাবিড়দের কাছ থেকে। আর কেউ কেউ বলেন, এটা খোদ আর্যদের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বর্তমান ছিলো। পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ দার্শনিকরা একে তাদের কাছ থেকে নিয়ে ধ্যান-ধারণা ও আন্দাজ-অনুমানের এক বিরাট ইমারত গড়ে তুলেছেন। অনুরূপভাবে বৌদ্ধ সাহিত্যে জন্মান্তর সংক্রান্ত বিস্তৃত পরিকল্পনা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু গোড়ার দিকে এ ধর্মেও তার কোন অস্তিত্ব ছিলো না। প্রাচীন সাহিত্য থেকে জানা যায়, গোড়ার

দিকে বৌদ্ধ ধর্মের বিশ্বাস ছিলো ঃ জীব হচ্ছে একটি নদী বিশেষ, যা ক্রমাগত আবর্তন ও পরিবর্তনের সাথে বয়ে চলেছে। এ ধারণাটিই সামনে এগিয়ে এ রূপ গ্রহণ করলো যে, সমগ্র জগতে একই আত্মা এবং একই জীবন বর্তমান, যা আকৃতির পর আকৃতি এবং খাঁচার পর খাঁচা বদল করে যাচ্ছে। এর থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, গোড়ার দিকে অহী ও ইলহাম থেকে ভারতীয় জাতিগুলো যে জ্ঞান লাভ করেছিলো, তাকে বদলে ফেলে তারা এক দার্শনিক হেয়ালীপূর্ণ ধর্মমত আবিষ্কার করে নিয়েছে। আর এ মতবাদটি ছিলো সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজস্ব মনগড়া।

বুদ্ধিবৃত্তিক সমালোচনা

এখানে জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে কোন বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে জন্মান্তরবাদের বুনিয়াদটা যে সম্পূর্ণ বিচার-বুদ্ধির বিপরীত এবং জীবন ও জগত সম্পর্কে লব্ধ যাবতীয় মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপন্থী তা নির্দেশ করার জন্যে অন্তত এতটুকু আলোকপাত করা প্রয়োজন। জন্মান্তরবাদীদের ধারণা হলো ঃ প্রত্যেক ব্যক্তি এ দুনিয়ায়ই তার কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করে—সে ভালো কাজের ফলে জীবনের উচ্চস্তরে আরোহণ করে আর মন্দ কাজের ফলে নিম্নস্তরে অবতরণ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মানুষ যদি এ জীবনে মন্দ কাজ করে তো জৈবিক ও উদ্ভিদ স্তরে অবতরণ করবে। আর যদি জীবজন্তু তার জীবনে ভালো কাজ করে তো মানবীয় স্তরে আরোহণ করবে। এর অন্য অর্থ দাঁড়ায়, জৈবিক ও উদ্ভিদ জীবন হচ্ছে মানবীয় জীবনের মন্দ কাজের পরিণাম ফল আর মানবীয় জীবন হচ্ছে উদ্ভিদ ও জৈবিক জীবনের সৎকাজের ফল। অন্য কথায়, বর্তমানে যারা মানুষ, তাদের মানুষ হবার কারণ এই যে, পূর্বে তারা উদ্ভিদ ও জৈবিক জীবনে সৎকাজ করেছিলো। আর বর্তমানে যারা উদ্ভিদ ও জীবজন্তু তাদের এ দশা প্রাপ্তির কারণ এই যে, তারা মানবীয় জীবনে মন্দ কাজ করেছিলো। এ মতবাদটি মানতে হলে আরো কয়েকটি বিষয় জানার প্রয়োজন হয়ে পড়ে আর তা সবই হচ্ছে জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত। যেমন ঃ

এক ঃ জন্মান্তরের এ আবর্তন ধারার কোন আদি নির্ণয় করা যায় না। কারণ মানুষ হতে হলে তার আগে উদ্ভিদ ও জীবজন্তু হওয়া প্রয়োজন। আবার উদ্ভিদ ও জীবজন্তু হতে হলে তার আগে মানুষ হওয়া আবশ্যক। এরূপ অনাদি আবর্তন ধারাকে বিচার-বুদ্ধি অবাস্তব বলে ঘোষণা করে।

দুই ঃ জন্মান্তরের আবর্তন ধারা যদি অনন্ত হয়, তাহলে একথা মানতে হবে যে, বারংবার খাঁচা পরিবর্তনকারী আত্মাগুলোই শুধু নয়, বরং আত্মার জন্যে খাঁচা সরবরহকারী বস্তুগলোও অনন্ত হবে। আর এ পৃথিবী, এ সৌরমণ্ডল এবং এর ভেতরে ক্রিয়াশীল শক্তিনিচয়—এ সবই অনন্ত হবে। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি দাবি করে আর বৈজ্ঞানিক গবেষণাও এর সাক্ষ্য বহন করে যে, এ সৌরমণ্ডল অনাদিও নয়, অনন্তও নয়।

তিন ঃ একথাও মানতে হবে যে, উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানব জাতির যা কিছু বৈশিষ্ট্য তাহলো তাদের দৈহিক সৌন্দর্যের দিক থেকে, জীবনের দিক থেকে নয়। কারণ যে জীবন মানুষের খাঁচার মধ্যে গিয়ে বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি লাভ করেছে, পশুর খাঁচার মধ্যে গিয়ে তা-ই বুদ্ধিহীন হয়ে পড়েছে। আর উদ্ভিদের খাঁচার মধ্যে গিয়ে তো বেচারা ইচ্ছা ও কর্মশক্তিই হারিয়ে ফেলেছে।

চার ঃ যেসব কাজ ভেবে-চিন্তে ও সজ্ঞানে করা হয়, কেবল সেইসব কাজকেই ভালো-মন্দ ও সদসৎ আখ্যা দেয়া চলে। এ দৃষ্টিতে মানুষের কাজ-কর্ম সদসৎ হতে পারে এবং তার জন্যে শাস্তি ও পুরস্কারও দেয়া যেতে পারে ; কিন্তু উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর কাজকর্মকে যেমন সদসৎ আখ্যা দেয়া সঙ্গত নয়, তেমনি তার জন্যে শাস্তি বা পুরস্কার দেয়ারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এরূপ সিদ্ধান্ত করতে হলে একথাও মানতে হবে যে, উদ্ভিদ এবং জীবজন্তুর মধ্যেও ভেবে-চিন্তে ও সজ্ঞানে কাজ করার মতো শক্তি রয়েছে।

পাঁচ ঃ যদি পরবর্তী জীবন আমাদের বর্তমান জীবনের কৃতকর্মের ফল হয়, তাহলে স্বভাবতই মন্দ কাজের ফল মন্দ হওয়াই উচিত। আর দ্বিতীয় জীবনে যদি সেই মন্দ ফলই আমরা পাই, তাহলে সে মন্দ ফল থেকে আর ভালো কাজ সম্পাদিত হবে—এটা কি করে সম্ভবপর ? স্বভাবতই এর দ্বারা মন্দ কাজই সম্পাদিত হবে এবং তার ফল তৃতীয় জীবনে আরো মন্দ হবে। এভাবে দুষ্কৃতিকারী মানুষের আত্মা জন্মান্তরের আবর্তন ধারায় ক্রমাগত নীচের স্তরের দিকে নামতে থাকবে। এর পক্ষে আর কখনো ওপরে উঠে আসার প্রত্যাশা করা যেতে পারে না। এবং অন্য অর্থ দাঁড়ায় এই যে, মানুষ থেকে জীবজন্তু হতে পারে বটে, কিন্তু জীবজন্তু থেকে মানুষ হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, বর্তমানে মানুষ তারা কোন্ সৎকাজের ফলে মানুষ হয়েছে এবং কোত্থেকে এসেছে।[১]

সমাজ ও তমদ্দুনের ওপর জন্মান্তরবাদের প্রভাব

এ ছাড়াও আরো বহু কারণে সুস্থ বিচার-বুদ্ধি জন্মান্তরবাদকে গ্রহণ করতে পারে না। এ কারণেই মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে পরিমাণ উন্নতি করে যাচ্ছে, জন্মান্তরবাদ সে পরিমাণে পরিত্যক্ত হতে চলেছে। এমন কি, বর্তমানে বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে যেসব জাতি বেশী পশ্চাদপদ প্রধানত সেসব জাতির মধ্যেই এ মতবাদটি প্রচলিত। সেই সাথে এ সত্যও স্বীকার্য যে, জন্মান্তরবাদ মানুষের সৎসাহস ও মনোবল দমিয়ে দেয় এবং উন্নতির প্রাণ চেতনাকেও নিস্তেজ করে ফেলে। এ মতবাদ থেকেই মানুষের ব্যক্তিগত ও

---

১. জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে অধিকতর সমালোচনার জন্যে 'তাফহীমুল কুরআন' সূরা আল আ'রাফ ৩০ টীকা দেখুন।

জাতীয় জীবনের পক্ষে চরম ধ্বংসাত্মক 'অহিংসা' নীতির উদ্ভব ঘটেছে। যে জাতি এহেন নীতিতে বিশ্বাসী, তার যোদ্ধৃ ভাবধারা (Spirit) স্বভাবতই লুপ্ত হয়ে যায়। তাদের দৈহিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে যায়। বরং দৈহিক শক্তিকে বিকাশদানকারী উত্তম প্রেরণাগুলো থেকেই তারা বঞ্চিত হয়ে যায়। সে জাতির জনগণ শুধু দৈহিক দিক থেকেই নয়, মানসিক দিক থেকেও দুর্বল হয়ে পড়ে। এ দ্বিমুখী দুর্বলতার ফলেই তারা পরাভূত ও পদানত হয়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত হয় দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিংবা অন্যান্য শক্তিমান জাতিগুলোর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

জন্মান্তরবাদের দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে, তা সভ্যতা ও কৃষ্টির চির শত্রু। তা মানুষকে বৈরাগ্যবাদ ও সংসার ত্যাগের দিকে টেনে নিয়ে যায়। জন্মান্তরবাদীদের বিশ্বাস এই যে, কামনাই আত্মাকে পাপ পঙ্কিল করে তোলে। এর কারণেই আত্মা বারংবার দৈহিক খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে নিজ কৃতকর্মের পরিণাম ফল ভোগ করে থাকে। কাজেই মানুষ যদি কামনাকে দমন করে এবং নিজেকে দুনিয়া ও তার গোলক ধাঁধাঁয় জড়িয়ে না ফেলে, তাহলেই আত্মা জন্মান্তরের আবর্তন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। আর এটাই হচ্ছে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ। কারণ পার্থিব বিষয়াদিতে জড়িত হবার পর কামনা ও তার চাহিদা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এর অনিবার্য ফলাফল এ দাঁড়ালো যে, যারা মুক্তির পিয়াসী, তাদের সন্নাসী হয়ে বন-জঙ্গল কিংবা পাহাড়-পর্বতে চলে যেতে হবে ; আর যারা এরূপ করতে সম্মত না হবে, তাদের মুক্তি সম্পর্কে নিরাশ হয়ে জীবজন্তু ও উদ্ভিদের স্তরে অবতরণ করতে প্রস্তুত হতে হবে। এহেন ধারণা বিশ্বাস কি সভ্যতা ও কৃষ্টির উন্নতির ব্যাপারে কিছুমাত্র সহায়ক হতে পারে? আর কোন জাতি কি এহেন বিশ্বাস পোষণ করে দুনিয়ায় উন্নতি লাভ করতে পারে?

এতে সন্দেহ নেই যে, বিভিন্ন দিক থেকে জন্মান্তরবাদ অন্তত মৃত্যুকে চূড়ান্ত ধ্বংস বা চির প্রস্থান মনে করার চেয়ে উত্তম। কারণ মানুষের মধ্যে চিরস্থায়ী হবার একটা স্বাভাবিক আকাংখা রয়েছে, জন্মান্তরবাদে সে আকাংখা কতকটা নিবৃত্ত হতে পারে। সেই সাথে এ মতবাদে শাস্তি ও পুরস্কার এবং ভালো ও মন্দ কর্মফলের যে ধারণা রয়েছে তার ভিত্তিতে এ একটি উত্তম ও সুদৃঢ় নৈতিক বিধানের সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এ অনস্বীকার্য সত্যের দিকেও আমরা বারবার ইঙ্গিত করেছি যে, যে মতবাদ জ্ঞান-বুদ্ধির বিপরীত এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ, মানুষের মন ও মগজের ওপর তার বন্ধন সুদৃঢ় হতে পারে না—বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রমবিকাশের প্রত্যেক স্তরে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নতির প্রত্যেক পর্যায়ে সমান

শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আর তার বন্ধনই যখন কায়েম থাকতে পারে না, তখন শুধু বইয়ের পাতায় একটি দার্শনিক মতবাদ হিসেবে তার বর্তমান থাকাটা নৈতিক ব্যবস্থার স্থিতি ও সুদৃঢ়তার পক্ষে কিছুমাত্র উপকারী হতে পারে না। কারণ তা যখন বইয়ের পরিবর্তে অন্তরের পাতায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং লোকেরা পুরোপুরি তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করবে, কেবল তখনি তা উপকারী বলে সাব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয়ত, এ মতবাদ তার সর্বশেষ পরিণতির দিক থেকে নিজস্ব নৈতিক মূল্যও হারিয়ে ফেলেছে। কারণ এর ফলে একজন মানুষের বিশ্বাস জন্মে যে, জন্মান্তরের আবর্তন ধারা ঠিক একটি মেশিনের মতো এতে প্রত্যেক কাজের যে পরিণাম ফল নির্দিষ্ট রয়েছে তা আত্মপ্রকাশ করবেই — কোন অনুতাপ, মার্জনা কিংবা প্রায়শ্চিত্তের দ্বারাই তার প্রভাব ও ফলাফলকে বদলানো যেতে পারে না। এমতাবস্থায় একবার গোনাহ করে ফেললে এমন ব্যক্তি চিরদিনের জন্যে গোনাহর আবর্তে জড়িয়ে পড়বে ; তখন সে ভাববে ঃ আমায় যখন জানোয়ার বা উদ্ভিদ হতেই হবে, তখন এ মানবীয় জীবনের সমস্ত আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগ কেন প্রাণ ভরে উপভোগ করবো না ?

০

পারলৌকিক জীবনের বিশ্বাস

দুনিয়া ও মানুষের পরিণাম সম্পর্কে দু' শ্রেণীর সিদ্ধান্ত ওপরে পেশ করা হলো। এর থেকে এও জানা গেলো যে, এ দু'টি মত যেমন বিচার-বুদ্ধির দৃষ্টিতে নির্ভুল নয়, তেমনি দুনিয়ায় পতন ও ধ্বংসের নিদর্শনাদি দেখে মানব মনে স্বভাবত যেসব প্রশ্নের উদয় হয়, তার পুরোপুরি এবং সন্তোষজনক জবাবও প্রদান করে না। পরন্তু এক নির্ভুল ও সুদৃঢ় নৈতিক ব্যবস্থার সহায়তা করার মতো প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও এর মধ্যে বর্তমান নেই। এবার তৃতীয় মতটির কথা শোনা যাক। তাহলো ঃ

এক ঃ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের যেমন পৃথক পৃথক একটি আয়ুষ্কাল রয়েছে, যা উত্তীর্ণ হবার পর তার মধ্যে স্বভাবতই বিপর্যয় ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়, তেমনি এ বিশ্বজগতেরও একটি নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল রয়েছে, যা উত্তীর্ণ হবার পর এ গোটা বিশ্বকারখানাই চুরমার হয়ে যাবে এবং অন্য এক জগত এর স্থলাভিষিক্ত হবে, যার প্রাকৃতিক বিধান এর প্রাকৃতিক বিধান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে।

দুই ঃ এ বিশ্বজগত চূর্ণবিচূর্ণ হবার পর আল্লাহ তায়ালা একটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করবেন, সেখানে প্রত্যেক জিনিসেরই হিসেবে গ্রহণ করা হবে। মানুষ সেদিন এক নতুন দৈহিক জীবন লাভ করবে। সে আপন রবের সামনে হাযির

হবে। তার পূর্বেকার জীবনে কৃত সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সঠিকভাবেই যাচাই ও ওজন করা হবে। সত্য ও ইনসাফের সাথে তার মামলার বিচার করা হবে। সে ভালো কাজের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কাজের জন্যে শাস্তিলাভ করবে।

তিন ঃ মানুষের পার্থিব জীবন মূলত তার পারলৌকিক জীবনের ভূমিকা মাত্র। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী, সে জীবন চিরস্থায়ী। এটি অসম্পূর্ণ আর সেটি পূর্ণাঙ্গ। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে সমস্ত কাজের পুরোপুরি ফল প্রকাশিত হয় না। প্রতিটি অঙ্কুরই তার স্বাভাবিক বিকাশের সাথে এ অসম্পূর্ণ দুনিয়ায় ফলদান করতে পারে না। এ অসম্পূর্ণতা সেই দ্বিতীয় জীবনে পূর্ণতা লাভ করবে। পরন্তু যা কিছু এখানে নিষ্ফল ও অনর্থক রয়ে গেছে, তার প্রকৃত ফলাফল ও সার্থকতা সেখানে আত্মপ্রকাশ করবে। সুতরাং এ দুনিয়ার জীবনে আপন ক্রিয়াকর্মের যেসব অসম্পূর্ণ এবং কখনো কখনো প্রতারণাপূর্ণ ফলাফল প্রকাশিত হয়, মানুষের কেবল সে সবের প্রতিই লক্ষ্য রাখা উচিত নয়। বরং ফলাফলের এ পরিপূর্ণ ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখেই তার ক্রিয়াকর্মের মূল্যমান নির্ধারণ করা উচিত।

বস্তুত এহেন মত-ই আল্লাহর নবীগণ পেশ করে গেছেন। আর কুরআন মজীদ এর দিকেই মানব জাতিকে জোরালো ভাষায় আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু এ মতের নৈতিক ফলাফল এবং ইসলামী সংস্কৃতিতে এর মর্যাদা ও গুরুত্ব আলোচনার পূর্বে এর পিছনে কী যুক্তি-প্রমাণ রয়েছে এবং বিচার-বুদ্ধিই বা তা কতোখানি গ্রহণ করে সেইটে আমরা বিচার করে দেখতে চাই।

বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের নির্ভুল পন্থা

প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর পরে কোন জীবন আছে কিনা, এ প্রশ্নটি আমাদের ইন্দ্রিয় ও অনুভূতিলব্ধ অভিজ্ঞতার সীমা বহির্ভূত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আমরা বড়োজোর এটুকু অনুভব করি যে, যে ব্যক্তি কয়েক মুহূর্ত পূর্ব পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ এবং নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ করেছিলো, এখন সে জীবনের সমস্ত নিদর্শন থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। তার দেহ থেকে এমন কোন জিনিস অদৃশ্য হয়ে গেছে, যা এ নিথর, নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় পদার্থটিকে বিকাশ, বুদ্ধি ও গতিশীলতার উপযোগী শক্তি সঞ্চার করছিলো। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সে জিনিসটি কোথায় গেলো ? দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও কি তা বর্তমান রয়েছে, না অদৃশ্য হয়ে গেছে ? এবং এরপর আর কখনও কি এ দেহ কিংবা এরূপ আর কোন দেহের সাথে তার সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হবে ? আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও অভিজ্ঞতাজাত জ্ঞানের সাহায্যে এ প্রশ্নের কোন নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক জবাব আমরা দিতে পারি না। কারণ সে জিনিসটিকে কার্যত আমরা পূর্বেও কখনো অনুভব করিনি আর এখনো করি না। এ হিসেবে পূর্বাহ্নেই একথা বুঝে

নেয়া দরকার যে, এ প্রশ্নের সাথে বিজ্ঞান অর্থাৎ বাস্তব হেকমত বা অভিজ্ঞতা-জাত জ্ঞানের কোনই সম্পর্ক নেই। বিজ্ঞান যখন এ ব্যাপারে ইতিবাচক কোন সিদ্ধান্ত করতে পারে না, তখন নেতিবাচক কোন সিদ্ধান্ত করারও তার অধিকার নেই। বিজ্ঞান শুধু এটুকুই বলতে পারে যে, 'মৃত্যুর পর কি হয়, আমি জানি না।' কিন্তু সে যদি ন্যায়-নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে এ দাবী করে বসে যে, 'যেহেতু মৃত্যুর পর কি হয় আমি জানি না, সেহেতু আমি জানি যে, মৃত্যুর পর কিছুই হয় না'—তবে সে নিশ্চিতরূপে যুক্তিবাদের সীমা অতিক্রম করে যাবে।

ইন্দ্রিয়ানুভূতির পর আমাদের কাছে জ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে মননশীলত (تفكر)। মানুষ সর্বদাই নিজেকে ইন্দ্রিয়লব্ধ বস্তুর সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এসেছে। এবং তার মানসিক প্রকৃতি চিন্তা-শক্তিকে প্রয়োগ করে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের বাইরে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন সত্যগুলোকে জানার জন্যে দাবী জানিয়ে এসেছে। এ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানকেই বলা হয় 'মননশীলতা'। এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে ঃ

প্রথম পদ্ধতি হলো ঃ দুনিয়া এবং খোদ মানবীয় অস্তিত্বের নিদর্শনাদির প্রতি চোখ বন্ধ করে কিংবা অনেকখানি বেপরোয়া হয়ে নিরেট বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ের দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং শেষ পর্যন্ত বুদ্ধির ঘোড়দৌড়কে অব্যাহত রাখা। এ হচ্ছে কেবল অনুমান নির্ভর দর্শনের ক্ষেত্র এবং এ অন্ধকার মঞ্জিলই হচ্ছে সমস্ত বিভ্রান্তির উৎসস্থল। যেসব দার্শনিক মতবাদে লিপ্ত হয়ে মানুষ কল্পনার জগতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়, এখান থেকেই সেসব মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। এখান থেকেই আল্লাহ, ফেরেশতা, বিশ্বব্যবস্থা ও পরকালীন জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী মতবাদের উন্মেষ ঘটেছে—যা শুধু অন্ধকারে হাতড়ে চলা এবং আন্দাজ-অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে চলার ফল ছাড়া আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো ঃ বিশ্বপ্রকৃতি ও নিজের অস্তিত্বের প্রতি চোখ মেলে তাকিয়ে সত্য পথের মশাল বরদাররূপী নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ সকল প্রদীপ নিয়ে সুস্থ বিচার-বুদ্ধি ও নির্ভুল চিন্তা শক্তির সাহায্যে ঐ নিদর্শনাবলীর আড়ালে প্রচ্ছন্ন মৌলিক সত্য পর্যন্ত উপনীত হওয়া। এ পদ্ধতিতে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়েই মিলিতভাবেই অগ্রসর হয়। অবশ্য প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌঁছার সুনিশ্চিত পথ এটাও নয় ; কিন্তু আসমানী হেদায়াতের কথা বাদ দিলে মানুষের কাছে এটাই হচ্ছে সত্য সন্ধানের একমাত্র সূত্র। এবং এ সূত্রের সাহায্যে প্রকৃত সত্য কিংবা তার কাছাকাছি পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভবপর। অবশ্য তার জন্যে শর্ত এই যে, মানুষের পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রখর হতে হবে, আর

অনুভবশক্তি নির্মল ও তীক্ষ্ণ হতে হবে এবং তার মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার মত প্রচুর যোগ্যতা ও প্রতিভা থাকতে হবে। দার্শনিক মত অনুসারে মানুষের উন্নতি ও প্রগতি এ পর্যবেক্ষণ ও মননশীলতার সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে। আজকে যেসব মতবাদের ওপর দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত এবং যেসব মূলনীতির প্রতি বিশ্বাস পোষণ না করে বিজ্ঞানের কোন ছাত্র এক পা-ও সামনে এগোতে পারে না, তার কোন একটি জিনিসও নিছক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল নয়। বাস্তব যে বুদ্ধিবৃত্তিক ধারণার জন্যে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তার ওপরই প্রতিটি মতবাদ ও মূলনীতির ভিত্তি স্থাপিত। প্রাকৃতিক বিধান, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ নীতি, কার্যকারণ ধারা, আপেক্ষিকতার নীতি, বিবর্তনবাদ, যোগ্যতমের স্থায়ী হওয়ার নীতি ইত্যাকার যেসব মূলনীতি ও আইন-কানুনের ওপর বড়ো বড়ো দার্শনিকেরা বিশ্বাস পোষণ করেন, তা সবই হচ্ছে বহিদৃশ্য ও প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা ও বুদ্ধি-বৃত্তিক অনুমান প্রয়োগের ফল। নচেত আজ পর্যন্ত কেউ এসব বিধান ও মূলনীতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ করেনি।

তাছাড়া কোন বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পর্যবেক্ষণ থেকে একজন সাধারণ লোকের যতোটা বিশ্বাস জন্মে নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও অনুমান থেকে সিদ্ধান্তের প্রতি একজন দার্শনিকেরও ঠিক ততোটাই প্রত্যয় জন্মে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন বড়ো রকমের দার্শনিকও কোন অবিশ্বাসীকে ঐ সিদ্ধান্ত মানার জন্যে বাধ্য করতে পারে না। কারণ এক ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত দার্শনিকের মতোই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বহির্দৃশ্য ও বাহ্য নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ না করবে এবং দার্শনিকদের মতোই চিন্তা ও গবেষণা শক্তিকে প্রয়োগ না করবে, ততক্ষণ ঐরূপ সিদ্ধান্তে সে কিছুতেই পৌছতে পারবে না। কাজেই একজন সাধারণ লোকের পক্ষে দর্শনের পথে পদক্ষেপ করা এবং তাতে উন্নতি ও প্রগতি লাভ করার একমাত্র উপায় এ হতে পারে যে, দার্শনিকের বুদ্ধিমত্তা এ বিচক্ষণতার ওপর তার আস্থা হবে, নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা-ভাবনা থেকে লব্ধ সিদ্ধান্ত ছেড়ে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিই সে অদৃশ্য বিশ্বাস পোষণ করবে।

এ পূর্বাভাসটি হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নেয়া দরকার। কারণ অতিপ্রাকৃতিক বিষয়াদি সম্পর্কে কুরআন মজীদের বর্ণনা ও যুক্তিধারাকে বুঝতে হলে এ পূর্বাভাসটি উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। এটি না বোঝার ফলেই বহু প্রকার ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এবার আমরা পরকালীন জীবন সম্পর্কে কুরআন মজীদের বক্তব্যের প্রতি মনোনিবেশ করবো।

পরকালীন জীবন সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন

কুরআন মজীদ যখন পরকালীন জীবন সংক্রান্ত মতবাদ পেশ করে, তখন তার বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীরা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। তাদের সে প্রশ্নটি ছিলো ঠিক আজকের অবিশ্বাসীদেরই প্রশ্নের অনুরূপ। আর প্রকৃতপক্ষে এ সম্পর্কে একটি প্রশ্নই উত্থাপন করা সম্ভবপর। তাহলো এই যে, মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধি ও ধারণার বহির্ভূত কথা নয় কি ? যে মৃত ব্যক্তি পচে গলে মাটিতে মিশে গেছে, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটি, বাতাস ও পানিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, সে আবার জীবন লাভ করবে—এটা আমরা কি করে মেনে নিতে পারি ?

وَقَالُوٓا ءَ اِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَ اِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ؕ -(السجدة : ١٠)

"তারা বললো ঃ আমরা যখন মাটিতে বিলীন হয়ে যাবো, তারপর কি আমরা আবার নতুনভাবে জন্ম লাভ করবো ?"-(সূরা সাজদাহ ঃ ১০)

وَقَالُوا ءَ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَ اِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا○

"তারা বললো ঃ যখন মাংস গলে গিয়ে আমাদের শুধু হাড়-গোড় থেকে যাবে এবং আমরা গুড়ো গুড়ো হয়ে যাবো, তারপর কি আমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করে উঠানো হবে ?"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৯)

... ءَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ج ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ○(ق : ٣)

"আমরা মরে মাটিতে মিশে যাবার পর কি আবার উঠবো ? এরূপ প্রত্যাবর্তন তো বুদ্ধি ও ধারণার বহির্ভূত।"-(সূরা আল ক্বাফ ঃ ৩)

مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ○(يس : ٧٨)

"হাড়-গোড় পঁচে-গলে যাবার পর কে আবার তাঁকে জীবিত করবে ?"
-(সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮)

কুরআন মজীদের যুক্তিধারা

এ সন্দেহের মোকাবিলায় কুরআন মজীদ একটি অনুপম যুক্তিধারা অবলম্বন করেছে। তাহলো এই যে, কুরআন সর্বপ্রথম আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাদি পর্যবেক্ষণ করার এবং সে সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার দিকে লোকদের আহ্বান জানিয়েছে। সে বলছে ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ

"আমরা বিশ্বপ্রকৃতিতে এবং খোদ তাদের অস্তিত্বের মধ্যে আপন নিদর্শনাদি প্রত্যক্ষ করাবো, যাতে করে তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এটিই হচ্ছে সত্য।"–(সূরা হা-মীম আস সেজদা ঃ ৫৩)

أَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِيْ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ(الاعراف : ١٨٥)

"তারা কি আসমান ও জমিনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না ?"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৫)

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ○

"আসমান ও জমীনে বহু নিদর্শন রয়েছে যেগুলো তারা অতিক্রম করে যায়, কিন্তু সে সম্পর্কে তারা চিন্তা-ভাবনা করে না।"

–(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৫)

এ ইঙ্গিতের দ্বারা বলা হয়েছে যে, যেসব জিনিস মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয় থেকে প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সেগুলো চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করা কিংবা অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেগুলোর স্বরূপ নির্ণয় করার মতো শক্তি তাকে দেয়া হয়নি। অবশ্য দিন রাত তার সামনে পেশকৃত নিদর্শনাদি খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করলে, আসমান ও জমিনের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করলে খোদ নিজের পয়দায়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এবং এসব ইন্দ্রিয়গোচর ও পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যাবলীর সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে প্রকৃত সত্য পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করলে সে অনায়াসেই বুঝতে পারবে যে, যা কিছু বলা হয়েছে, তা নির্ভুল, যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত।

পরকালীন জীবনের সম্ভাবনা

তারপর এ বহির্দৃশ্য ও বাহ্য নিদর্শনাদির মধ্যে যে জিনিসগুলো সম্পূর্ণ রূপেই সুস্পষ্ট, কুরআন সেগুলোকে লোকদের সামনে পেশ করে এবং তা দ্বারা এ যুক্তি প্রদর্শন করে যে, যে বিষয়টিকে তোমরা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণার বহির্ভূত মনে করছো, তা তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণায় যতোই অসম্ভব বিবেচিত হোক —প্রকৃতপক্ষে তা মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়।

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ○(الرعد : ٢)

"সেই আল্লাহ তোমাদের নিকট দৃশ্যমান স্তম্ভ ছাড়াই আসমানকে সমুন্নত করে রেখেছেন, তারপর তিনি আরশের ওপর দীপ্তিমান হয়েছেন। তিনি

সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাবর্তী করেছেন। তাদের প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে গতিমান রয়েছে। তিনিই গোটা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেন। তিনি আপন নিদর্শনাদি স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে করে তোমরা আপন প্রভুর সাথে সাক্ষাতকার সম্পর্কে প্রত্যয়শীল হও।"–(সূরা আর রাদ ঃ ২)

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاۤءُ ط بَنٰهَا ○ (النازعات : ٢٧)

"তোমাদের সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন, না আসমান সৃষ্টি ? আল্লাহ তো (এতো বড়ো জিনিস) তৈরী করেছেন।"–(সূরা আন নাজিয়াত ঃ ২৭)

এসব আসমানী কদর নিদর্শনের দ্বারা এ সত্য প্রতিপন্ন করা হচ্ছে যে, একমাত্র আল্লাহ-ই এতোবড়ো বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। বড়ো বড়ো গ্রহ নক্ষত্রকে তিনি নিজস্ব আইনের বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন। তাঁর কুদরতই এ বিরাট জগতকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাহায্যে চালিত করেছে। ফলে কোন গ্রহই তার কক্ষ পথকে চুল পরিমাণ অতিক্রম করতে পারে না ; কিন্তু নিজেদের নির্ধারিত আয়ুষ্কাল থেকে মুহূর্তের জন্যেও বিচ্যুত হতে পারে না। তাঁর অসীম শক্তিই বিশ্বপ্রকৃতির স্তরগুলোকে অদৃশ্য, অননুভূত এবং মানুষের আয়ত্ব বহির্ভূত অবলম্বনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। এহেন শক্তিমান ও ক্ষমতাবান আল্লাহ মানুষের মতো তুচ্ছ সৃষ্টিকে একবার ধ্বংস করে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম নয়—তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা কতো বড়ো খামখেয়ালী ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হতে পারে ?

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ـ (بنى اسرائيل : ٩٩)

"তারা কি দেখে না যে, যে আল্লাহ আসমান ও জীমন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের মতো মানুষ সৃষ্টি করতেও সক্ষম।"–(বনী ইসরাঈল ঃ ৯৯)

আসমানের পর কুরআন আমাদের নিকটতম পরিবেশ, অর্থাৎ পৃথিবীর নিদর্শনাবলীর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ

سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ (العنكبوت : ٢٠)

"পৃথিবীর বুকে ভ্রমণ করো এবং আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেছেন তা দেখো। আর সেই আল্লাহ-ই বস্তুনিচয়কে পুনর্বার জীবন দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।"–(সূরা আনকাবুত ঃ ২০)

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ ○

"তাদের জন্যে মৃত ভূমিই হচ্ছে একটি নিদর্শন ; আমরা তাকে জীবন দান করেছি এবং তার থেকে ফসল উৎপাদন করেছি, যা তারা আহার করে থাকে।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩)

فَانْظُرْ اِلٰٓى اٰثٰرِ رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ (الروم : ٥٠)

"আল্লাহর রহমতের নিদর্শন দেখো, জমীন মৃত হবার পর কিভাবে তিনি জীবনদান করেন। নিশ্চয়ই তিনি মৃত মানুষকেও অবশ্য জীবন দান করবেন। তিনি সকল জিনিসের ওপর ক্ষমতাবান।"–(সূরা রূম ঃ ৫০)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۗ اِنَّ الَّذِيْٓ اَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتٰى ۗ اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

"তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে একটি হলো ঃ তোমরা জমীনকে শুকনো পড়ে থাকতে দেখছো। কিন্তু যখনি আমরা পানি বর্ষণ করি ; অমনি তা অঙ্কুরিত ও ফলফুলে সুশোভিত হয়ে উঠে। কাজেই যিনি জমিনকে জীবিত করেছেন, তিনি মৃত মানুষও জীবন দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।"–(সূরা হা-মীম আস সেজদা ঃ ৩৯)

وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ○ (فاطر : ٩)

"আল্লাহই বাতাসকে পরিচালিত করেন। তারপর তা মেঘরাশিকে উপড়ে নিয়ে যায়। অতপর আমরা সেই মেঘরাশিকে পানি-তৃণ-লতাহীন জনপদের দিকে চালিত করি। তারপর সেই মৃত-পতিত জমীনকে তিনি বৃষ্টির সাহায্যে জীবিত করে তোলেন। সুতরাং (কিয়ামতের দিনও) এভাবেই জীবিত হয়ে ওঠতে হবে।"–(সূরা ফাতের ঃ ৯)

এরপর কুরআন বলছে যে, সকল দিক থেকে চোখ বন্ধ করে খোদ নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুটা তলিয়ে চিন্তা করো। তাহলে দেখতে পাবে, মৃতকে জীবন দান সম্পর্কে আল্লাহর ক্ষমতার প্রমাণ তোমার নিজের ভেতরেই বর্তমান রয়েছে।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○

"নিসন্দেহে মানুষের ওপর দিয়ে মহাকালের এমন একটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য জিনিসই ছিলো না।"

—(সূরা আদ দাহর ঃ ১)

كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

"তোমরা মৃত ছিলে, আল্লাহ তোমাদের জীবিত করেছেন। তিনি আবার তোমাদের মৃত করবেন, আবার জীবিত করবেন। পুনরায় তাঁর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮)

اِنْ كُنْتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ -(الحج : ٥)

"মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হবার ব্যাপারে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে তবে জেনে রাখো যে, আমরা মাটির ন্যায় নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি।"—(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৫)

قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ ○ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْٓ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ

"সে বললো ঃ হাড়-গোড় গলে যাবার পর কে আবার তাকে জীবিত করবে ? বলে দাও ঃ এসব তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমবার জীবনদান করেছিলেন।"—(সূরা ইয়াসীন ঃ ৭৮-৭৯)

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ○ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ۚ

فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ۗ قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ

"এদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা পাথর, লোহা, কিংবা তোমাদের মতে জীবিত হওয়া জ্ঞান-বুদ্ধি বহির্ভূত এমন কোন জিনিসেই পরিণত হও। অতপর তারা জিজ্ঞেস করে ঃ আমাদেরকে কে পুনর্বার জীবিত করবে ? বলে দাও ঃ তিনিই (জীবিত করবেন) যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছিলেন।"—(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫০-৫১)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ

مَّكِيْنٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا

الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ق ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ

اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ○ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَ ○ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ○ (المؤمنون : ١٢-١٦)

"আমরা মানুষকে মাটির ঢেলা থেকে সৃষ্টি করেছি, অতপর আমরা সেই ঢেলাকে শুক্রবিন্দুতে পরিণত করে একটি সুরক্ষিত জায়গায় রেখে দিয়েছি। তারপর শুক্রকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। পুনরায় রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে রূপ দিয়েছি। অতপর মাংসপিণ্ডের জন্যে অস্থিপঞ্জর বানিয়েছি। অতপর অস্থিপঞ্জরের ওপর মাংস সৃষ্টি করেছি। অতপর তাকে একটি ভিন্ন জিনিস বানিয়ে দাঁড় করিয়েছি। কাজেই আল্লাহ অত্যন্ত বরকতপূর্ণ, তিনিই উত্তম স্রষ্টা। এরপর তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদের নিশ্চিতরূপে উত্থিত করা হবে।"-(সূরা মুমেনুন ঃ ১২-১৬)

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ○ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ○ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ط اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى

"মানুষ কি শুধু একবিন্দু শুক্র ছিল না বা মাতৃগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো ? অতপর সে একটি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। তারপর আল্লাহ মানবীয় রূপ দান করেছেন। এবং গঠন প্রকৃতিকে সুবিন্যস্ত করে দিয়েছেন। অতপর তাকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দিয়েছেন। এবং পুরুষ ও নারীর জোড়া বানিয়েছেন। এহেন আল্লাহ-ই কি মৃতকে জীবিত করাতে সমর্থ নন ?"-(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৭-৪০)

এ পরিষ্কার, সুস্পষ্ট এবং আমাদের পর্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছাকাছি সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের পর কুরআন মজীদ ঠিক সাধারণ জ্ঞানের (Commonsens) সাথে সম্পৃক্ত একটি দলীল পেশ করছে। সে বলছে যে, কোন জিনিস বিক্ষিপ্ত ও বিশিষ্ট হয়ে যাবার পর পুনর্বার তাকে সাবেক রূপে সৃষ্টি করার চেয়ে সম্পূর্ণ শূন্য অবস্থা থেকে তাকে সৃষ্টি করাটাই হচ্ছে কঠিন কাজ। কাজেই এ কঠিনতর কাজটি সম্পাদন করতে যে শক্তি অসমর্থ হয়নি, সে সহজতর কাজটি সম্পন্ন করতে কেন অসমর্থ হবে ? এক ব্যক্তি যদি মোটর আবিষ্কার এবং তা তৈরী করতে সক্ষমই হয় তবে তার খুচরা অংশগুলো পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করার পর পুনর্বার সেগুলো সে জুড়ে দিতে সমর্থ হবে না, এটা কি বোধগম্য হতে পারে ? এ দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায় যে, যে বিশ্বকারিগর তোমাদেরকে শূন্য অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন, মৃত্যুর পর তিনি তোমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে মোটেই অক্ষম হতে পারে না।

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○

"তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন ? অতপর এভাবেই তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এ কাজ আল্লাহর পক্ষে নিশ্চয়ই সহজতর।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ১৯)

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ ط ـ(الروم : ٢٧)

"তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন। তারপর তিনিই তার পুনরাবৃত্তি করবেন। এ পুনরাবৃত্তি তার পক্ষে খুবই সহজতর।"–(সূরা আর রূম ঃ ২৭)

اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ط بَلْ هُمْ فِىْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ○(ق : ١٥)

"আমরা কি প্রথমবার সৃষ্টি করতে অসমর্থ ছিলাম ? (না, প্রথমবারের সৃষ্টিকে তারা অস্বীকার করে না) কিন্তু নতুন সৃষ্টিতে তাদের সন্দেহ রয়েছে।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ১৫)

একবার যেসব মৃতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে, তারা আবার কিভাবে সাবেক দেহে পরিণত হবে — এ সন্দেহটুকু বাকী থেকে যায়। কারণ কেউ পানিতে ডুবে মারা গেছে এবং তার হাড়-মাংস মৎস ও জলজ প্রাণীর খাদ্যে পরিণত হয়েছে। কেউ আগুনে পুড়ে মারা গেছে কিংবা মরার পর পুড়ে ফেলা হয়েছে এবং গোটা দেহ ভস্ম ও ধুম্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কেউ ভূমিতে সমাহিত হয়েছে এবং তার দেহ মাটিতে বিলীন হয়ে গেছে। এখন তার সাবেক দেহ ফিরিয়ে আনা এবং তাতে সেই সাবেক রূহ ফুঁকে দেয়া কিভাবে সম্ভবপর ? লোকেরা এ সন্দেহ অপনোদের চেষ্টা করেছে এ বলে যে, আত্মাকে দৈহিক জীবন দান করার জন্যে তার সাবেক দেহ ফিরিয়ে দেয়া অপরিহার্য নয়। বরং এমন হতে পারে যে, আত্মা সেটিই থাকবে এবং তার সাবেক দেহের অনুরূপ কোন ভিন্ন দেহ দান করা হবে। কিন্তু কুরআন বলছে যে, আল্লাহ সাবেক দেহ দান করতেই সক্ষম। মানুষের দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শূন্যে বিলীন হয়ে যায়নি, বরং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তার প্রতিটি অংশ কোথাও না কোথাও বর্তমান রয়েছে। বাতাসে, পানিতে, মাটিতে উদ্ভিদ বা পশুর দেহে, খনিজ পদার্থে নানাভাবে তার অংশগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। আল্লাহর জ্ঞান এমন সর্বোব্যাপক যে, তাঁর প্রতিটি অংশের অবস্থান সম্পর্কে তিনি অবহিত। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা এমন অপরিসীম যে, ঐ বিক্ষিপ্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে একত্র করে তিনি সাবেক রূপ দান করতে সক্ষম।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ج وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ـ(ق : ٤)

"জমীন তাদের মধ্য থেকে কি জিনিস ক্ষয় করে আমরা জানি। আমাদের কাছে এমন কিতাব আছে যাতে প্রত্যেকটি জিনিসের রেকর্ড সুরক্ষিত আছে।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ৪)

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَايَعْلَمُهَآ اِلَّا هُوَ ط وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِى كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○ (الانعام : ٥٩)

"তার কাছে অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। এমন কি গাছের একটি পাতা পড়লেও তা তিনি জানেন। দুনিয়ার অন্ধকার পর্দার ভেতর এমন কোন দানা নেই, আর এমন কোন শুষ্ক ও সিক্ত জিনিসও নেই, যা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শনকারী এক কিতাবে বর্তমান নেই।"–(আনআম ঃ ৫৯)

ওপরে যা কিছু বলা হলো, পরকাল অবিশ্বাসের ভিত্তিমূলে অবস্থিত সন্দেহগুলো দূর করাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। অবশ্য অবিশ্বাসের মূল কারণ এ নয় যে, অবিশ্বাসীরা কোন অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ বা অন্য কোন নিশ্চিত জ্ঞান সূত্রের মাধ্যমে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অসম্ভবনাকে চূড়ান্ত ও সুস্পষ্টরূপে জেনে নিয়েছে। অবিশ্বাসের একমাত্র ভিত্তি হলো, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়াটা তাদের বোধগম্য নয়। তারা এরূপ দৃশ্য কখনো দেখেনি। বরং তারা দেখে আসছে যে, একবার যে মরেছে সে আর ফিরে আসেনি। কাজেই যে মরেছে সে আবার ফিরে আসবে একথা যখন বলা হয়, তখন এ স্বভাব বিরোধী কথাটাকে তারা অবাস্তব, অসম্ভব এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধ্যান-ধারণার বহির্ভূত মনে করে। কিন্তু চিন্তা-গবেষণার পথে আর একটি ধাপ অগ্রসর হলেই এসব শোবা-সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং পূর্বের অসম্ভব বিষয়কেই ঠিক সম্ভবপর মনে হয়। যে বিষয়-গুলোকে লোকেরা সম্ভবপর বরং বাস্তব ও যথার্থ মনে করে, সেগুলোর অনুষ্ঠান পর্যবেক্ষণ করতে তারা অভ্যস্ত বলেই এরূপ মনে করে থাকে। একটি বীজ মাটির মধ্যে গিয়ে অঙ্কুরিত হয় এবং এক প্রকাণ্ড ডাল-পালা বিশিষ্ট বৃক্ষরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এক ফোটা শুক্র মাতৃগর্ভে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখান থেকে একটি পূর্ণাংগ মানুষ রূপে বেরিয়ে আসে। দু'টি বাতাসের সমন্বয়ে পানির সৃষ্টি হয়। এবং একটি নির্দিষ্ট নিয়মে বারবার পানি থেকে বাষ্প এবং বাষ্প থেকে পানির সৃষ্টি হয়। শূন্য লোকের বিশাল অঙ্গনে কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র বলের মত ছুটে চলছে এবং কোন বস্তুগত যোগসূত্র ছাড়াই তারা পরস্পরে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এসব গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি, পরিক্রম ও আবর্তন ব্যবস্থার কোথাও বিন্দুমাত্র গরমিলের সৃষ্টি হচ্ছে না। এ সকল বিষয় দেখতে লোকেরা

খুবই অভ্যস্থ, এ জন্যেই এগুলোকে তারা সাধারণ বিষয় মনে করে। কিন্তু এ জিনিসগুলোই যদি তাদের সামনে প্রকাশ না পেতো এবং এর পরিবর্তে অপর কোন ব্যবস্থাপনায় তারা অভ্যস্ত হতো, তবে এগুলোকেই তারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণার বহির্ভূত মনে করতো এবং দৃঢ়তার সাথে এদের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতো। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, মঙ্গল গ্রহে কোন গাছ-পালা জন্মায় না। সেখানকার অধিবাসীদের যদি বলা হয় যে, একটি মাষা পরিমাণ বীজ মাটিতে পুঁতলেই বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয় এবং তার সাবেক আকৃতি থেকে কয়েক হাজার, বরং কয়েক লক্ষ গুণ বড়ো হয়ে যায়, তবে একথা মঙ্গলগ্রহবাসীদের কাছে ততোটাই বিস্ময়কর মনে হবে দুনিয়াবাসীর কাছে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভের ব্যাপারটা যতখানি বিস্ময়কর মনে হয়। তারাও ঠিক এটাকে একইভাবে অসম্ভব কথা বলে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, অসম্ভাবনার এ ফতোয়াটা জ্ঞান ও তথ্য নির্ভর নয় এবং তা হবে অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রসূত। বিচার-বুদ্ধির অধিগম্যতার ফল নয়, বরং তা হবে অনধিগম্যতার ফল। পরকাল সম্পর্কে অবিশ্বাসের ব্যাপারটিও ঠিক এরূপ। লোকেরা যদি বিস্ময় ও অবিশ্বাসের স্বরূপটি বুঝে নেয় তবে স্বভাবতই তারা জানতে পারবে যে, কোন জিনিস তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধারণার বহির্ভূত হওয়াটাই তার অসম্ভাবনার ও অবাস্তবতার পক্ষে কোন প্রমাণ নয়। মানুষ আজকে যেসব জিনিস আবিষ্কার করছে, একশো বছর পূর্বে সেগুলোই মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধারণার বহির্ভূত ছিলো। কিন্তু আজ বাস্তব ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে, আদতে এগুলো অসম্ভব ছিলো না। অনুরূপভাবে যে জিনিসগুলোকে আজ মানুষ অসম্ভব মনে করছে, একশো বছর পর তা মানুষের হাতেই সম্ভবপর হবে এবং বাস্তব ঘটনাবলী প্রমাণ করবে যে তার মধ্যে অসম্ভব কিছু নেই। কাজেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এবং তার বহির্ভূত ও অন্তর্ভূক্ত হবার রহস্যটি যখন এই, তখন এ সীমিত বুদ্ধির অধিগম্য নয় বলেই কোন জিনিসকে অসম্ভব বলা যেতে পারে না।

কোন প্রচ্ছন্ন ও ইন্দ্রিয় শক্তি বহির্ভূত জিনিসকে সাব্যস্ত করতে হলে সর্বপ্রথম তার সম্ভাবনা সাব্যস্ত করা দরকার। তাই কুরআন মজীদ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে পরকালীন জীবন সংক্রান্ত সকল শোবা-সন্দেহ দূর করে তার সম্ভাবনাকে সাব্যস্ত করেছে। এবার দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসেবে তার প্রয়োজনীয়তা সাব্যস্ত করা উচিত। এতে করে এমন একটা জিনিস যে অবশ্যই হওয়া দরকার, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এটা সহজেই মেনে নেবে।

বিশ্বব্যবস্থা একটা বিচক্ষণ ব্যবস্থা

এ বিশ্ব প্রকৃতি কি কোন বিচক্ষণ সত্তার সৃষ্টি, না কোন বিচক্ষণতা ছাড়া আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে ? প্রকৃতপক্ষে এ প্রশ্নটির মীমাংসার ওপরই পরকালীন জীবনের প্রয়োজনীয়তা নির্ভরশীল।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ভক্ত মানুষ বলে যে, কোন বিচক্ষণ কারিগর এ বিশ্বব্যবস্থা সৃষ্টি করেননি। এ আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যার মধ্যে মানুষও শামিল রয়েছে) নিয়ে এগিয়ে চলেছে। যেদিন বস্তু ও শক্তির (Energy) পারস্পরিক সংযোগ খতম হয়ে যাবে, সেদিন এ ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কোন জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা, ইচ্ছাশক্তি ও বিচক্ষণতা ছাড়াই এক অন্ধপ্রকৃতি (Nature) যে ব্যবস্থাপনা চালিত করেছে তার মধ্যে কোন রূপ উদ্দেশ্য ও বিচক্ষণতার সন্ধান করা একেবারেই পণ্ডশ্রম। এ কারণেই আজকের জড় বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিদর্শনাদির উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণকে (Teleological Causation) শুধু নিজের সীমা বহির্ভূতই করে দেয়নি, বরং এরূপ চিন্তাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অবান্তর ও অর্থহীন ঘোষণা করেছে। সে চূড়ান্তরূপে দাবী করেছে যে, এ বিশ্বপ্রকৃতি এবং এর কোন জিনিস ও ক্রিয়া-কাণ্ডের পেছনে কোনই উদ্দেশ্য নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চক্ষু দেখার জন্যে নয়, বরং চক্ষুর ভেতরে বস্তুর যে বিশেষ ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তার ফলশ্রুতিই হচ্ছে দেখা। অনুরূপভাবে মস্তিষ্ক চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি ও চেতনার কেন্দ্রস্থল নয়, বরং যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হবার মতই মস্তিষ্ক থেকে চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা নির্গত হয়। বস্তুত দ্রব্যনিচয়ের প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক ক্রিয়া-কাণ্ডকে তাদের উদ্দেশ্য বলে আখ্যায়িত করা এবং তাদের সৃষ্টির মধ্যে কোন বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা অনুসন্ধান করা নিছক ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ মতবাদটি স্বীকার করে নিলে পার্থিব জীবনের পর অপর কোন জীবনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে স্বীকার করার কোন যুক্তিসংগত কারণই থাকে না। কারণ যে বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনা কোন অজ্ঞ, নির্বোধ ও অচেতন প্রকৃতির দ্বারা কোনরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই চালিত হচ্ছে, তার মর্যাদা একটি খেলনার বেশী কিছু হতে পারে না। যে বিশ্ব এবং তার প্রতিটি জিনিসই হচ্ছে উদ্দেশ্যহীন এবং এ উদ্দেশ্যহীনতা পূর্ণতা লাভ করলেই সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এহেন অন্ধপ্রকৃতির পক্ষে ন্যায়পরায়ণতার গুণে বিভূষিত হওয়া এবং তার কাছ থেকে কোন হিসাব-কিতাব ও ইনসাফের প্রত্যাশা করা সুদূর পরাহত। এতদসত্ত্বেও যদি তাকে ন্যায়পরায়ণতার গুণে বিভূষিত বলে ধরে নেয়াও যায়, তবুও মানুষ যেহেতু তার হাতে একটি অসহায় পুতুলের মতো খেলছে এবং নিজের ক্ষমতাবলে কিছু করা তো দূরের কথা, আদতে কোন ক্ষমতা ইচ্ছা-শক্তিরই সে অধিকারী নয়, কাজেই তার ওপর কোন ভালো বা মন্দ কাজের দায়িত্ব আরোপিত হওয়া উচিত নয়—যেমন মোটরের ওপর সোজা পথ কি বাঁকা পথ গমনের কোন দায়িত্ব অর্পিত হয় না। আর দায়িত্বের প্রশ্ন পরিত্যক্ত হবার পর দুনিয়াই বিচার ইনসাফ ও শাস্তি-পুরস্কারের প্রশ্ন খতম হয়ে যায়—তার জন্যে স্বতন্ত্র জীবনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা তো দূরের কথা।

কিন্তু এ মতবাদটি সম্পূর্ণরূপেই বিচার-বুদ্ধির পরিপন্থী। একে প্রতিপন্ন করার জন্যে কোনরূপ বুদ্ধিবৃত্তির প্রমাণ কিংবা বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্যই পেশ করা হয়নি। এর সমর্থনে এ যাবত মোটামুটি বলা হয়েছে ঃ বিশ্বপ্রকৃতির কোন স্রষ্টা ও পরিচালক আমরা দেখতে পাই না। এর সৃষ্টির কোন উদ্দেশ্য আমাদের বোধগম্য নয়। কোনরূপ স্রষ্টা ছাড়াই আমরা একে চলমান ও গতিশীল দেখতে পাই। আর এ গতিশীলতার উদ্দেশ্য জানা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তা জানার কোন প্রয়োজনীয়তাও আমরা দেখি না। কিন্তু কোন জিনিসের কার্যকারণ ও নিমিত্ত কারণ না জানাটাই তার কার্যকারণ ও নিমিত্ত কারণ না থাকাকে প্রমাণ করে না। মনে করুন ঃ একটি শিশু কোন মুদ্রণ যন্ত্রকে চলমান অবস্থায় দেখতে পেলো। এ যন্ত্রটি কি উদ্দেশ্যে চালানো হচ্ছে, তা সে বুঝতে পারলো না। এ কারণে সে মনে করলো, এ শুধু একটি খেলনা মাত্র—কোন বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়াই এটি চালিত হচ্ছে। সে দেখলো ঃ এ যন্ত্রটির যেরূপ আওয়াজ সৃষ্টি হচ্ছে, অংশগুলো নড়াচড়া করছে, মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে—তেমনি কাগজও ছেপে ছেপে বেরোচ্ছে। এ কারণে সে সিদ্ধান্ত করলো ঃ ওই ক্রিয়াগুলো যেমন যন্ত্রটি চালিত হবারই পরিণতি, তেমনি কাগজগুলো ছেপে ছেপে বেরোনও তার গতিশীলতার এক স্বাভাবিক ফল। সে এটা বুঝতেই পারলো না যে, যন্ত্রটির এ গোটা ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে শুধু একটি কাজ, অর্থাৎ কাগজগুলোর ছেপে বেরোনই হচ্ছে সমগ্র যন্ত্রটির জন্ম উদ্দেশ্য। আর বাকী সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড যন্ত্রটির গতিশীলতার স্বাভাবিক পরিণতি। তার শিশু সুলভ সন্ধানী দৃষ্টি এ যন্ত্রের অংশগুলোর বিন্যাস, সংস্থাপন ও নিয়ম-শৃংখলা উপলব্ধি করার মতো শক্তিই অর্জন করেনি। এর প্রতিটি অংশ যেরূপ তৈরী করা হয়েছে এবং যেখানে সংযুক্ত করা হয়েছে, তার জন্যে সেইরূপ ও সেই জায়গাটিই যে উপযোগী এবং যন্ত্রের ভেতর নিজ ভাগের কাজ সম্পাদনের জন্যে অংশটির সেইরূপ ও সেই স্থানে থাকাই বাঞ্ছনীয়—এটাও সে বুঝতে পারেনি। এ কারণেই সেই অপরিণত বুদ্ধি শিশু মনে করে নিয়েছে যে কতকগুলো লোহার টুকরার সংযুক্তির ফলে এ যন্ত্রটি আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে যে অবশ্যই কোন বিচক্ষণ সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, যিনি উত্তম পদ্ধতি ও চমৎকার পরিকল্পনা অনুসারে এটি তৈরী করেছেন এবং এর কোন অংশই নিষ্ক্রিয়, অনুপযোগী, অসংবদ্ধ ও অপ্রয়োজনীয় রাখেননি, পরন্তু এমন বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে পেশকৃত কোন জিনিস যে অকারণ, উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক হতে পারে না—যন্ত্রটির ক্রিয়াকাণ্ড ও বিন্যাস বৈচিত্র দেখে তা ধারণা করার মতো উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি তার নেই। এখন মুদ্রণ যন্ত্রের এ অসম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং এ সম্পর্কে অপরিণত চিন্তা-ভাবনার দ্বারা ওই নির্বোধ শিশু যদি এ মতবাদ গড়ে নেয় যে, যন্ত্রটির কোন কার্যকারণ ও নিমিত্ত কারণ নেই, এর সৃষ্টির ব্যাপারে কোন বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা ব্যয়িত হয়নি, এ

রূপায়ণের সামনে কোন মহৎ লক্ষ্য বর্তমান নেই — তাহলে যন্ত্রটি সম্পর্কে শিশুর এ মতবাদকে নির্ভুল ও যথার্থ বলে কি কোন বুদ্ধিমান ও পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি স্বীকার করবে ?

একটি মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যাপারে যদি একথা যথার্থ না হয় তাহলে যে বিশ্বব্যবস্থার প্রতিটি অণু-পরামাণু তার স্রষ্টার জ্ঞান-বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, বিচক্ষণতা ও দূর দৃষ্টির পক্ষে সাক্ষ্যদান করছে, তার সম্পর্কে কিভাবে যথার্থ হতে পারে ? অপরিণত বুদ্ধি ও সংকীর্ণ দৃষ্টি শিশু যা ইচ্ছে তাই বলতে পারে। কিন্তু যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি চোখ মেলে তাকিয়ে এ বিশ্বজগতের নিদর্শনাবলী পর্যবেক্ষণ করে দেখেছে, সে এমন একটি বিচক্ষণ, সুবিন্যস্ত, সুশৃংখল ও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি, উদ্দেশ্য ও পরিচালনা সম্পর্কে যা খুশী তাই বলতে পারে না। বস্তুত যে ব্যবস্থাপনার কোন একটি জিনিসও অকারণ ও নিরর্থক নয়, কোন জিনিস প্রয়োজনের কম বা অতিরিক্ত নয়, যার প্রতিটি অংশ নিজের স্থান ও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে পুরোপুরি উপযোগী এবং যার নিয়ম-শৃংখলার কোথাও কোন বিচ্যুতি লক্ষ্যগোচর নয় — তেমন একটি ব্যবস্থাপনা কোন জ্ঞান-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, ইচ্ছাশক্তি ছাড়াই সৃষ্টি ও পরিচালিত হতে পারে বলে এক মুহূর্তের জন্যেও সে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।

বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা লক্ষ্যহীন ও নিরর্থক হতে পারে না

পরকালীন জীবন সম্পর্কে কুরআন মজীদে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করেছে, তা এ বুনিয়াদী মতবাদের ওপর নির্ভরশীল। এর সারকথা হলো ঃ এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা একজন বিচক্ষণ সত্তা। তাঁর কোন কাজই দূরদৃষ্টি থেকে মুক্ত নয় এবং দূরদৃষ্টি বিরোধী কোন কথাই তাঁর প্রতি আরোপ করা যায় না। এ ভিত্তিটি রচনা করার পর কুরআন বলছে ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ○ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ج ـ(المؤمنون : ١١٥ـ١١٦)

"তোমরা কি এ ধারণা করেছো যে, আমরা তোমাদের নিরর্থক সৃষ্টি করেছি ? এবং তোমাদেরকে আমার দিকে ডেকে পাঠানো হবে না ? মহান সত্যাশ্রয়ী বাদশাহ আল্লাহ এর উর্ধে (অর্থাৎ তাঁর দ্বারা নিরর্থক কোন কাজ হয় না)।"–(সূরা আল মুমেনুন ঃ ১১৫-১১৬)

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى○(القيمة : ٣٦)

"মানুষ কি এটা মনে করে বসেছে যে, তাকে এমনই অকারণ ছেড়ে দেয়া হবে ?"—(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৩৬)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝ مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

"আমরা আসমান, জমীন এবং তার মধ্যকার বস্তুনিচয়কে খেলার সামগ্রিরূপে সৃষ্টি করিনি। আমরা তো এগুলো বিচক্ষণতার দাবী অনুসারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। অবশ্য তাদের জন্যে বিচারের দিন পর্যন্ত সময় নির্দিষ্ট।"—(সূরা আদ দোখান ঃ ৩৮-৪০)

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قف مَاخَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۝

"তারা কি নিজেদের অন্তরে চিন্তা করে দেখেনি যে, আসমান, জমীন ও তার মধ্যকার বস্তুনিচয়কে আল্লাহ বিচক্ষণতার সাথে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্যে একটি সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন ? কিন্তু বহু লোকই আপন প্রভুর সাথে সাক্ষাতকারকে অবিশ্বাস করে।"—(সূরা আর রূম ঃ ৮)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে এ মর্মে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আসমান ও জমীনের এ বিশাল কারখানাটি যদি মাত্র কিছুকাল পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তারপর কোন ফলাফল ও পরিণতি ছাড়াই ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যায়, তবে তা হবে একটি অকারণ ও অনর্থক কাজ—একটি খেল-তামাশা মাত্র। এটা কখনো কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। লোকেরা যদি বিশ্বাস করে যে, এ কারখানাটি আল্লাহ তৈরী করেছেন আর আল্লাহ তাদের দৃষ্টিতে বিচক্ষণ সত্তা বলে পরিগণিত হন, তাহলে বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে তাদের এটাও বোঝা উচিত যে, সৃষ্টিজগতের কোন জিনিসই উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়—কোন জিনিসই নিষ্ফল ও নিরর্থক বিলীন হয়ে যাবার নয়। বিশেষত মানুষ হচ্ছে বিশ্বজগতের সবচেয়ে সেরা সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত। তার সচেতন সত্তাই এ জগতের ক্রমবিকাশ এবং এক সমগ্র গতি-প্রকৃতির চাবিকাঠি। তাকে অপরিসীম বিচক্ষণতার সাথে জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, দূরদৃষ্টি ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। এহেন মানুষ এ দুনিয়ায় মাত্র কয়েক বছর একটি যন্ত্রের মতো বেঁচে থাকবে এবং তারপর সে ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাবে—তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য এতোখানি নিরর্থক হতে পারে না।

প্রজ্ঞার দাবীতে বিশ্বব্যবস্থার কি পরিণতি হওয়া উচিত

ওপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, এ বিশ্বজগতের সৃষ্টি ও পরিচালনা নিরর্থক খেল-তামাশা নয়, এর কোন জিনিসই অকারণ ও উদ্দেশ্যহীন নয়। এখন দ্বিতীয় কথা হলো এই যে, বিচার-বুদ্ধির দাবী অনুসারে ধ্বংস ও বিলুপ্তি ছাড়া এ বিশাল কারখানাটির আর কী পরিণতি হতে পারে। এ প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব কুরআন মজীদে বর্তমান রয়েছে। সে জবাব শোনার পর সুস্থ বিচার-বুদ্ধি একেবারে নিশ্চিন্ত ও পরিতুষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এ জবাবটি বোঝার পূর্বে কতিপয় বিষয় হৃদয়ে বদ্ধমূল করা একান্ত প্রয়োজন।

এক ঃ সৃষ্টিজগতের সমস্ত নিদর্শন এ সাক্ষ্য বহন করছে যে, এ ব্যবস্থাপনায় গোটা আবর্তন ও পরিবর্তনের গতিমুখ ক্রমবিকাশের দিকে নিবদ্ধ। বস্তুর অপূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে চালিত করা এবং তার অসম্পূর্ণ রূপকে পূর্ণতর করে তোলাই এর সমস্ত বিবর্তনের উদ্দেশ্য।

দুই ঃ এ ক্রমবিকাশ নীতি যেহেতু পরিবর্তনের রূপে কার্যকরী হয়, সেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টির জন্যেই একটি লয়ের প্রয়োজন। একটি আকৃতির সৃষ্টি স্বভাবতই পূর্বতন আকৃতির ধ্বংস বা লয় দাবী করে। আর অপূর্ণ আকৃতির বিলুপ্তি পূর্ণতর সৃষ্টিরই সূচনা করে থাকে। এ আবর্তন ও পরিবর্তন প্রতিটি মুহূর্তেই সংঘটিত হয় বটে, কিন্তু বহু গুপ্ত পরিবর্তনের পরই একটি প্রকাণ্ড প্রত্যক্ষ পরিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে যার মধ্যে একটি প্রকাণ্ড প্রত্যক্ষ লয় সংঘটিত হয়। এ দ্বিতীয় প্রকার লয়কেই আমরা সাধারণ ভাষায় 'মৃত্যু' বা পতন নামে আখ্যায়িত করে থাকি। আর একটি আকৃতির সৃষ্টির পর থেকে তার মৃত্যু বা চূড়ান্ত লয় পর্যন্ত সময়কে আমরা 'জীবন' নামে অভিহিত করি।

তিন ঃ প্রত্যেক আকৃতিই অবস্থার উপযোগী এক বিশেষ আশ্রয় বা অবলম্বন দাবী করে। কোন আকৃতিই তার অবস্থার উপযোগী নয়, এমন আশ্রয়ে বাস করতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, উদ্ভিদ রূপের জন্যে প্রাণীর দেহ অনুপযোগী। অনুরূপভাবে মানুষের জন্যে যে বিশিষ্ট দৈহিক কাঠামো তৈরী করা হয়েছে, মানবীয় সত্তা ঠিক তারই দাবীদার। কাজেই কোন বস্তুকে উন্নততর রূপদান করতে হলে নিকৃষ্টতর রূপের জন্যে তৈরী বাসস্থান ভেঙে ফেলা এবং নতুন রূপের উপযোগী বাসস্থান নির্মাণ একান্ত অপরিহার্য।

চার ঃ বিশ্বজগতের বিভিন্ন অংশের বেলায় ক্রমবিকাশ নীতির ব্যাপকতাকে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছে, তার দৃষ্টিতে গোটা বিশ্বব্যবস্থার ওপর এ নীতির পরিব্যাপ্তি কিছুতেই প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে না। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায়

সৃষ্টির ধারা শুরু হবার আগে আর কতো ব্যবস্থা অতিক্রান্ত হয়েছে, যার প্রত্যেকটি ব্যবস্থা নিজ নিজ আয়ুষ্কাল পূর্ণ করে অধিকতর উন্নত ব্যবস্থার জন্যে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে এবং ক্রমবিকাশের ক্রমিক স্তরগুলো অতিক্রম করে সৃষ্টির ধারা আমাদের এ ব্যবস্থা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে, তা এ ব্যবস্থাপনা দেখে আমরা বলতে পারি না। অনুরূপভাবে এ ব্যবস্থাটিও সর্বশেষ ব্যবস্থা নয়। এটিও যখন সম্ভাব্য পূর্ণত্বে উপনীত হবে এবং পূর্ণতার উচ্চতর স্তরে উন্নীত হবার সামর্থ এতে না থাকবে, তখন একেও চূর্ণ করে এর পরিবর্তে অন্য কোন ব্যবস্থা কায়েম করা হবে। সে ব্যবস্থার আইন-বিধান হবে অন্যরূপ এবং তাতে সৃষ্টির পূর্ণতর পর্যায়ে উন্নীত হবার যোগ্যতাও বর্তমান থাকবে।

পাঁচ ঃ বিশ্বজগতের বর্তমান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তলিয়ে চিন্তা করলেই স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায় যে, এ একটি অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা এবং এর অধিকতর পূর্ণতার প্রয়োজন। এ ব্যবস্থায় দ্রব্যনিচয়ের অন্তর্নিহিত মৌল তত্ত্বগুলো (হাকীকত) বস্তুগত মালিন্যে এতখানি আচ্ছন্ন যে মৌল তত্ত্বগুলো তুচ্ছ কল্পনার এবং তাদের বস্তুগত আবরণটা মৌল তত্ত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। যে জিনিস যতবেশী সূক্ষ্ম এবং বস্তুগত মালিন্য থেকে মুক্ত, তা এ বিশ্বব্যবস্থায় ততখানিই প্রচ্ছন্ন, আবৃত এবং বুদ্ধি ও চেতনার নাগাল থেকে দূরে অবস্থিত। এখানে নিরেট বস্তুগত দেহের গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু সূক্ষ্ম ও অমিশ্র তত্ত্বের কোন গুরুত্ব নেই। এখানে গাছ, পাথর ইত্যাদি ওজন করা যেতে পারে ; কিন্তু বিচার-বুদ্ধি, চিন্তা-কল্পনা, ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা-আকাংখা, আহ্বান-অনুভূতি দূরদৃষ্টি মাপা কিংবা ওজন করার মতো উপায় এ বিশ্বব্যবস্থায় নেই। এখানে খাদ্যবস্তু ওজন করা যেতে পারে, কিন্তু প্রেম ও ঘৃণা ওজন করার কোন মানদণ্ড নেই। এখানে কাপড় মাপার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ক্রোধ ও হিংসা পরিমাপ করার কোন মাপকাঠি বর্তমান নেই। এখানে টাকা-পয়সার মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে, কিন্তু বদান্যতা ও কৃপণতার পেছনে ক্রিয়াশীল ভাবধারার মূল্যমান নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। এ হচ্ছে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার ত্রুটি। তাই বিচার-বুদ্ধি এর চেয়ে উন্নততর কোন ব্যবস্থাপনার দাবী করে, যেখানে মৌলিক তত্ত্বগুলো বস্তুগত আবরণের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে—যেখানে স্থূলতার ওপর সূক্ষ্মতা জয়যুক্ত হবে এবং আজকের প্রচ্ছন্ন ও আবৃত জিনিসগুলো উজ্জ্বল ও স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। অনুরূপভাবে এ জগতের আর একটি ত্রুটি এই যে, এখানে বস্তুগত আইন-বিধান প্রভাবশীল রয়েছে ; এর ফলে বস্তুগত আইন-বিধানের সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ ক্রিয়া-কর্মের শুধু সেই ফলাফলই প্রকাশ পাচ্ছে। আর যা বিচার-বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তেমন ফলাফল আদৌ প্রকাশিত হয় না। এখানে আগুন লাগলে সমস্ত দহনশীল বস্তু পুড়ে যাবে, পানি

ঢাললে আদ্রতা ও সিক্ততা গ্রহণকারী জিনিসগুলো ভিজে যাবে ; কিন্তু সৎকাজ করলে তার ফল সুকৃতির রূপে—যা তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিণতি — প্রকাশ পাবে না। বরং তা বস্তুগত আইন-বিধানের উপযোগীরূপে তা সুকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত দুষ্কৃতিই হোক না কেন—প্রকাশিত হবে। এসব অসম্পূর্ণতা দেখে বিচার-বুদ্ধি স্বভাবতই এ ব্যবস্থার পর কোন উন্নততর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবী করে, যেখানে বস্তুগত আইন-বিধানের পরিবর্তে বুদ্ধি-বৃত্তিক আইন-কানুন প্রবর্তিত হবে এবং বর্তমান ব্যবস্থায় বস্তুগত আইন-বিধান জয়যুক্ত থাকার ফলে ক্রিয়া-কর্মের যে স্বাভাবিক ফলাফল প্রকাশ পেতে পারছে না, তা সঠিক রূপে প্রকাশ পাবে।

বিশ্বব্যবস্থার পরিসমাপ্তি

এ প্রাথমিক কথাগুলো অনুধাবন করার পর কুরআনে হাকীম কিয়ামত ও পরকালীন পুনর্জীবনের যে চিত্র এঁকেছে, তাতে মূল প্রশ্নটির কি জবাব পাওয়া যায় এক্ষণে তাই আমরা দেখবো।

কুরআন বলছে ঃ

مَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ط

"আমরা আসমান, জমীন ও তাদের মধ্যকার বস্তুনিচয়কে বিচক্ষণতার দাবী অনুসারে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে সৃষ্টি করেছি।"

–(সূরা আল আহকাফ ঃ ৩)

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط كُلٌّ يَّجْرِىْ لاَجَلٍ مُّسَمًّى ط -(الرعد : ٢)

"তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে একটি বিশেষ আইনের অধীন করে দিয়েছেন। এসবই নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে চলছে।"–(সূরা আর রা'দ ঃ ২)

অতপর সে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করছে নিম্নোক্তরূপে ঃ

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ○ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ○ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ○ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ○ (الانفطار : ١-٤)

"যখন আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে, নক্ষত্রগুলো ছিটকে পড়বে, সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে এবং কবরগুলো উদগীরণ করে দিবে।"

–(সূরা ইনফিতার ঃ ১-৪)

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ○ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ○ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ○

"যখন সূর্যকে ঢেকে দেয়া হবে, তারকাগুলো বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এবং পাহাড় চালিত করা হবে।"–(সূরা আত তাকভীর ঃ ১-৩)

فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ○ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ○ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ○

"যখন তারকা স্তিমিত হয়ে যাবে, আসমান বিদীর্ণ করা হবে এবং পাহাড় উড়িয়ে দেয়া হবে।"–(সূরা আল মুরসালাত ঃ ৮-১০)

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ○ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ○ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ○

"যখন চক্ষু বিষ্ফারিত হবে, চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়ে যাবে এবং চন্দ্র ও সূর্য একাকার হয়ে যাবে।"–(সূরা আল কিয়ামাহ ঃ ৭-৯)

وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○

"জমীন ও পাহাড়গুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে দেয়া হবে এবং একই আঘাতে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।"–(সূরা আল হাক্কা ঃ ১৪)

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

"যেদিন জমীন পরিবর্তন করে ভিন্নরূপ জমীনে পরিণত করা হবে এবং তদ্রূপ করা হবে আসমানকেও। আর সবাই এক ও জবরদস্ত আল্লাহর সামনে এসে উপস্থিত হবে।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮)

এ আয়াতগুলোতে এ ইঙ্গিতই করা হয়েছে যে, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল রয়েছে। এটা কোন চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়। এর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়ে গেলে গোটা ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র এবং অন্যান্য যেসব গ্রহ-উপগ্রহের আবর্তনের ওপর এ ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত, তা সবই বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, একটি অপরটির সাথে সংঘর্ষ মুখর হবে এবং এ অস্থায়ী প্রাসাদটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সৃষ্টিজগত সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে—সৃষ্টির ধারাক্রমও বন্ধ করে দেয়া হবে। বরং এর তাৎপর্য এই যে, বর্তমান ব্যবস্থাধীনে চালিত সৃষ্টির এ বিশেষ ধারণাটি পরিবর্তিত করা হবে এবং সৃষ্টিজগতের জন্যে এক ভিন্ন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করা হবে। يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ আয়াতে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পরকালীন জীবনের ব্যবস্থাপনা কি হবে ?

এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে ঃ সে ব্যবস্থাটি কি রকম হবে ? এ সম্পর্কে কুরআন মজীদের বর্ণনা থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, সেটি হবে বর্তমান

ব্যবস্থাপনারই অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা, এ ব্যবস্থাটিরই বিকশিত ও বিবর্তিত রূপ এবং অবিকল বিচার-বুদ্ধির চাহিদার অনুরূপ। সে ব্যবস্থায় ওজন, পরিমাপ ও হিসেব গ্রহণ সবকিছুই সম্পাদিত হবে। কিন্তু এগুলো বস্তুগত জিনিসের জন্যে নয়, বরং সূক্ষ্ম, মৌল তত্ত্ব ও হাকীকতসমূহের জন্যে সেখানে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ, ঈমান ও কুফর, নৈতিকতা ও অনৈতিকতার ওজন করা হবে। লোকদের নিয়ত, মনন, ইচ্ছা ও আকাংখা পরিমাপ করা হবে। মনের গুপ্ত ক্রিয়াকর্ম মাপজোখ ও ওজন করা হবে। সেখানে গরীবকে দেয়া রুটি বা পয়সা হিসেব করা হবে না, কিন্তু এ বদান্যতার পিছনে ক্রিয়াশীল নিয়তটির হিসেব নেয়া হবে। কারণ এ দুনিয়ার মতো সেখানকার আইন-কানুন বস্তুগত হবে না—হবে বুদ্ধিবৃত্তিক।

انَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً○

"চোখ, কান, মন সবকিছুকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"
–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬)

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ○

"কিয়ামতের দিন আমরা নির্ভুল পরিমাপকারী দাঁড়িপাল্লা রাখবো। সুতরাং কোন ব্যক্তির প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না। বরং একটি সরিষা পরিমাণ আমল হলে তাও আমরা নিয়ে আসবো। আর হিসেব করার জন্যে আমরাই যথেষ্ট।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৪৭)

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ ج فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْآ اَنْفُسَهُمْ○(الاعراف : ٨-٩)

"সেদিন নিশ্চিতরূপে আমল পরিমাপ করা হবে। অতপর যার আমলের ওজন ভারী হবে, সে-ই কল্যাণলাভ করবে। আর যার আমলের ওজন হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতি বরণকারী।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৮-৯)

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ○ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ○(الزلزال : ٦-٨)

"সেদিন লোকেরা নিজ নিজ আমল প্রত্যক্ষ করার জন্যে পৃথক পৃথকভাবে বেরোবে। অতপর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণও সৎকাজ করবে তাও সে

দেখতে পাবে আর যে বিন্দু পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, তাও সে দেখতে পাবে।"–(সূরা আল যিলযাল ঃ ৬-৮)

বর্তমান বস্তুগত ব্যবস্থাপনায় বস্তুগত আইন-কানুনের বন্ধনের ফলে যেসব জিনিস গোপনে লোক চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে আছে, এ দ্বিতীয় ব্যবস্থাপনায় তা সবই উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্ম সত্যগুলো সেখানে স্পষ্টত সামনে এসে ধরা দেবে। এবং প্রতিটি জিনিসেরই আসল ও প্রকৃত মর্যাদা উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাবে।

لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآئَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌO

"মানুষকে বলা হবে ঃ তুমি এ জিনিস সম্পর্কে গাফলতে লিপ্ত ছিলে ; অতপর আমি তোমার চোখের আবরণ সরিয়ে দিয়েছি। এখন তোমার দৃষ্টি অতীব প্রখর।"–(সূরা আল ক্বাফ ঃ ২২)

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَاتَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌO(الحاقة : ١٨)

"সেদিন তোমাদের হাজির করা হবে। তোমাদের কোন রহস্যই গোপন থাকবে না।"–(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১৮)

সেখানে ক্রিয়াকর্মের প্রকৃত ফলাফল-বুদ্ধিবৃত্তি, বিচক্ষণতা ও বিচার-ইনসাফ মুতাবেক প্রকাশিত হবে। বর্তমান ব্যবস্থার বস্তুগত আইন-কানুন ও বস্তুগত উপায়-উপকরণের প্রভাবে ক্রিয়াকর্মের যথার্থ ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফলাফল প্রকাশ পেতে পারে না। এসব আইন-কানুন ও উপায়-উপকরণ সেখানে কার্যকরী হবে না। এ কারণে যেসব জিনিস এখানে বিচার-ইনসাফের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং নির্ভুল ফলাফল প্রকাশ পেতে দেয় না, তা সবই সেখানে নিষ্ক্রিয় এবং প্রভাবহীন হয়ে যাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে ধন-দৌলত বস্তুগত উপকরণের প্রাচুর্য, বন্ধু-বান্ধবদের শক্তি, এখানে চেষ্টা-তদবির, সুপারিশ, পারিবারিক প্রভাব, নিজস্ব চাতুর্য, সতর্ক বুদ্ধি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস মানুষকে তার বহু ক্রিয়াকর্মের ফলাফল থেকে রক্ষা করে। কিন্তু সেখানে এসব জিনিসের প্রভাব একেবারে খতম হয়ে যাবে এবং বিচার-ইনসাফ ও সত্যতা অনুসারেই প্রতিটি জিনিসের যে ফলাফল প্রকাশিত হওয়া উচিত ঠিক তাই প্রকাশিত হবে।

هُنَالِكَ تَبْلُوْا كُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْO (يونس : ٣٠)

"সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার পূর্বে কৃত আমল যাচাই করে নিবে।"
–(সূরা ইউনুস ঃ ৩০)

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ ○ (ال عمران : ٢٥)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃত আমলের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ২৫)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ج وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ ج

"সে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃত প্রতিটি সুকৃতি ও দুষ্কৃতি উপস্থিত পাবে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৩০)

وَاتَّقُوْا يَوْمًا لاَّتَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلاَ هُمْ يُنْصَرُوْنَ ○ (البقرة : ٤٨)

"সে দিনটিকে ভয় করো, যেদিন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কোন কাজে আসবে না। কারো পক্ষে কোন সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় নেয়া হবে না। আর তাদের কোন সাহায্যও করা যাবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪৮)

فَاِذَا نُفِخَ فِىْ الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَ يَتَسَاءَ لُوْنَ ○ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ○ (المؤمنون : ١٠١-١٠٣)

"অতপর যেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন তাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না। তারা একে অপরকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত করবে না। সেদিন যাদের আমলের পাল্লা ভারী হবে, তারাই কল্যাণ লাভ করবে। আর যাদের আমল হালকা হবে, তারাই হবে ক্ষতি বরণকারী।"

يَوْمَ لاَيَنْفَعُ مَالٌ وَّلاَ بَنُوْنَ ○ اِلاَّ مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ○

"সেদিন ধনমাল ও সন্তান-সন্ততি কারো উপকারে আসবে না। (সেদিন) যে ব্যক্তি নির্মল হৃদয় নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হবে, কেবল সে-ই মুক্তির অধিকারী হবে।"–(সূরা আশ শু'আরা ঃ ৮৮-৮৯)

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَاخَوَّلْنٰكُمْ وَرَاءَ ظُهُوْرِكُمْ ج وَمَا نَرٰى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فِيْكُمْ شُرَكٰٓؤُا ط لَقَدْ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَّاكُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ ○

"তোমরা আমাদের কাছে একাকী এসেছো, যেমন তোমাদেরকে আমরা প্রথমবার একাকী সৃষ্টি করেছিলাম। আমরা তোমাদেরকে যেসব সাজ-সরঞ্জাম দিয়েছিলাম, তা সবই তোমরা পিছনে ফেলে এসেছো। নিজেদের প্রতিপালন ও রেযেক দানের ব্যাপারে যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীকদার মনে করতে, সেইসব সুপারিশকারীকে আজ আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তোমাদের মধ্যকার সকল সম্পর্ক ছিন্ন ও নাকচ হয়ে গেছে।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ৯৪)

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۖ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ○ (الممتحنة : ٣)

"কিয়ামতের দিন তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে কিছুমাত্র উপকারী হবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। তোমরা যা কিছুই করছো, তিনি তা দেখছেন।"

–(সূরা মুমতাহিনা ঃ ৩)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ ○ وَأُمِّهٖ وَأَبِيْهِ ○ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ○ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُّغْنِيْهِ ○ (عبس : ٣٤-٣٧)

"সেদিন মানুষ তার ভাই, মা-বাপ, স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পলায়ন করবে। সেদিন প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থায় লিপ্ত হবে।"

–(সূরা আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

বর্তমান ব্যবস্থাপনার একটা মস্তবড়ো ত্রুটি এই যে, এখানে মানুষের কৃতকর্ম ও তার গুণপনার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পদের বিলি-বন্টন নির্ভরশীল নয়। বরং তা বহু কার্যকারণের ওপর নির্ভরশীল, যেখানে ব্যক্তিগত কৃতকর্ম ও যোগ্যতা-প্রতিভা একটি আংশিক কারণ মাত্র। সেখানে অন্যান্য শক্তিশালী কারণগুলো ব্যক্তিগত কৃতকর্মের প্রভাবকে দুর্বলতর, এমন কি কখনো কখনো একেবারে খতম করে দেয়। এ কারণেই অনুগ্রহ সম্পদের বিলি-বন্টনে ব্যক্তিগত প্রাপ্যাধিকারের কোন স্থান থাকে না কিংবা থাকলেও তা নিতান্তই কম। এখানে এক ব্যক্তি জীবন ভর যুলুম-পীড়ন ও সীমালংঘন করা সত্ত্বেও সমৃদ্ধি, সচ্ছলতা ও দুনিয়াবী ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হতে পারে। আবার এক ব্যক্তি জীবন ভর ঈমানদারী ও পরহেযগারীর সাথে অতিবাহন করা সত্ত্বেও দূরবস্থা ও দুঃখ-দৈন্যে জর্জরিত থাকতে পারে। এ অসম্পূর্ণতার পূর্ণত্ব লাভ করা প্রয়োজন। আর বিচার-বুদ্ধির দাবী এই যে, বর্তমান ব্যবস্থাপনা উন্নতিসাধন

করে এমন এক ব্যবস্থাপনায় রূপান্তরিত হওয়া উচিত, যেখানে ন্যায়পরতার সাথে সুফল ও কুফল বন্টন করা হবে এবং ব্যক্তিগত গুণাগুণের ভিত্তিতে যে যার উপযোগী, সে ঠিক তাই পাবে। কুরআন বলছে যে, পরকালীন জীবনের ব্যবস্থাপনা হবে ঠিক এরূপ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঃ

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِى الْاَرْضِ ز اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ○ (ص : ٢٨)

"যারা দুনিয়ার বুকে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে কি আরো তাদের মতো বানিয়ে দেবো ? আল্লাহভীরু ও আল্লাহদ্রোহী লোকদেরকে কি আমরা সমান করে দেবো ?

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لا سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ط سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ○ (الجثية : ٢١)

"দুষ্কৃতিকারীরা কি ধারণা করেছে যে, আমরা তাদেরকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল লোকদের সমান করে দেবো ? এবং তাদের জীবন ও মৃত্যু একরূপ হবে ? তারা কি মন্দ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করছে।"

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ط (الانعام : ١٣٢)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঠিক আমলের অনুরূপ প্রতিফল দেয়া হবে।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ১৩২)

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ (الشعراء : ٩٠-٩١)

"জান্নাতকে পরহেযগার লোকদের কাছাকাছি নিয়ে আসা হবে আর দোযখকে পথভ্রষ্ট লোকদের সামনে পেশ করা হবে।"

–(সূরা আশ শু'আরা ঃ ৯০-৯১)

বস্তুত হযরত মুহাম্মাদ (সা) এবং অন্যান্য নবীগণ বর্তমান জগতের পর যে দ্বিতীয় জগতটির কথা বলেছেন এ হচ্ছে তার সংক্ষিপ্ত নকশা। যারা এ জগত এবং এর গোটা কারখানাকে একটি রঙ্গ-তামাশা, একটি খেলাঘর, একটি নিষ্ফল হাঙ্গামা এবং আদ্যপান্ত লক্ষ্যহীন একটি গোলক ধাঁধাঁ মনে করে, তারা এ পরিকল্পনা এবং এর সাক্ষ্য প্রমাণাদির কোন বিশ্বাসযোগ্য জিনিস পাবে না বটে ; কিন্তু যারা বিশ্বব্যবস্থাকে আল্লাহর সৃষ্ট বস্তু মনে করে এবং আল্লাহকে বিচক্ষণ ও বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন সত্তা বলে বিশ্বাস করে, তারা ঐ সাক্ষ্য প্রমাণাদি

সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার পর নিশ্চিতরূপে এ ধরনের একটি বিশ্বব্যবস্থার আবশ্যকতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জীবনের সম্ভাবনা যখন প্রতিপন্ন হয়েছে, তখন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ আল্লাহ যে ধরনের একটি সম্ভাবনাময় জগত অবশ্যই সৃষ্টি করবেন—এটা বিশ্বাস করার জন্যে সম্ভাবনার আবশ্যকতা প্রমাণ করাই যথেষ্ট।

এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলাম যে পারলৌকিক জীবনের প্রতি ঈমান পোষণের দাবী জানিয়েছে, তা বিচার-বুদ্ধির বহির্ভূত তো নয়ই, বরং ঠিক বিচার-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দাবী সম্মত। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির কোন উন্নতির ফলেই ঈমান এতটুকু শিথিল হতে পারে না—অবশ্য সে উন্নতি যদি বাহ্যিক ও প্রদর্শনীমূলক না হয়ে প্রকৃত ও যথার্থ উন্নতি হয়।[১]

পরকাল বিশ্বসের আবশ্যকতা

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, এ পার্থিব জীবনের পর এক দ্বিতীয় জীবনের অস্তিত্ব প্রবল সম্ভাবনাময় ও বিচার-বুদ্ধির দাবী সম্মত। কুরআনের পেশকৃত এ দ্বিতীয় জীবনের প্রতি ঈমান আনতে সুস্থ বিচার-বুদ্ধি ও যথার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান কোন রূপ অন্তরায় সৃষ্টি করে না ; বরং তা মানুষকে আরো উদ্বুদ্ধ করে তোলে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঃ পারলৌকিক জীবন সংক্রান্ত এ ধারণার প্রতি ঈমান পোষণের আবশ্যকতা কি ? একে যেন ঈমান ও প্রত্যয়ের অঙ্গীভূত করা হয়েছে ? এর প্রতি কেন এতখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ? মুসলমান হবার জন্যে কেন এর প্রতি বিশ্বাসকে অপরিহার্য এবং এ বিশ্বাস ছাড়া মুসলমান হওয়াকে অসম্ভব করা হয়েছে ? একে অস্বীকার করলে কেন আল্লাহ, রসূল ও কিতাবের প্রতি ঈমানেও কোন ফায়দা হবে না ? কেন জীবনের যাবতীয় সুকৃতি ও সৎকাজ বিনষ্ট হয়ে যাবে ?

কেউ বলতে পারে যে, পারলৌকিক জীবন সংক্রান্ত মতবাদ অন্যান্য অতি প্রাকৃতিক মতবাদের মতোই নিছক একটি অতি প্রাকৃতিক মতবাদ মাত্র। স্বীকার করলাম যে, দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ মতবাদটিকে খুব সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করা হয়েছে এবং একে বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ বর্তমান রয়েছে। কিন্তু কোন অতি প্রাকৃতিক মতবাদ দলীল-প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হবার অর্থ এ নয় যে, তার প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতে হবে এবং তারই ওপর ঈমান ও কুফর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। পরকালীন জীবনের ন্যায় আরো বহু অতি প্রাকৃতিক মতবাদ রয়েছে এবং সেগুলোর সমর্থনে শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণও পাওয়া যায়। তাহলে সেগুলোকেও কেন ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ?

---

১. আখেরাত সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনার জন্যে তাফহীমুল কুরআন দ্বিতীয় খণ্ডে 'আখেরাত' শব্দের তাফসীর এবং এ গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে সন্নিবিষ্ট 'পারলৌকিক জীবন' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।

এর জবাব হলো ঃ পরকালীন জীবনের ধারণাটি নিছক একটি অতি প্রাকৃতিক মতবাদ হলে এ প্রশ্নটা নিশ্চয়ই একটি শক্তিশালী প্রশ্ন হতো। এমতাবস্থায় এ মতবাদটিকে ঈমান ও প্রত্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করার কোনই যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকতো না। কেননা, কোন মতবাদ নিছক অতি প্রাকৃতিক মতবাদ হলে আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। আমরা সে সম্পর্কে অনবহিত হলে কিংবা তাকে অস্বীকার করলে আমাদের নৈতিক চরিত্র ও ক্রিয়াকর্মের ওপর তার কোন প্রভাব পড়ে না। কিন্তু পরকালীন জীবন সংক্রান্ত মতবাদটি সম্পর্কে একটু তলিয়ে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে, এ নিছক একটি দার্শনিক মতবাদ নয় ; মানুষের নৈতিক ও কর্মজীবনের সাথে এর গভীর সম্পর্ক বর্তমান রয়েছে। এর প্রতি বিশ্বাসের ফলে পার্থিব জীবন এবং তার গোটা ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি মূলগতভাবে বদলে যায়। এ মতবাদটি স্বীকার করার অর্থ এই যে, মানুষ নিজেকে নিজে এক জিম্মাদার ও দায়িত্বশীল সত্তা মনে করবে। জীবনের গোটা ক্রিয়াকর্ম সে এ ভেবে সম্পাদন করবে যে, প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি ক্রিয়ার জন্যেই সে জিম্মাদার। ভবিষ্যত জীবনে তাকে নিজের যাবতীয় কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। এবং ভবিষ্যত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য তার কৃত সুকৃতি বা দুষ্কৃতির ওপর নির্ভরশীল।

পক্ষান্তরে এ মতবাদটি স্বীকার না করার অর্থ হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজেকে নিজে এক দায়িত্বহীন সত্তা মনে করবে। সে তার পার্থিব জীবনের পরিকল্পনা এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তৈরী করবে যে, এ জীবনের কৃতকর্মের জন্যে তাকে অপর কোন জীবনে জবাবদিহি করতে হবে না। এ জীবনের কৃতকর্ম ও ক্রিয়াকর্মের ফলে ভবিষ্যতে কোন ভালো কি মন্দ ফলাফল প্রকাশ পাবে না। এভাবে এ মতবাদটি সম্পর্কে অনবহিত হওয়া কিংবা একে অস্বীকার করার অনিবার্য ফল দাঁড়াবে এই যে, যেসব কৃতকর্মের ফলাফল এ দুনিয়ায় প্রকাশ পায়, মানুষের দৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ হবে। আর কোন্ কোন্ কাজ তার পক্ষে উপকারী এবং কোন্গুলো অপকারী তা এসব ফলাফলের দৃষ্টিতেই সে নির্ণয় করবে। সে বিষ খাওয়া ও আগুনে হাত দেয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। কারণ সে জানে যে, এ দু'টি কাজের মন্দ ফল তাকে এ দুনিয়ায়ই ভুগতে হবে। কিন্তু যুলুম পীড়ন, বেইনসাফী, মিথ্যাচার, পরনিন্দা, বিশ্বাস ভঙ্গ, ব্যভিচার ইত্যাকার কাজগুলোর পূর্ণ ফলাফল এ দুনিয়ায় প্রকাশ পায় না বলে এগুলোর মন্দ পরিণাম ফল এখানে যতটা প্রকাশ পাবার আশংকা হবে এগুলো ততটাই সে পরিহার করে চলবে। পক্ষান্তরে যখনই এগুলোর কোন মন্দ পরিণাম ফল প্রকাশ পাবে না কিংবা এগুলো থেকে কোন ফায়দা হাসিলের প্রত্যাশা জাগবে, তখন এ কাজগুলো করতে সে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না।

ফলকথা, এ মতবাদ অনুসারে মানুষের দৃষ্টিতে কোন নৈতিক কাজের কোন নির্দিষ্ট নৈতিক মূল্যমান থাকবে না। বরং এ দুনিয়ায় প্রকাশিত ভালো-মন্দ ফলাফলের ওপরই এর প্রতিটি কাজের ভালো-মন্দ নির্ভরশীল হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি বিশ্বাসী, সে কোন নৈতিক কাজের এ দুনিয়ায় প্রকাশিত ফলাফলের প্রতিই শুধু দৃষ্টিপাত করবে না, বরং এর পরবর্তী জীবনে প্রকাশিতব্য ফলাফলের প্রতিও সে লক্ষ্য রাখবে এবং সেই ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতেই সে কাজের উপকারিতা বা অপকারিতা নির্ণয় করবে। সে যেমন বিষের ধ্বংসকারিতা ও আগুনের দাহিকা শক্তিকে বিশ্বাস করবে। তেমনি বিশ্বাস ভঙ্গ ও মিথ্যাচারের ধ্বংসকারিতা ও দাহিকা শক্তিতেও বিশ্বাসী হবে। সে যেমন খাদ্য ও পানীয়কে উপকারী মনে করবে, তেমনি ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতাকেও উপকারী জ্ঞান করবে। সে তার প্রতিটি কাজের একটি সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত ফলাফলে সে ফলাফল এ জীবনে আদৌ প্রকাশিত না হতে পারে কিংবা বিপরীত রূপেও প্রকাশ পেতে পারে—বিশ্বাসী হবে। তার কাছে নৈতিক ক্রিয়াকর্মের নির্ধারিত নৈতিক মূল্যমান থাকবে এবং পার্থিব উপকার বা অপকারের ফলে সে মূল্যমানে এতটুকু পরিবর্তন সূচিত হবে না। তার নৈতিক ব্যবস্থায় সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ওয়াদা পালন অবশ্যই পুণ্য ও সুকৃতিরূপে তার ফলে এ দুনিয়ায় শুধু অপকারই হতে পারে কিংবা আদৌ উপকার না হতে পারে—গণ্য হবে। পক্ষান্তরে মিথ্যাচার, যুলুম-পীড়ন, ওয়াদা ভঙ্গ অবশ্যই পাপ ও দুষ্কৃতি রূপে—তার ফলে দুনিয়ায় শুধু উপকারই হতে পারে এবং একবিন্দুও অপকার না হতে পারে-স্বীকৃত হবে।

কাজেই পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে উদাসীন হওয়া কিংবা তার প্রতি অবিশ্বাস করার অর্থ কেবল এটুকু নয় যে, মানুষ একটি অতি প্রাকৃতিক মতবাদের প্রতি উদাসীন রয়েছে কিংবা তার প্রতি সে অস্বীকৃতি জানিয়ে দিয়েছে। বরং তার অর্থ এই যে, মানুষ তার দায়িত্বশীল ও জিম্মাদারসুলভ মর্যাদা সম্পর্কেই উদাসীন হয়ে পড়েছে। নিজেকে সে স্বাধীন, স্বেচ্ছাচারী ও দায়িত্বহীন প্রাণী মনে করে নিয়েছে। দুনিয়ার বাহ্যিক জীবন এবং তার অসম্পূর্ণ, বরং কখনো কখনো প্রতারণাদায়ক ফলাফল দেখে সে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। জীবনের চূড়ান্ত লাভ-লোকসানের প্রতি উদাসীন হয়ে প্রাথমিক, সাময়িক ও অনির্ভরযোগ্য লাভ-ক্ষতির ওপর সে ভরসা করে বসেছে। এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে সে নিজের ক্রিয়াকর্মের জন্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল ও প্রতারণাদায়ক নৈতিক মূল্যমান নির্ধারণ করে নিয়েছে। সে এক নির্ভুল, সুদৃঢ় ও নৈতিক বিধান থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে, যা শুধু দায়িত্বানুভূতি ও চূড়ান্ত ফলাফলের প্রতি অবিচল দৃষ্টি ও নির্দিষ্ট নৈতিক মূল্যমানের দ্বারাই অর্জিত হতে

পারে। এভাবে সে দুনিয়ার অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ বাহ্যদৃশ্য দ্বারা প্রতারিত হয়ে নিজের গোটা জীবন এমন এক দুর্বল ও ভ্রান্ত নৈতিক বিধানের অধীন যাপন করেছে, যেখানে প্রকৃত ক্ষতি লাভে পরিণত হয়েছে, আর প্রকৃত লাভ-ক্ষতি আখ্যা পেয়েছে। সেখানে প্রকৃত সুন্দর অসুন্দর হয়ে গেছে আর প্রকৃত অসুন্দর সুন্দর আখ্যা পেয়েছে। অনুরূপভাবে যথার্থ পাপ পুণ্য হয়ে গেছে আর যথার্থ পুণ্য পাপে পরিণত হয়েছে।

বস্তুত পরকালের প্রতি ঈমান না আনার এ ফলাফলগুলোই কুরআন মজীদ অত্যন্ত বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করেছে। এ ব্যাপারে কুরআনী আয়াত পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে, পরকাল না মানার ফলে মানুষের নৈতিক ও কর্মজীবনে যেসব বিকৃতির উদ্ভব হয়, তা এক একটি করে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এক ঃ মানুষ নিজেকে উদ্দেশ্যহীন, স্বেচ্ছাচারী দায়িত্বহীন সত্তা মনে করে। নিজের জীবনকে সামগ্রিকভাবে নিষ্ফল ও নিরর্থক জ্ঞান করে। তার কাজের কোন তত্ত্বাবধায়ক ও হিসেব গ্রহণকারী নেই — এ ভেবে সে যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে ঃ

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَاتُرْجَعُوْنَ-(المؤمنون : ١١٥)

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছ যে, আমরা তোমাদের নিরর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে না ?"--(মু'মিনুন ঃ ১১৫)

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًىO(القيامة : ٣٦)

"মানুষ কি মনে করেছে যে, তাকে এরূপ নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে ?"
–(সূরা কিয়ামাহ ঃ ৩৬)

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌO يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًاO اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌO(البلد : ٥-٧)

"মানুষ কি ধারণা করেছে যে, তার ওপর কারো ক্ষমতা চলবে না ? সে বলে যে, আমি বিস্তর মাল ব্যয় করেছি। সে কি মনে করে যে, কেউ তাকে দেখেনি ?"–(সূরা আল বালাদ ঃ ৫-৭)

দুই ঃ এহেন লোকের দৃষ্টি কেবল দুনিয়ার বাহ্যদিকের ওপরই নিক্ষিপ্ত হয়। প্রাথমিক ও সাময়িক ফলাফলকেই সে চূড়ান্ত ও প্রকৃত ফলাফল মনে করে নেয়। এর দ্বারা প্রতারিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত করে বসে ঃ

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ ○

"তারা দুনিয়াবী জীবনের শুধু বাহ্যদিক সম্পর্কেই জ্ঞান রাখে আর পরকাল সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন।"-(সূরা আর রূম ঃ ৭)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّوْا بِهَا

"যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা রাখে না এবং দুনিয়াবী জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট ও নিশ্চিত হয়ে গেছে।"-(সূরা ইউনুস ঃ ৭)

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ○ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ○ (القيمة : ٢٠-٢١)

"কখনো নয়, তোমরা তো শীঘ্র পাওয়ার যোগ্য ফলাফলকেই পসন্দ করো আর পরকালের ফলাফলকে বর্জন করো।"-(সূরা কিয়ামাহ ঃ ২০-২১)

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○ (الاعلى : ١٦-١٧)

"তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো, অথচ পরকাল হচ্ছে উত্তম এবং অধিকতর স্থায়ী।"-(সূরা আ'লা ঃ ১৬-১৭)

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ○ (الاعراف : ٥١)

"তাদেরকে পার্থিব জীবন ধোঁকায় নিক্ষেপ করেছে।"

তিন ঃ এ বাহ্যদৃষ্টির ফল দাঁড়ায় এই যে, মানুষের দৃষ্টিতে বস্তুনিচয়ের মূল্যমান একেবারেই উল্টো হয়ে যায়। যেসব জিনিস প্রকৃত প্রস্তাবে চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে ক্ষতিকর, আপাত লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখার ফলে সেগুলোকেই সে উপকারী মনে করে বসে। যেসব কর্মকাণ্ড চূড়ান্ত ফলাফলের দিক থেকে ভ্রান্ত, প্রাথমিক ফলাফল লক্ষ্য করেই সেগুলোকে সে কল্যাণকর ভাবতে শুরু করে। এ কারণেই তার পার্থিব চেষ্টা-সাধনা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা নিষ্ফল হয়ে যায়।

قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يٰلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ اُوْتِيَ قَارُوْنُ ۙ اِنَّهٗ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ○ (القصص : ٧٩-٨٠)

"যারা পার্থিব জীবনেরই কল্যাণ কামনা করছিলো, তারা বললো ঃ হায় ! কারুনকে যা দেয়া হয়েছিলো, আমরাও যদি তাই পেতাম ! সে বড়োই

সৌভাগ্যবান। আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিলো, তাঁরা বললো ঃ তোমাদের জন্যে পরিতাপ ! যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তার জন্যে আল্লাহর পুরস্কারই হচ্ছে উত্তম।"-(সূরা কাসাস ঃ ৭৯-৮০)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ○

"যারা পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, তাদের জন্যে আমরা তাদের ক্রিয়াকাণ্ডকে খুবই চিত্তাকর্ষক বানিয়ে দেই এবং এভাবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে থাকে।"-(সূরা আন নামল ঃ ৪)

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ ○ نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرٰتِ ط

بَلْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ○ (المؤمنون : ٥٥ـ٥٦)

"এরা কি এ ভ্রান্তিতে ডুবে আছে যে, আমরা এদেরকে ধনমাল ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করছি বলে এদের কল্যাণ বিধানেও তৎপর রয়েছি ? কিন্তু এরা প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধি করে না।"-(সূরা মু'মিনুন ঃ ৫৫-৫৬)

هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ○ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ

رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ـ (الكهف : ١٠٣ـ١٠٥)

"আমরা কি তোমাদের বলবো যে, আমলের দিক থেকে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত লোক কারা ? এ হচ্ছে তারা, যাদের চেষ্টা-সাধনা দুনিয়ার জীবনে ভ্রষ্টপথে চালিত হয়েছে ; কিন্তু তারা মনে করছিলো যে, তারা খুব ভালো কাজ করছে। এসব লোকেরাই আপন প্রভুর নিদর্শনাদি এবং তার সাক্ষাতকারকে অস্বীকার করেছে। এ জন্যেই তাদের আমল পণ্ড হয়ে গেছে।"

-(সূরা আল কাহাফ ঃ ১০৪-১০৫)

চার ঃ এ ধরনের লোক কখনো সত্য দ্বীনকে গ্রহণ করতে পারে না। তার সামনে কখনো নৈতিক আদর্শ, সৎকার্য ও সদাচরণের নীতি পেশ করা হলে সেগুলোকে সে নাকচ করে দেবে আর এ সবের বিপরীত আকীদা ও আমল পেশ করা হলে সেগুলোকে সে গ্রহণ করবে। কারণ সত্য দ্বীনের সমস্ত নিয়ম-নীতি পার্থিব জীবনের বহু কল্যাণ ও উপকার এবং বহু স্বাদ আনন্দের কুরবানী দাবী করে। তার মূলনীতি ও শিক্ষা হলো ঃ পরকালের উত্তম ও চিরস্থায়ী কল্যাণের জন্যে দুনিয়ার অস্থায়ী ও সাময়িক কল্যাণকে কুরবান করে দিতে হবে। কিন্তু পরকাল অবিশ্বাসী ব্যক্তি এ দুনিয়ার কল্যাণকেই চূড়ান্ত কল্যাণ

মনে করে। এ কারণেই সে এ ধরনের কোন কুরবানীর জন্যে যেমন প্রস্তুত হতে পারে না, তেমনি দ্বীনদারির যেসব নিয়ম-নীতি এরূপ কুরবানীর দাবী করে, সেগুলোকেও সে গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই পরকাল অবিশ্বাস আর সত্য দ্বীনের অনুসরণ এ দু'টি পরস্পর বিরোধী জিনিস। যে ব্যক্তি পরকালে অবিশ্বাসী, সে কখনো সত্য দ্বীনের অনুসারী হতে পারে না।

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ط وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّايُؤْمِنُوْا بِهَا ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَايَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً ج وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلاً ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ○ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَآءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ط هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○ (الاعراف : ١٤٦-١٤٧)

"যারা দুনিয়ার বুকে না-হকভাবে অহংকার করে, আমি তাদেরকে আপন নিদর্শন থেকে বিমুখ করে দেবো। তারা কোন নিদর্শন দেখতে পেলেও তার প্রতি ঈমান আনবে না, কখনো সরল পথ দেখতে পেলেও তা অবলম্বন করবে না, অবশ্য ভ্রান্ত পথ দেখতে পেলে সেদিকে ধাবিত হবে। এর কারণ এই যে, তারা আমার নিদর্শনাদিকে অবিশ্বাস করেছে এবং সেগুলোর প্রতি উদাসীন হয়ে আছে। যারা আমার নিদর্শন এবং পরকালের সাক্ষাতকারকে অবিশ্বাস করবে, তাদের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড নিষ্ফল হয়ে যাবে। তারা যেমন আমল করেছে, তেমনি প্রতিফলই কি পাবে না ?"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৪৬-১৪৭)

পাঁচ ঃ পরকাল অবিশ্বাসের দ্বারা মানুষের গোটা নৈতিক ও কর্মজীবনই প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। সে অহংকারী ও বিদ্রোহী হয়ে যায় ঃ

فَالَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ

"যারা পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে না, তাদের মন সত্য কথাকে অস্বীকার করতে থাকে এবং তারা অহংকারী হয়ে যায়।"

–(সূরা আন নহল ঃ ২২)

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهُ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَايُرْجَعُوْنَ○ (القصص : ٣٩)

"ফেরাউন এবং তার লশকরগণ দুনিয়ার বুকে না-হকভাবে অহংকার করে এবং মনে করে যে, আমার কাছে তাদের কখনো ফিরে আসতে হবে না। তার আচরণ ও কাজ-কারবার বিকৃত হয়ে যায়।"–(সূরা কাসাস ঃ ৩৯)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ○ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ○ وَاِذَا كَالُوْا هُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ○ اَلاَ يَظُنُّ اُولٰـئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ○ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ○ (المطففين : ١-٥)

"সেসব অসদাচারী লোকদের জন্যে ধ্বংস অবধারিত, যারা অন্যদের কাছ থেকে নেয়ার সময় তো পুরোপুরি মেপে নেয়, কিন্তু অন্যদেরকে মেপে দেয়ার সময় কম দিয়ে থাকে। তারা কি মনে রাখে না যে, তারা এক বিরাট দিনে পুনরুত্থিত হবে ?"–(সূরা আল মুতাফফিফিন ঃ ১-৫)

সে কঠিন হৃদয়, সংকীর্ণ দৃষ্টি, প্রদর্শনকারী, স্বার্থপর এবং আল্লাহর বন্দেগীর প্রতি পরান্মুখ হয়ে যায় ঃ

وَاَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○ (سورة الماعون : ١-٧)

"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো, যে প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করে ? এরূপ ব্যক্তিই এতীমকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহ প্রদান করে না। অতএব সেই নামাযীদের জন্যে পরিতাপ, যারা নিজেদের নামায সম্পর্কে উদাসীন থাকে। এরা সৎকাজ করে শুধু লোক দেখানোর জন্যেই। এরা লোকদেরকে ছোটখাটো এবং সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস দিতেও কার্পণ্য করে।"–(সূরা মাউন ঃ ১-৭)

ফলকথা, সত্যকে উপেক্ষা করে চলা এবং গোনাহর কাজে লিপ্ত হওয়া পরকাল অবিশ্বাসের অনিবার্য পরিণতি।

وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖ اِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ○ (المطففين : ١٢)

"সত্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে এবং গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়েছে এমন সব লোকেরাই প্রতিফল দিবসকে অবিশ্বাস করে থাকে।"

–(সূরা মুতাফফিফিন ঃ ১২)

বস্তুত পরকাল বিশ্বাসের প্রতি উদাসীন কিংবা অবিশ্বাসী হবার এ পরিণাম ফলগুলোকে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে না। বিশেষত, পার্থিব জীবনের বাহ্য চাকচিক্যের দ্বারা সন্মোহিত হয়ে জীবনের শুধু পার্থিব ও বৈষয়িক লক্ষ্যবিন্দুর ওপর যে সভ্যতার ইমারত গড়ে উঠেছে এবং যাতে পরকাল বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে, তার ফলাফল দেখার সুযোগ আমাদের ঘটেছে। এরপরে পরকাল অবিশ্বাসের সাথে আল্লাহ পরস্তি, দ্বীনদারী ও নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা যে একেবারে অসম্ভব আমাদের পক্ষে এ সত্য অস্বীকার করার কোনই অবকাশ নেই।

অথচ লক্ষণীয় বিষয় হলো ঃ ইসলাম এ জিনিসগুলোকেই পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে মানুষকে উত্তম চরিত্র এবং সৎকর্মরাজির দিকে আহ্বান জানায়। তার জন্যে দুনিয়ার বহুবিধ বৈষয়িক স্বার্থ ও আনন্দকে বিসর্জন দেয়া আবশ্যক। সে মানুষকে আল্লাহর ইবাদাত ও আত্মসংশোধনের উপদেশ দেয়, যার কোন ফায়দা বা কল্যাণ এ দুনিয়ার জীবনে লক্ষ্য করা যায় না বরং তার বিপরীত বহু প্রকার কষ্টক্লেশে মানুষের দেহ-মনকে জর্জরিত হতে হয়। সে জীবনের সকল বিষয় এবং দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জাম থেকে উপকৃত হবার ব্যাপারে হারাম-হালাল ও পবিত্রতা-অপবিত্রতার পার্থক্য বিচার করে। সে উচ্চতর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত মানুষের কাছে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রেম-ভালবাসা এবং কখনো কখনো জান ও মাল পর্যন্ত কুরবানী করে দেয়ার দাবী জানায়। সে মানুষের জীবনকে এমন একটি নৈতিক বিধানের দ্বারা সুসংবদ্ধ করতে চায়, যাতে পার্থিব লাভ-ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে প্রতিটি জিনিসের একটি বিশেষ মূল্যমান নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বস্তুত এহেন দ্বীন শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে কি মানুষ পরকাল বিশ্বাস ছাড়া কামিয়াব হতে পারতো ? এহেন আকীদার প্রতি উদাসীন কিংবা অবিশ্বাসী হয়েও মানুষের পক্ষে এরূপ শিক্ষা গ্রহণ করা কি সম্ভবপর ছিলো ? এর জবাব যদি নেতিবাচক হয়—আর অবশ্যই নেতিবাচক হবে—তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, এ ধরনের দ্বীনি ব্যবস্থা ও নৈতিক বিধানের প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বপ্রথম মানুষের মনে পরকাল বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে দেয়া অপরিহার্য। বস্তুত এ কারণেই ইসলাম এ প্রত্যয়টিকে বুনিয়াদী ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং ঈমান বিল্লাহর পর এর প্রতিই সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে।

এবার ইসলাম এ প্রত্যয়টিকে কী আকারে পেশ করেছে এবং তা দ্বারা মানুষের চরিত্র ও আচরণের ওপর কী প্রভাব পড়ে তা দেখা যাক।

দুনিয়ার ওপর পরকালের অগ্রাধিকার

কুরআন মজিদ সর্বপ্রথম যে জিনিসটি মানুষের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছে, তাহলো এই যে, দুনিয়া মানুষের একটি অস্থায়ী বাসস্থান। তার জন্যে

কেবল এটিই একমাত্র জীবন নয়, বরং এরপর এর চেয়েও এক উত্তম ও চিরস্থায়ী জীবন রয়েছে। সে জীবনের কল্যাণ এখানকার কল্যাণের চেয়ে অনেক বেশী প্রশস্ত এবং সেখানকার অকল্যাণ এখানকার অকল্যাণের চেয়ে অনেক বেশী কঠোর। যে ব্যক্তি এ দুনিয়ার বাহ্য চাকচিক্য দ্বারা প্রতারিত হয়ে এরই সুখ-সম্ভোগ ও স্বার্থ লাভের জালে জড়িয়ে পড়ে এবং সেগুলো অর্জন করার প্রচেষ্টার ফলে সেই পরজীবনের সুখ-সম্পদ ও স্বার্থ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, সে অত্যন্ত মন্দ জিনিসই খরিদ করে। বরং প্রকৃতপক্ষে তার এই গোটা কারবারটিই হচ্ছে অতিব ক্ষতিকর কারবার। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি এ দুনিয়ার ক্ষতিকেই চূড়ান্ত ক্ষতি মনে করে এবং এর থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে নিজেকে সেই পরজীবনের ক্ষতির উপযোগী করে তোলে সে যারপর নেই নির্বুদ্ধিতার কাজ করে এবং তার এ কাজকে কিছুতেই বুদ্ধিমত্তাসূলভ বলা যেতে পারে না। এ বিষয়টিকেই কুরআন মজিদে এতো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, এতদসংক্রান্ত সমস্ত আয়াত এখানে একত্রিত করা সম্ভবপর নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ،

"এ দুনিয়া নিছক খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীবনের প্রকৃত আবাস হচ্ছে পরকাল।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৬৪)

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ ج وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى قف ـ(النساء : ٧٧)

"(হে মুহাম্মাদ,) বলে দাও, দুনিয়ার সুখ-সম্পদ খুবই নগণ্য। যে ব্যক্তি তাকওয়ার সাথে জীবন যাপন করে, তার জন্যে পরকালই উত্তম।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৭)

اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلاَّ قَلِيْلٌ ○ (التوبة : ٣٨)

"তোমরা কি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেছো ? দুনিয়ার জীবনের সুখ-সম্পদ তো পরকালের তুলনায় খুবই নগণ্য।"
–(সূরা আত তাওবা ঃ ৩৮)

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ○ (الاعلى : ١٦-١٧)

"তোমরা দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দান করো ; অথচ পরকালই অধিক উত্তম এবং স্থায়ী।"–(সূরা আল আ'লা ঃ ১৬-১৭)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ط وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○ (ال عمران : ١٨٥)

"প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর তোমরা এ জীবনের পুরোপুরি প্রতিফল কিয়ামতের দিন পাবে। অতএব সেদিন যে ব্যক্তি দোযখের শাস্তি থেকে বেঁচে গেলো এবং জান্নাতে প্রবেশ লাভ করলো, আসলে সে-ই সফলকাম হলো। আর দুনিয়ার জীবনটুকু ধোঁকার সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছুই নয়।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا أُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○ (هود : ١١٦)

"যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, তারা তাদেরকে প্রদত্ত সুখ-সম্ভোগের পেছনেই পড়ে রয়েছে আর এরাই হচ্ছে অপরাধী।"–(সূরা হূদ ঃ ১১৬)

قُلْ إِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط أَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ○ (الزمر : ١٥)

"(হে মুহাম্মদ !) বলে দাও ঃ কঠিন ক্ষতিতে লিপ্ত হচ্ছে তারাই, যারা নিজেদেরকে এবং নিজস্ব সন্তান-সন্ততিকে কিয়ামতের দিন ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে ইহাই হচ্ছে প্রকৃত ও সুস্পষ্ট ক্ষতি।"–(সূরা যুমার ঃ ১৫)

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ○ وَآثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ○ فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى ○ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ○ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ○

"অতপর যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করেছে এবং দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর যে ব্যক্তি আপন প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করেছে এবং আপন প্রবৃত্তিকে লালসার হাত থেকে রক্ষা করেছে, তার ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।"

–(সূরা আন নাযিআত ঃ ৩৭-৪১)

اِعْلَمُوْا أَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ط كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ط وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ لا وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ○ (الحديد : ٢٠)

"জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবনে রয়েছে শুধু খেল-তামাশা, শোভা-সৌন্দর্য, পারস্পরিক অহংকার এবং ধনমাল ও সন্তান-সন্ততিতে পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করা। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে বৃষ্টির মতো ঃ বৃষ্টির দ্বারা ফসল পূর্ণরূপে উৎপাদিত হয় এবং কৃষক তা দেখে আনন্দ প্রকাশ করে। অতপর তা থেকে পেকে শুকিয়ে যায় ; আর তুমি দেখতে পাচ্ছো তা ধূসর বর্ণ হয়ে গেছে এবং মাটিতে মিশে গেছে। এরপর হচ্ছে পরকালের জীবন, যেখানে কারো জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি আর কারো জন্যে আল্লাহর প্রদত্ত মাগফেরাত এবং সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন হচ্ছে নিছক একটি ধোঁকার উপকরণ মাত্র।"–(সূরা আল হাদীদ ঃ ২০)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ○ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط (ال عمران : ١٤-١٥)

"লোকদের জন্যে নারী, শিশু, সোনা ও রূপার স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া, পশু ও ফসলের ভালবাসাকে আকর্ষণীয় করে দেয়া হয়েছে। এগুলো হচ্ছে পার্থিব জীবনের সুখ-সম্পদ ও সরঞ্জাম। কিন্তু আল্লাহর কাছে রয়েছে এর চেয়ে উত্তম ঠিকানা। হে মুহাম্মাদ, বলে দাও ঃ আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম সুখ-সম্পদের কথা বলবো ? যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্যে তাদের প্রভুর কাছে রয়েছে জান্নাত, যার নিম্নদেশ নিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং পবিত্র জোড়া লাভ করবে আর তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হবে।"–(আলে ইমরান ঃ ১৪-১৫)

দুনিয়ার ওপর পরকালকে অগ্রাধিকার দেয়া, পরকালের স্থায়ী সাফল্যের জন্যে দুনিয়ার অস্থায়ী স্বার্থ লাভকে কুরবান করা এবং পরকালের স্থায়ী ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ক্ষতিকে বরদাশত করার এ শিক্ষা ইসলামে অত্যন্ত জোরালো ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য

হলো ঃ কুরআন ও মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি ঈমান পোষণকারী ব্যক্তি কোন জোর-জবরদস্তির বলে নয়, বরং মনের ঐকান্তিক আকর্ষণেই এমন প্রতিটি কাজ সম্পাদন করবে, যাকে আল্লাহ ও রসূল পরকালের সাফল্যের উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। অনুরূপভাবে সে এমন প্রতিটি জিনিস পরিহার করে চলবে, যাকে তাঁরা উভয়েই পরকালের ক্ষতির কারণ বলে অভিহিত করেছেন—দুনিয়ার জীবনে তা যতোই উপকারী বা ক্ষতিকর বিবেচিত হোক না কেন।

আমলনামা ও আল্লাহর আদালত

কুরআন মজিদ আর যে জিনিসটি মানুষের মনে বদ্ধমূল করার প্রয়াস পেয়েছে তাহলো এই যে, মানুষ এ পার্থিব জীবনে যে কোন কাজই করে—তা যতোই লুকিয়ে করুক না কেন—তার সঠিক ও নির্ভুল রেকর্ড সুরক্ষিত থাকে। কিয়ামতের দিন এ রেকর্ডই আদালতে পেশ করা হবে। মানুষের ক্রিয়াকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি অণু-পরমাণু তার কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে। এমন কি, তার নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে কাঠগড়ায় গিয়ে খাড়া হবে। তাছাড়া তার আমলনামা বা কর্মলিপি অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ওজন করা হবে। ন্যায় দণ্ডের এক পাল্লায় থাকবে তার সৎকর্মরাজি এবং অন্য পাল্লায় থাকবে মন্দ কাজগুলো। যদি সৎকাজের পাল্লা ভারী হয় তবে পরকালের সাফল্য তাকে স্বাগত জানাবে। এবং তার বাসস্থান হবে বেহেশতে। আর দুষ্কৃতির পাল্লা ভারী হলে তার পরিণাম হবে ধ্বংস ও বিনাশ এবং তার জন্যে নির্ধারিত হবে দোযখ নামক নিকৃষ্টতম স্থান। আল্লাহর সেই আদালতে প্রত্যেকেই নিজের কর্মলিপি নিয়ে একাকী উপস্থিত হবে। সেখানে মান-সম্মান, বংশ গৌরব, চেষ্টা-তদবীর, ধন-দৌলত, শক্তি-সামর্থ ইত্যাদি দুনিয়ার কোন সরঞ্জামই তার কাজে আসবে না।

এ বিষয়টিকেও কুরআন অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে বিবৃত করেছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা যাচ্ছে ঃ

কর্মলিপির অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

سَوَآءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ط

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি লুকিয়ে কথা বলে আর যে সজোরে বলে, যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে, আর যে দিনের আলোয় চলাফিরা করছে—উভয়ের অবস্থাই সমান। অবশ্য প্রত্যেকের সামনে ও পেছনে

তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে এবং তারা আল্লাহর নির্দেশে তার প্রতিটি কথা সংরক্ষণ করছে।"-(সূরা আর রাদ ঃ ১০-১১)

وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰهَا ۚ وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاضِرًا ط (الكهف : ٤٩)

"কর্মলিপি পেশ করা হলে তাতে যা কিছু লেখা থাকবে, তুমি দেখবে যে অপরাধী তাতে ভয় পেয়ে যাবে। বলবে ঃ হায় ! এ কিতাবের কী অবস্থা ! কোন ছোট কিংবা বড়ো জিনিসই এতে বর্জন করা হয়নি। সবই এতে বর্তমান রয়েছে। বস্তুত তারা যাকিছু আমল করেছিলো তা সবই তারা উপস্থিত পাবে।"-(সূরা আল কাহাফ ঃ ৪৯)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য এবং মানুষের স্বীকৃতি ঃ

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

"সেদিন তাদের স্বীয় জিহ্বা এবং তাদের হাত-পা তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করবে।"-(সূরা আন নূর ঃ ২৪)

حَتّٰۤى اِذَا مَاجَاۤءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْۤا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِىْۤ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ..... وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَاۤ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَايَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ (حم السجدة : ٢٠-٢٢)

"এমন কি যখন সেখানে পৌঁছবে, তখন তার কান, তার চোখ এবং তার চামড়া তার কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে। সে তার চামড়াকে বলবেঃ তুমি আমার বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে ? সে জবাব দেবে ঃ যে আল্লাহ প্রতিটি জিনিসকে বাকশক্তি দেন, তিনিই আমাকে বাকশক্তি দিয়েছেন।.... তোমরা লুকিয়ে কাজ করতে এবং একথা জানতে না যে, তোমাদের স্বীয় কান, চোখ এবং চামড়া তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্যদান করবে। বরং তোমরা ভাবতে যে, তোমাদের বহু ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ পর্যন্ত অনবহিত।"-(সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ২০-২২)

وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ○(الانعام : ١٣٠)

"তারা খোদ নিজেদের বিরুদ্ধে এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা অকৃতজ্ঞ বান্দাহ ছিলো।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৩০)

এহেন কর্মলিপি এবং এসব সাক্ষী সহ মানুষ আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হবে। অতপর এ উপস্থিতির অবস্থা কিরূপ হবে ? সে সম্পূর্ণ একাকী ও অসহায়ভাবে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে খাড়া হবে।

وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰى كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمْ مَّا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُوْرِكُمْ ج (الانعام : ٩٤)

"তোমাকে প্রথমবার যেরূপ সৃষ্টি করেছিলাম, ঠিক তেমনি আজ তুমি আমাদের কাছে একাকী এসেছো। তোমাকে যেসব জিনিস দান করেছিলাম, তা সবই তুমি ছেড়ে এসেছো।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৯৪)

সেখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিসেব পেশ করবে ঃ

وَكُلَّ اِنسَانٍ اَلْزَمنٰهُ طٰئِرَه فِى عُنُقِه ط وَنُخْرِجُ لَه يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا○ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ط كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا○

"প্রত্যেকের ভালো ও মন্দ কর্মলিপি আমরা তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি। আমরা তার জন্যে কিয়ামতের দিন একটি কিতাব বের করবো, যা সে নিজের সামনে উন্মুক্ত পাবে। তাকে বলা হবে ঃ নিজের কর্মলিপি পড়ে দেখ। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসেব করার জন্যে যথেষ্ট।"
–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৩-১৪)

সেখানে বংশগত প্রভাব-প্রতিপত্তি কোন কাজে আসবে না ঃ

لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ج يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ج -(الممتحنة : ٣)

"কিয়ামতের দিন তোমাদের গোত্রীয় সম্পর্ক এবং সন্তান-সন্ততি কোনই কাজে আসবে না।"–(সূরা আল মুমতাহিনা ঃ ৩)

সেখানে সুপারিশের দ্বারা কোন ফলোদয় হবে না ঃ

مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ○(المؤمن : ١٨)

"যালেমদের জন্যে না কোন বন্ধু হবে, না কোন সুপারিশকারীর কথা মানা হবে।"–(সূরা মুমেন ঃ ১৮)

সেখানে উৎকোচের কারবার চলবে না ঃ

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ـ(الشعراء : ٨٨)

"সেদিন না ধনমাল কোন কাজে আসবে, আর না সন্তান-সন্ততি।"

মানুষের কৃতকর্ম ওজন করা হবে এবং প্রতিটি অণু-পরামাণু হিসেব করা হবে ঃ

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ط وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَابِهَا ط وَكَفٰى بِنَا حٰسِبِيْنَ ٥(الانبياء : ٤٧)

"আমরা কিয়ামতের দিন নির্ভুল পরিমাপকারী তুলাদণ্ড রেখে দেব। কারো ওপর বিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। যদি একটি শর্ষে পরিমাণও আমল হয়, তবু আমরা তা উপস্থিত করবো। আর হিসেব গ্রহণের জন্যে আমরাই যথেষ্ট।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৪৭)

সেখানে শাস্তি ও পুরস্কার সবকিছুই হবে আমল অনুযায়ী ঃ

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥(الجاثية : ٢٨)

"তোমরা যেরূপ আমল করছিলে আজ সেরূপই তোমাদের প্রতিফল দেয়া হবে।"–(সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৮)

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ط(الانعام : ١٣٢)

"প্রত্যেকে যেরূপ আমল করেছে, তার জন্যে তেমনই মর্যাদা হবে।"

বস্তুত এ পুলিশ ও আদালতের ভয়ই মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছে। এটা দুনিয়ার পুলিশ নয় যে, তার দৃষ্টি থেকে মানুষ আত্মগোপন করতে পারে। তেমনি এটা দুনিয়ার আদালত নয় যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় না হওয়া অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য সংগৃহীত হওয়া কিংবা অবৈধ প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার ফলে মানুষ তার পাকড়াও থেকে মুক্তি পেতে পারে। বরং এ পুলিশ সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তার তত্ত্বাবধান করে চলছে। এ আদালতের সাক্ষীদের দৃষ্টি থেকে সে কিছুতেই রক্ষা পেতে পারে না। এর কাছে মানুষের প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের রেকর্ড বর্তমান রয়েছে। এর ফয়সালা এমনি সুবিচার মূলক যে, কোন দুষ্কৃতিই শাস্তি থেকে এবং সৎকাজই পুরস্কার থেকে ছাড়া পেতে পারে না।

পরকাল বিশ্বাসের উপকার

এভাবে ইসলাম পরকাল বিশ্বাসকে তার নৈতিক বিধি ও শরীয়ত ব্যবস্থার জন্যে একটি মস্তবড়ো বুনিয়াদ তৈরী করে দিয়েছে। এতে একদিকে পুণ্য ও কল্যাণকে অবলম্বন করার এবং ধ্বংস ও বিনাশ থেকে আত্মরক্ষা করার বুদ্ধি-বৃত্তিক প্রেরণা বর্তমান রয়েছে, অন্যদিকে সৎকাজের নিশ্চিত পুরস্কার এবং দুষ্কৃতির নিশ্চিত শাস্তির ভয়ও নিহিত রয়েছে। ইসলামের এ বিধি ও ব্যবস্থা তার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের জন্যে কোনরূপ বৈষয়িক শক্তি ও প্রশাসনিক ক্ষমতার মুখাপেক্ষী নয়। বরং সে পরকাল বিশ্বাসের সাহায্যে মানব মনে এক প্রচণ্ড বিবেক শক্তি জাগিয়ে তোলে। সে শক্তি কোন বাহ্য প্রলোভন ও ভয়-ভীতি ছাড়াই মানুষকে স্বভাবত সেইসব সৎকাজের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে, যেগুলোকে ইসলাম চূড়ান্ত পরিণাম ফলের দিক দিয়ে সৎকাজ বলে আখ্যা দিয়েছে। অনুরূপ-ভাবে সে সেইসব দুষ্কৃতি থেকে আত্মরক্ষা করার প্রেরণা দেয়, যেগুলোকে ইসলাম চূড়ান্ত পরিণাম ফলের দৃষ্টিতে দুষ্কৃতি বলে সাব্যস্ত করেছে।

কুরআন মজীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে তার বিভিন্ন জায়গায় এ প্রত্যয়টিকে নৈতিক আদর্শ শিক্ষা দেয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয়েছে। লোকদেরকে আল্লাহভীতি ও পরহেযগারির নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথেই বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ط (البقرة : ٢٢٣) আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, তাঁর কাছে তোমাদেরকে হাযির হতেই হবে। আল্লাহর পথে আত্মত্যাগের জন্যে উৎসাহিত করার সাথে সাথে এ নিশ্চয়তাও দেয়া হয়েছে যে, তোমরা মারা গেলে প্রকৃত প্রস্তাবে মারা যাবে না, বরং চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে। وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ (البقرة : ١٥٤) দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য অবলম্বনের উপদেশ দান প্রসঙ্গে এ-ও বলে দেয়া হয়েছে যে, ধৈর্যশীলদের জন্যে আল্লাহর কাছে অফুরন্ত রহমত ও অনুগ্রহ রয়েছে ঃ اُولٰۗىِٕكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۔ নির্ভীকতা ও সাহসিকতার উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়েছে এভাবে ঃ

قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ لا كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط (البقرة : ٢٤٩)

"যারা মনে করতো যে, তাদেরকে আল্লাহর কাছে হাযির হতে হবে, তারা বললো ঃ আল্লাহর হুকুমে ক্ষুদ্র দলই বিরাট বাহিনীর ওপর বিজয়ী হয়ে থাকে।" কঠিনতম বিপদের মুকাবিলায় সুদৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি যোগানো হয়েছে এই বলে ঃ وَنَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط (التوبة : ٨١) "জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার

উত্তাপের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র।" সৎকাজে অর্থ ব্যয় করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এ বলে ঃ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ○(البقرة : ২৭২ তোমরা যা কিছু দান করবে, তার পূর্ণ প্রতিফল তোমরা পাবে এবং তোমাদের প্রতি কিছুমাত্র যুলুম করা হবে না।" কার্পণ্য থেকে বিরত রাখার জন্যে বলা হয়েছে ঃ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ

خَيْرًا لَّهُمْ ط بَلْ هُوَ شَرٌّلَّهُمْ ط سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط -(ال

عمران : ١٨٠) "আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ বলে ধনশালী করা সত্ত্বেও তাতে কার্পণ্য করে, তারা যেনো মনে করে না যে, এটা তাদের পক্ষে কল্যাণকর ; বরং এটা তাদের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর। যে ধন-সম্পদে তারা কার্পণ্য করে, কিয়ামতের দিন তা-ই বেড়ি বানিয়ে তাদের গলায় পরিয়ে দেয়া হবে।" সূদী কারবার থেকে বিরত করা হয়েছে এই বলে ঃ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ -(البقرة : ٢٨١) সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে। দুনিয়ার সাজ-সরঞ্জামের প্রতি বেপরোয়া এবং দুষ্কৃতিকারীদের স্বাচ্ছন্দ দেখে ঈর্ষা না করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

لاَيَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلاَدِ○ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمِهَادُ○ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلاً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ○(ال عمران : ١٩٦-١٩٨)

"হে নবী, দুনিয়ার জনপদসমূহে আল্লাহর নাফরমান লোকদের চলা-ফেরা তোমাকে যেন ধোঁকায় ফেলতে না পারে। এত ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দমাত্র। অতপর সকলে এমন জাহান্নামে যাবে যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট বাসস্থল। পক্ষান্তরে যারা আপন পরোয়ারদেগারকে ভয় করে জীবন যাপন করে তাদের জন্যে রয়েছে এমন উদ্যান যার নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনীসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। সে উদ্যানসমূহে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই তাদের আতিথেয়তার সামগ্রী। আর আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তাই নেক বান্দাদের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯৬-১৯৮)

৮. ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব

ঈমানী বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পর্যালোচনা

ঈমানের পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তাতে এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে ইসলামের বিস্তৃত প্রত্যয়, নির্ভুল মাপকাঠির বিচারে তার বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা, মানবীয় চরিত্রের ওপর তার প্রভাব এবং সংস্কৃতির ভিত রচনায় তার ভূমিকা স্পষ্টত জানা গেছে। এবার ঈমানের এ বিষয়গুলো মিলে কি ধরনের সংস্কৃতির জন্ম দেয়, তার প্রতি একবার সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখা দরকার।

এ গ্রন্থের প্রাথমিক অধ্যায়গুলোতে বলা হয়েছে যে, ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তিপ্রস্তর হচ্ছে পার্থিব জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা। তাহলো এই যে, এ দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা সাধারণ সৃষ্ট বস্তুর মতো নয়, বরং তাকে এখানে বিশ্ব প্রভুর তরফ থেকে প্রতিনিধি বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্ত হিসেবে আপন স্রষ্টা ও মনিবের সন্তুষ্টি অর্জন করা মানব জীবনে স্বাভাবিক লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, আর এ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে ঃ

প্রথমত, আল্লাহ্ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা।

দ্বিতীয়ত, শুধু আল্লাহকেই আদেশ ও নিষেধকারী, আইন ও বিধানদাতা, বন্দেগী ও আনুগত্য লাভের যোগ্য মনে করা এবং নিজের যাবতীয় ক্ষমতা ইখতিয়ারকে সম্পূর্ণ খোদায়ী বিধানের অধীন করে দেয়া।

তৃতীয়ত, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার বিশেষ প্রণালী ও পদ্ধতিগুলো জানা।

চতুর্থত, আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের সুফল এবং অসন্তুষ্টি বিধানের কুফল অবহিত হওয়া, যাতে করে পার্থিব জীবনের অসম্পূর্ণ ফলাফল থেকে কেউ প্রতারিত না হয়।

বস্তুত ইতিপূর্বে যে পাঁচটি প্রত্যয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, তা এ বুনিয়াদী প্রয়োজনই পূরণ করছে।

আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনে যা কিছু বিবৃত হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো ঃ যে মহান সত্তার তরফ থেকে মানুষকে প্রতিনিধি বানিয়ে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং যাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই তাঁর জীবনের পরম লক্ষ্য, তাঁর সম্পর্কে যেনো সে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে পারে। তেমনি

ফেরেশতাদের সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে, তার উদ্দেশ্য হলো ঃ মানুষ যেনো বিশ্ব প্রকৃতির ক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর কোনটিকে প্রভু মনে করে না বসে এবং প্রভুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে শরীকদার ঘোষণা না করে। এরূপ নির্ভুল জ্ঞান লাভের পর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য হলো ঃ বিশ্বপ্রকৃতির ওপর, এমন কি স্বয়ং মানব জীবনের অচেতন দিকের ওপর যেমন আল্লাহর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বিরাজমান, তেমনি জীবনের সজ্ঞান ও সচেতন দিকেও মানুষ শুধু আল্লাহরই কর্তৃত্ব স্বীকার করবে। প্রতিটি ব্যাপারে আল্লাহকেই আইন প্রণেতা এবং নিজেকে সেই আইনের অনুবর্তী জ্ঞান করবে। নিজের ক্ষমতা ইখতিয়ারকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার অধীন করে দেবে। বস্তুত এরূপ ঈমানী শক্তিই মানুষকে আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের সামনে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে মাথা নত করে দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এর দ্বারা মর্দে-মু'মিনের ভেতর এক বিশেষ ধরনের বিবেকের সৃষ্টি হয় এবং এক বিশেষ ধরনের চরিত্র গড়ে উঠে—যা আল্লাহর আইন-বিধানে বাধ্যতামূলক নয়, বরং স্বেচ্ছামূলক অনুসৃতির জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয় প্রয়োজনটি পূর্ণ করে নবুওয়াত ও কিতাবের প্রতি বিশ্বাস। এ দু'টির মাধ্যমেই মানুষ তার জন্যে আল্লাহর নির্ধারিত আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করে। মানুষের ক্ষমতা ইখতিয়ারকে আল্লাহ যেসব সীমারেখার অধীন করে দিয়েছেন, এ দু'টির মাধ্যমেই মানুষ সেগুলো চিনে নিতে পারে। 'ঈমান বির রিসালাত' এবং 'ঈমান বিল কিতাবের' মানেই হচ্ছে রসূলের শিক্ষাকে আল্লাহর শিক্ষা এবং তাঁর পেশকৃত কিতাবকে আল্লাহর কিতাব মনে করা। আর এ ঈমানের বলেই আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে প্রদর্শিত বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন ও রীতিনীতি, দৃঢ়তা ও সংকল্পের সাথে পালন করার মতো যোগ্যতা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে।

চতুর্থ বা সর্বশেষ প্রয়োজনটি পূর্ণ করার জন্যে রয়েছে পরকাল সংক্রান্ত জ্ঞান। এর দ্বারা মানুষের দৃষ্টি এতো প্রখর হয়ে যায় যে, দুনিয়াবী জীবনের এ বাহ্যদৃশ্যের পেছনে সে এক স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব দেখতে পায়। তার স্পষ্টত মনে হয় যে, এ দুনিয়ার মঙ্গল-অমঙ্গল ও উপকার-অপকার আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির কোন মাপকাঠি নয়। আল্লাহর তরফ থেকে কর্মের সুফল ও কুফল এ দুনিয়ায় শেষ হয়ে যায় না, বরং তার চূড়ান্ত ফয়সালা ও ফলাফল ঘোষিত হবে স্বতন্ত্র এক জগতে। এবং সেই ফয়সালাই হবে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য। সেই ফয়সালায় সাফল্য ও কামিয়াবী লাভ করতে হলে এ দুনিয়ায় খোদায়ী আইন-বিধানের নির্ভুল অনুসরণ এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখার পূর্ণ সংরক্ষণই হচ্ছে একমাত্র উপায়। এ জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রতি সুদৃঢ় প্রত্যয়কেই বলা হয়

ঈমান বিল আখেরাত বা পরকাল বিশ্বাস। বস্তুত ঈমান বিল্লাহর পর মানুষকে ইসলামী আইন-কানুনের অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এটিই হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী শক্তি। আর ইসলামী সংস্কৃতির জন্যে মানুষকে মানসিক দিক থেকে যোগ্য ও সমর্থ করে তোলার ব্যাপারেও এ প্রত্যয়টির রয়েছে বিরাট ভূমিকা।

এ আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, পার্থিব জীবন সম্পর্কে ইসলামের বিশিষ্ট ধারণা ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ইতিপূর্বে যে ধারাগুলো এঁকে দিয়েছিলো, আলোচ্য মৌল প্রত্যয়গুলো ঠিক সেই ধারায়ই সংস্কৃতির সংগঠন ও ভিত্তি স্থাপন করেছে। বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এমনি সংস্কৃতির জন্যে যে মৌল প্রত্যয়ের প্রয়োজন, তা এ পাঁচটি বিষয় নিয়েই গঠিত হতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোন প্রত্যয়ের ভেতরেই এ বিশেষ ধরনের সংস্কৃতির ভিত্তি হওয়ার মতো যোগ্যতা নেই। কারণ অন্য কোন প্রত্যয়ই জীবন সম্পর্কে এ বিশেষ ধারণা ও লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

ইসলামী সংস্কৃতির কাঠামো

ঈমান তথা ইসলামের প্রত্যয়বাদ সম্পর্কে ওপরের বিস্তৃত আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই এর ভিত্তির ওপর গড়া সংস্কৃতির একটা পূর্ণ কাঠামো আমাদের সামনে এসে পড়ে। এ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপঃ

এক ঃ এ সংস্কৃতির ব্যবস্থাপনা একটি রাজ্যের ব্যবস্থাপনার মতো। এতে আল্লাহর মর্যাদা সাধারণ ধর্মীয় মত অনুসারে নিছক একজন 'উপাস্যে'র মতো নয়। বরং পার্থিব মত অনুযায়ী তিনি সর্বোচ্চ শাসকও। প্রকৃতপক্ষে তিনি হচ্ছেন এ বিশাল রাজের বাদশাহ শাহানশাহ। রসূল তাঁর প্রতিনিধি। কুরআন তাঁর আইন গ্রন্থ। যে ব্যক্তি তাঁর বাদশাহীকে স্বীকার করে তাঁর প্রতিনিধির আনুগত্য এবং তাঁর আইন গ্রন্থের অনুসরণ করে, সেই এ রাজ্যের প্রজা। মুসলমান হওয়ার মানেই হচ্ছে এই যে, সেই বাদশাহ তাঁর প্রতিনিধি ও আইন গ্রন্থের মাধ্যমে যে আইন বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন—তার কার্যকারণ ও যৌক্তিকতা বোধগম্য হোক কি না হোক—বিনা বাক্য ব্যয়ে তার স্বীকার করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর এ সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং তাঁর আইন বিধানকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সিদ্ধান্তের উর্ধে স্থান দিতে স্বীকৃত না হবে এবং তাঁর আদেশাবলী মানা বা না মানার অধিকারকে নিজের জন্যে সুরক্ষিত রাখবে, তার জন্যে এ রাজ্যের কোথাও এতটুকু স্থান নেই।

দুই ঃ এ সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে চূড়ান্ত সাফল্যের (অর্থাৎ পরকালীন বিচারে বিশ্ব প্রভুর সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হওয়ার) জন্যে প্রস্তুত করা আর তার দৃষ্টিতে এ সাফল্য অর্জনটা বর্তমান জীবনে মানুষের নির্ভুল আচরণের

ওপর নির্ভরশীল। পরন্তু চূড়ান্ত ফলাফলের দৃষ্টিতে কোন্ সব কাজ উপকারী, আর কোন্ সব কাজ অপকারী, তা জানা মানুষের সাধ্য নয়, বরং আখেরাতে ফয়সালাকারী আল্লাহই তা উত্তমরূপে অবহিত। এ কারণেই এ সংস্কৃতি জীবনের সকল বিষয়াদিতে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুসরণ করার এবং নিজের কর্ম স্বাধীনতাকে খোদায়ী শরীয়ত দ্বারা সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করার জন্যে মানুষের কাছে দাবী জানায়। অনুরূপভাবে এ সংস্কৃতি হচ্ছে দ্বীন ও দুনিয়ার এক মহত্তম সমন্বয়। একে প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে 'ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করা চলে না। এ হচ্ছে একটি ব্যাপকতর জীবনব্যবস্থা বা মানুষের চিন্তা-কল্পনা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, পারিবারিক কাজ-কর্ম, সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ড, রাজনৈতিক কর্মধারা, সভ্যতা ও সামাজিকতা সবকিছুর ওপরই পরিব্যাপ্ত। আর এ সমস্ত বিষয়ে যে পদ্ধতি ও আইন-বিধান আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারই সামষ্টিক নাম হচ্ছে 'দ্বীন ইসলাম' বা 'ইসলামী সংস্কৃতি'।

তিন ঃ এ সংস্কৃতি কোন জাতীয়, (ভৌগলিক বা ভাষাগত অর্থে) দেশীয় বা গোত্রীয় সংস্কৃতি নয়। বরং সঠিক অর্থে এটি হচ্ছে মানবীয় সংস্কৃতি। এ মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই আহ্বান জানায়। যে ব্যক্তি তাওহীদ, রিসালাত, কিতাব ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করে, তাকেই সে নিজের চৌহদ্দির মধ্যে গ্রহণ করে। এমনিভাবে এ সংস্কৃতির এক বিশ্বব্যাপী উদার জাতীয়তা গঠন করে —যার মধ্যে বর্ণ-গোত্র-ভাষা নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রবেশ করতে পারে। তার মধ্যে রয়েছে সমগ্র দুনিয়ার বুকে বিস্তৃত হবার মতো অনন্য যোগ্যতা। সমগ্র আদম সন্তানকে একই জাতীয় সূত্রে সম্পৃক্ত করার এবং তাদের সবাইকে একই সংস্কৃতির অনুসারী করে তোলার মতো যোগ্যতারও সে অধিকারী। কিন্তু এ বিশ্বব্যাপী মানবীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা তার আসল লক্ষ্য শুধু নিজ অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করারই নয়, বরং মানব জাতির রব তার মঙ্গল ও ভালাইর জন্যে যে নির্ভুল জ্ঞান ও কর্মনীতি দান করেছেন, সমগ্র মানুষকে তার সুফলের অংশীদার করে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এ কারণেই এ ভ্রাতৃসংঘে শামিল হবার জন্যে প্রথমত সে ঈমানের শর্ত আরোপ করেছে এবং সেই সাথে যারা আল্লাহর সর্বোচ্চ ক্ষমতার সামনে মাথানত করতে প্রস্তুত এবং আল্লাহর রসূল ও তাঁর কিতাবের দ্বারা নির্ধারিত সীমারেখা ও আইন-বিধান পালন করতে ইচ্ছুক, কেবল তাদেরকেই এ সংঘের জন্যে মনোনীত করেছে। কারণ এ ধরনের লোকেরাই শুধু (তারা সংখ্যায় যতো অল্পই হোক) এ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় খাপ খাওয়াতে পারে এবং এদের দ্বারাই একটি নির্ভুল ও সুদৃঢ় জীবন-ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে। এ ব্যবস্থায় অবিশ্বাসী, মুনাফেক বা ক্ষীণ বিশ্বাসী লোকদের স্থান পাওয়া এর শক্তির লক্ষণ নয়, বরং তা দুর্বলতারই লক্ষণ।

চার ঃ সীমাহীনতা ও বিশ্বজনীনতার সাথে এ সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর প্রচণ্ড নিয়মানুবর্তিতা (Discipline) এবং শক্তিশালী বন্ধন। এর সাহায্যেই সে নিজের অনুসারীদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক দিক থেকে নিজস্ব আইনের অনুগত করে তোলে। এর কারণ এই যে, আইন প্রণয়ন ও সীমা নির্ধারণ করার পূর্বে সে আইনের অনুসরণ ও সীমা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করে নেয়। অন্য কথায়, আদেশ দেয়ার পূর্বেই সে আদেশ দ্বারা কার্যকরী হওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। এ জন্যে সর্বপ্রথমে সে মানুষের আল্লাহর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেয়। তারপর তাকে এ নিশ্চয়তা দেয় যে, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে বিধান দেয়া হয়েছে তা আল্লাহরই বিধান এবং তার আনুগত্য ঠিক আল্লাহরই আনুগত্য। পরন্তু তার মনের ভেতর সে এক অতন্দ্র প্রহরী নিযুক্ত করে দেয়—সে সর্বদা ও সর্বাবস্থায় তাকে খোদায়ী বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করে, তার বিরুদ্ধাচরণের জন্যে তিরস্কার করে এবং পরকালীন শাস্তির ভয় দেখায়। এভাবে যখন প্রতিটি ব্যক্তির মন ও বিবেকের ভেতর এ কার্যকর শক্তিকে বদ্ধমূল করে নিজের অনুসারীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে আইনানুবর্তন, বিধি-নিষেধ পালন ও সদগুণরাজিতে বিভূষিত হওয়ার মতো যোগ্যতার সৃষ্টি করা হয়, তখনি সে তাদের সামনে নিজস্ব আইন বিধান পেশ করে, তাদের জন্যে কর্মসীমা নির্ধারণ করে, তাদের জন্যে জীবন যাত্রা প্রণালী তৈরী করে এবং নিজস্ব লক্ষ্য হাসিলের জন্যে তাদের কাছে কঠোরতর ত্যাগ স্বীকারের দাবী জানায়। বস্তুত এটা অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা, এর চেয়ে বিচক্ষণ পন্থা আর কিছুই হতে পারে না। এ পন্থায় ইসলামী সংস্কৃতি যে বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করছে, অন্য কোন সংস্কৃতি তা লাভ করতে পারেনি।

পাঁচ ঃ পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে এ সংস্কৃতি এক নির্ভুল সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে এবং এক সৎ ও পবিত্র জনসমাজ (Society) গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু এর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা উত্তম চরিত্র ও সদগুণরাজিতে বিভূষিত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ সমাজ গঠন সম্ভবপর নয়। এ কারণেই এর সভ্যদের ব্যক্তি চরিত্র সংশোধন করা একান্ত প্রয়োজন, যাতে করে তারা শুধু অকেজো ও প্রক্ষিপ্ত চিন্তাধারার প্রতিমূর্তি হয়ে না থাকে। তাদের মধ্যে নির্ভুল ও বিশুদ্ধ মানসিকতা পরিস্ফুট করা প্রয়োজন, যাতে করে অতি স্বাভাবিকভাবে সৎ কর্মরাজির অনুশীলন হওয়ার মতো সুদৃঢ় চরিত্র তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত ইসলাম তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় এ নিয়মটির প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রেখেছে। লোকদের ট্রেনিং-এর জন্যে ইসলাম সর্বপ্রথম তাদের মধ্যে ঈমান ও প্রত্যয়কে বদ্ধমূল করে দেয়—কারণ তাদের মধ্যে উঁচুমানের মযবুত চরিত্র সৃষ্টি করার এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা। এ ঈমানের বলেই সে লোকদের মধ্যে সততা, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র, আত্মানুশীলন, সত্য প্রীতি, আত্মসংযম, সংগঠন, বদান্যতা,

উদার দৃষ্টি, আত্মসম্ভ্রম, বিনয়-নম্রতা, উচ্চাভিলাস, সৎসাহস, আত্মত্যাগ, কর্তব্যবোধ, ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়চিত্ততা, বীর্যবত্তা, আত্মতৃপ্তি, নেতৃ আনুগত্য আইনানুবর্তিতা ইত্যাকার উৎকৃষ্ট গুণরাজির সৃষ্টি করে। সেই সাথে তাদের সংঘবদ্ধতার স্বাভাবিক পরিণামে যাতে একটি উৎকৃষ্ট জনসমাজ গড়ে উঠে, তাদেরকে ঠিক তেমনিভাবে যোগ্য করে তোলে।

ছয় ঃ এ সংস্কৃতির ঈমান তথা প্রত্যয়বাদে একদিকে সচ্চরিত্র ও সৎ গুণরাজি সৃষ্টি করায় এবং তা প্রতিপালন এবং সংরক্ষণের উপযোগী সকল শক্তি বর্তমান রয়েছে। অন্যদিকে পার্থিব উন্নতি ও প্রগতির জন্যে মানুষকে সর্বদা উদ্বুদ্ধ করা এবং তাকে পার্থিব উপায়-উপকরণ উত্তমরূপে ব্যবহার করার ও আল্লাহর দেয়া শক্তি নিচয়কে সুষমভাবে প্রয়োগ করার জন্যে যোগ্য করে তোলার মতো শক্তিও এর ভেতরেই নিহিত রয়েছে। পরন্তু এ প্রত্যয়বাদই দুনিয়ায় প্রকৃত উন্নতি করার জন্যে প্রয়োজনীয় উৎকৃষ্ট গুণাবলী মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে। এর মধ্যে মানুষের কর্মশক্তিকে সুসংহত করার এবং তাকে সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করার মতো প্রচণ্ড শক্তি বর্তমান রয়েছে। সেই সাথে এ কর্মশক্তিকে সীমাতিক্রম করতে না দেয়ার এবং সত্যিকার কল্যাণ পথ থেকে বিচ্যুত হতে না দেয়ার শক্তিও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। এভাবে যেসব গুণাবলী অন্যান্য ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে পাওয়া যায়, ইসলামী প্রত্যয়বাদ তা সবই একত্রে ও উৎকৃষ্টরূপে বর্তমান রয়েছে। আর যেসব বিকৃতি বিভিন্ন ধর্মীয় ও পার্থিব প্রত্যয়ে লক্ষ্য করা যায় সেইসব থেকে এ প্রত্যয়বাদ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

ইসলামী সংস্কৃতিতে ঈমানের গুরুত্ব

এ হচ্ছে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো, আমরা যদি উদাহরণত একে একটি ইমারত ধরে নেই, তাহলে বলতে হয় ঃ এ ইমারতটিকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্যে এর ভিত্তি ভূমিকে গভীরভাবে খনন করা হয়েছে। তারপর খুব বাছবিচার করে আরও পাকাপোক্ত ইট এর জন্যে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং তা উৎকৃষ্ট সিমেন্ট দিয়ে গাঁথা হয়েছে। অতপর ইমারতটি এমন জাঁকালোভাবে নির্মিত হয়েছে যে, উচ্চতায় তা আসমান পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে এবং প্রশস্তে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছে। কিন্তু এতো প্রশস্ত ও উচ্চতা সত্ত্বেও এর প্রাচীর ও স্তম্ভগুলো এতোটুকু কেঁপে ওঠে না, বরং তা পাহাড়ের ন্যায় অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ ইমারতের দরজা জানালাগুলো এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে, বাইরের আলো ও নির্মল বায়ু এর মধ্যে সুন্দরভাবেই প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু ধূলা, বালু, আবর্জনা ও দূষিত বায়ুকে তা আদৌ প্রবেশ করতে দেয় না। আলোচ্য ইমারতটির এ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্য

একটি মাত্র জিনিসের কারণে সৃষ্টি হয়েছে, আর তা হচ্ছে ঈমান। এটিই তার মূল ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে দিয়েছে। এটিই অকেজো ও নিষ্ক্রিয় উপাদান বর্জন করে উৎকৃষ্ট উপাদান গ্রহণ করেছে। এটিই কাঁচা মাটি পুড়ে পাকা ইট তৈরী করেছে। এটিই বিক্ষিপ্ত ইটগুলোকে সারিবদ্ধভাবে গেঁথে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করেছে। এর ওপরই ইমারতের প্রশস্ততা, উচ্চতা ও দৃঢ়তা নির্ভরশীল, এটি যেমন তাকে প্রশস্ততা উচ্চতা ও দৃঢ়তা দান করেছে তেমনি বাহ্যিক অনিষ্ট থেকেও তাকে সুরক্ষিত করে দিয়েছে এবং সর্বপ্রকার নির্দোষ ও পবিত্র জিনিসকে তার মধ্যে প্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছে। কাজেই ঈমান হচ্ছে এ ইমারতের প্রাণ তুল্য। এটি না হলে তার কায়েম থাকা দূরের কথা, নির্মিত হওয়াই সম্ভব নয়। আর এটি দুর্বল হলে তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, ইমারতের গোটা ভিত্তিই কমজোর, তার ইটগুলো কাঁচা, তার চুন-সিমেন্ট খারাব, তার স্তম্ভগুলো টলটলায়মান, তার প্রাচীরগুলো সুগ্রথিত নয়। তার মধ্যে প্রশস্ততা ও উচ্চতার কোন যোগ্যতা নেই। তার ভেতর বাহ্যিক অনিষ্টকে প্রতিহত করার এবং নিজের পবিত্র ও নির্দোষ জিনিসগুলোকে সুরক্ষিত রাখার মতো শক্তি নেই।

ফলকথা, ঈমানের অনুপস্থিতি ইসলামেরই অনুপস্থিতির শামিল। অনুরূপভাবে ঈমানের দুর্বলতা তারই দুর্বলতা এবং ঈমানের শক্তি তারই শক্তির নামান্তর। পরন্তু ইসলাম যেহেতু একটি ধর্ম মাত্রই নয়, বরং এটি সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি সবকিছুরই সমন্বয়, এ কারণে এখানে ঈমানের গুরুত্ব নিছক ধর্মীয় বিন্যাসের মতোই নয় ; বরং এর ওপর লোকদের গোটা নৈতিক আচরণ ও জীবনধারা একান্তভাবে নির্ভরশীল। এটিই তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকর্মের সুস্থতা পরিচ্ছন্নতার প্রধান অবলম্বন। এটিই তাদেরকে সংহত করে একটি জাতিতে পরিণত করে। এটিই তাদের জাতীয়তা ও সংস্কৃতির নিরাপত্তা বিধান করে। এটিই তাদের সভ্যতা, সামাজিকতা ও রাজনীতির মূল প্রাণবস্তু। এটি ছাড়া ইসলাম শুধু একটি 'ধর্ম' হিসেবে কায়েম হতে পারে না তাই নয়, বরং একটি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। ঈমান দুর্বল হয়ে পড়লে তাকে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসেরই দুর্বলতা বলা চলে না, বরং তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে, মুসলমানদের নৈতিক জীবন খারাপ হয়ে গেছে। তাদের স্বভাব-চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাদের পারস্পরিক ক্রিয়াকর্ম বিগড়ে গেছে। তাদের সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তাদের জাতীয়তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। একটি স্বাধীন, সম্মানিত ও শক্তিমান জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে তারা অক্ষম হয়ে পড়েছে। বস্তুত এ কারণেই ইসলামী ব্যবস্থায় ঈমানকেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং একেই ইসলামী ব্যবস্থায় দাখিল হবার প্রাথমিক শর্ত রাখা হয়েছে। এক ব্যক্তি যখন ঈমান কবুল

করলো, তখন সে মুসলিম জাতির মধ্যেই প্রবেশ করে ; মুসলমানদের সভ্যতা, সামাজিকতা, রাজনীতি সবকিছুতে সে সমান অংশীদার হয় এবং সমস্ত রীতিনীতি ও আইন-কানুন তার প্রতি বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি ঈমান কবুল না করে তাহলে ইসলামের সীমার মধ্যে সে কিছুতেই প্রবেশ করতে পারে না। ইসলামের কোন নির্দেশ কোন বিধানই তার ওপর কার্যকরী হবে না। মুসলমানদের জামায়াতে সে কিছুতেই শরীকদার হতে পারবে না। কারণ এ ব্যবস্থাপনায় তার পক্ষে খাপ খাওয়ানো সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। এর আইন-কানুন ও বিধি-ব্যবস্থা সে কিছুতেই পালন করতে পারে না।

মুনাফেকীর ভয়

যারা ঈমানের দাওয়াতকে খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করে, তাদের ব্যাপার তো সুস্পষ্ট। তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে কুফর ও ঈমানের অতি সুস্পষ্ট ও দুর্লংঘ্য সীমারেখা বিদ্যমান। সেই সীমা ডিঙিয়ে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে তারা কখনো অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। কিন্তু যারা মু'মিন না হয়েও ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে ঢুকে পড়েছে, যাদের অন্তরে সন্দেহের ব্যাধি লুকিয়ে রয়েছে কিংবা যাদের বিশ্বাস অতি দুর্বল তাদের অস্তিত্ব ইসলামী ব্যবস্থার পক্ষে অতীব মারাত্মক। কারণ তারা ইসলামের সীমার মধ্যে দাখিল হলেও ইসলামী চরিত্র ও ইসলামী জীবনধারা গ্রহণ করেনি। তারা ইসলামী আইনের অনুসরণ এবং আল্লাহর বিধানের সংরক্ষণ করেনি ; বরং তারা নিজেদের বিকৃত চরিত্র ও আচরণ দ্বারা মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করে দিচ্ছে, নিজেদের মানসিক ব্যাধির সাহায্যে মুসলমানদের জাতীয়তা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিকড় উপড়ে ফেলছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ভেতর ও বাইর থেকে নানারূপ ফেতনা সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। কুরআন মজীদে এ ধরনের লোকদেরকেই মুনাফেক বা কপট বিশ্বাসী বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এদের অনুপ্রবেশের ফলে মুসলিম সমাজে যেসব ফেতনার সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেগুলোও সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ শ্রেণীর লোকদের পরিচয় এই যে, এরা ঈমানের দাবী করে বটে, কিন্তু আদতে ঈমানদার নয় ঃ

مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ (البقرة : ٨)

"যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, অথচ তারা ঈমানদার নয়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৮)

তারা মুসলমানদের সাথে মুসলমানের মতো কথা বলে আর কাফেরদের সাথে কাফেরদের মতো ঃ

وَاِذَا لَقُوْا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ج وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ لا قَالُوْا
اِنَّا مَعَكُمْ (البقرة : ١٤)

"তারা ঈমানদার লোকদের সাথে দেখা হলে বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি আর তাদের শয়তানদের কাছে গেলে বলে যে, আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪)

তারা খোদায়ী বাণীকে উপহাস করে এবং তাদের মধ্যে সন্দেহের কথা ছড়িয়ে লোকদেরকে বিভ্রান্ত করে ঃ

اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ ـ

"তোমরা যখন আল্লাহর আয়াতের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তাকে উপহাস করতে দেখবে, তখন তাদের সাথে উপবেশন করবে না।"
–(সূরা আন নিসা ঃ ১৪০)

তারা ধর্মীয় কর্তব্য পালনে কুণ্ঠাবোধ করে আর পালন করলেও নিতান্ত বাধ্য হয়ে মুসলমানদের দেখাবার জন্যেই করে, নচেত মূলত তাদের অন্তর আল্লাহর বিধানের আনুগত্যের ব্যাপারে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ঃ

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ
اِلَّا قَلِيْلًا ۔ مُّذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ ق لَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا اِلٰى هٰؤُلَاءِ ط

"তারা যখন নামাযের জন্যে দাঁড়ায় তো অত্যন্ত কুণ্ঠার সাথে দাঁড়ায় আর শুধু লোকদেরকে দেখাবার জন্যেই এরূপ করে থাকে, নচেত আল্লাহকে স্মরণ করে না। আর স্মরণ করলেও খুব কমই করে থাকে। তারা মাঝখানে দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে ; তারা পুরোপুরি এদিকেও নয় ওদিকেও নয়।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৪২-১৪৩)

وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ

"তারা নামাযের জন্যে আসে না কুণ্ঠাবোধ ছাড়া এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না বিরক্তি ছাড়া।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৫৪)

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا (التوبة : ٩٨)

"এমন কতক বেদুঈন রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে কিছু ব্যয় করাকে বাধ্যতামূলক জরিমানা মনে করে।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৯৮)

তারা ইসলামের দাবী করে বটে, কিন্তু ইসলামী আইনের অনুসরণ করে না ; বরং নিজেদের বিষয় কর্মে কুফরী আইনের অনুসরণ করে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط

"তুমি কি সেইসব লোককে দেখনি, যারা তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনার দাবী করে বটে, কিন্তু নিজেদের বিষয়-কর্মকে শয়তানী বিচারকদের কাছে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তাদেরকে তার (শয়তানী শক্তির) আদেশ না মানারই হুকুম দেয়া হয়েছে।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৬০)

তারা নিজেদের ক্রিয়াকর্ম তো খারাপ করেই, পরন্তু মুসলমানদের আকীদা-আমলকেও খারাপ করার প্রয়াস পায় ঃ

يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط -(التوبة : ٦٧)

"তারা (লোকদেরকে) দুষ্কৃতির আদেশ দেয়, সৎকাজ থেকে বিরত রাখে এবং সৎকাজ থেকে তাদের হাত সংকুচিত হয়ে থাকে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, এ জন্যে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন।"

-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬৭)

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً -(النساء : ٨٩)

"তারা চায় যে, তারা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও যদি তেমনি কুফরী করতে। তাহলে তোমরা এবং তারা সমান হয়ে যেতে !"

-(সূরা আন নিসা ঃ ৮৯)

তারা মুসলমানের সাথে ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ তাদের স্বার্থ থাকে। যেখানে স্বার্থ থাকে না কিংবা কম থাকে, সেখানেই তারা মুসলমানদের সঙ্গ ত্যাগ করে।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ج فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَآ اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ (التوبة : ٥٨)

"তাদের কেউ কেউ সদকার বিলি-বন্টনে তোমার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করে ; তাদেরকে যদি সদকার অংশ দেয়া হয় তো খুশী হয়ে যায় আর না দেয়া হলেই বিগড়ে যায়।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ৫৮)

এভাবে যখন ইসলাম ও মুসলমানের ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসে তখন তারা যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসে ; কারণ ইসলামের প্রতি তাদের আদতেই কোন ভালোবাসা নেই বিধায় তার জন্যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতেই তারা সম্মত নয় আর সে ত্যাগ স্বীকারে কোন প্রতিফল পাওয়া যাবে এমন প্রত্যাশাও তারা করে না। এমন কি ইসলামের সত্যতায়ই তাদের বিশ্বাস নেই; এ কারণেই তার স্বার্থে জীবন পণ করতে তারা প্রস্তুত নয়। তারা নানাভাবে যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার এবং নিজেদের জীবন বাঁচার চেষ্টা করে। আর কখনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও নিতান্ত অপ্রসন্নচিত্তেই করে। ফলে তাদের এ অংশগ্রহণ মুসলমানদের জন্যে শক্তির পরিবর্তে দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের এ অবস্থাটিই সূরায়ে আলে ইমরান (রুকূ' ঃ ১২-১৭), সূরায়ে আন নিসা (রুকূ' ঃ ১০, ১১, ১২, ২০), সূরায়ে আত তাওবা (রুকূ' ঃ ৭, ১১, ১২) এবং সূরা আহযাব (রুকূ' ঃ ২)-এ সবিস্তারে বিবৃত করা হয়েছে।

এদের সবচেয়ে মারাত্মক পরিচয় হলো এই যে, মুসলমানদের ওপর যখন বিপদের ঘনঘটা নেমে আসে, তখন এরা কাফেরদের পক্ষে গিয়ে যোগদান করে। তাদেরকে মুসলমানদের ভেতরকার খবর সরবরাহ করে। তাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে। মুসলমানদের বিপদ দেখে খুশী হয়। নিজ কওমের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে কাফেরদের কাছ থেকে স্বার্থ ও মর্যাদা লাভ করে। প্রতিটি ইসলামের বিরোধী ফেতনায় তারা সামনে এগিয়ে অংশ গ্রহণ করে। এবং মুসলমানদের দলে অনৈক্য ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। এ পরিচয়টিও আলে ইমরান, নিসা, তাওবা, আহযাব এবং মুনাফিকুন-এ বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর থেকে ভালো মতোই আন্দাজ করা চলে যে, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তার জন্যে খাঁটি, নির্ভুল ও যথার্থ ঈমান একান্ত আবশ্যক। ঈমানের দুর্বলতা এ ব্যবস্থার মূল শিকড় থেকে নিয়ে ডালপালা পর্যন্ত সবটাকেই অন্তসারশূন্য করে দেয়। এর মারাত্মক প্রভাব থেকে সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি কোন কিছুই রক্ষা পেতে পারে না।

৯. পারলৌকিক জীবন

মৃত্যুর পরে কি কোন জীবন আছে ? থাকলে তা কি রকমের জীবন ? এ প্রশ্নটি মূলত আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির সীমা বহির্ভূত। কারণ মৃত্যু সীমার ওপারে কি আছে, আর কি নেই তা উঁকি মেরে দেখার মতো চোখ আমাদের নেই। ওপারের কোন আওয়াজ শোনার মতো কান আমাদের নেই। এমন কি, ওপারে আদৌ কিছু আছে কিনা, তা নিশ্চিতরূপে জানার মতো কোন যন্ত্রও আমাদের আয়ত্তাধীন নয়। কাজেই বিজ্ঞানের দিক থেকে বলতে গেলে এ প্রশ্ন তার সম্পূর্ণ সীমা বহির্ভূত। যে ব্যক্তি বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে, সে নিসন্দেহে একটি অবৈজ্ঞানিক কথা বলে। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেখানে কোন জীবন আছে, একথা যেমন বলা যায় না, তেমনি কোন জীবন নেই, একথাও বলা চলে না। কাজেই ঐ সম্পর্কে অন্তত কোন নিশ্চিত জ্ঞান-সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত যথার্থ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এ হতে পারে যে, আমরা পারলৌকিক জীবনকে স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করবো না।

কিন্তু বাস্তব জীবনে কি এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা চলে ? আদৌ নয়। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিতে কোন একটা জিনিসকে জানার উপায় উপকরণ সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন না হওয়া পর্যন্ত সে সম্পর্কে নেতিবাচক বা ইতিবাচক কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু সেই বস্তুটির সাথে যখন আমাদের বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, তখন আর স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির ওপর কর্মনীতির নির্ধারণ না করে কোন উপায় থাকে না। উদাহরণত বলা যায়, একটি লোক সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না। তার সাথে যদি আপনার কোন কাজ-কারবার না থাকে তো তার ঈমানদার হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা আপনার পক্ষে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তার সাথে যদি আপনাকে কোন কারবার করতে হয়, তাহলে হয় তাকে ঈমানদার নচেত বেঈমান ভেবে কাজ করতে আপনি বাধ্য। আপনি মনে মনে অবশ্যই ধারণা করতে পারেন যে, লোকটি ঈমানদার কি বেঈমান প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত আমি সন্দিগ্ধচিত্তে কাজ করবো ; কিন্তু তার ঈমানদারিকে সন্দেহজনক ভেবে আপনি যে কাজ করবেন, কার্যত তার ধরন তাকে বেঈমান মনে করার মতোই হবে। কাজেই বাস্তব ক্ষেত্রে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির মধ্যে সন্দিগ্ধ অবস্থাটা শুধু মনের মধ্যেই থাকতে পারে ; বাস্তব কর্মনীতি কখনো সন্দিগ্ধ অবস্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে না। তার জন্যে স্বীকৃতি কিংবা অস্বীকৃতি একান্তই অপরিহার্য।

একটু সামান্য তলিয়ে চিন্তা করলেই এটা বোঝা যেতে পারে যে, পারলৌকিক জীবনের প্রশ্নটি নিছক একটি দার্শনিক প্রশ্নই নয়, বরং আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে তার গভীরতর সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের গোটা নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই এ প্রশ্নের ওপর নির্ভরশীল। আমার যদি ধারণা হয় যে, জীবনের সবকিছু এ পার্থিব জীবনেই শেষ এবং এরপর আর কোন জীবন নেই, তাহলে আমার নৈতিক আরচণ এক ধরনের হবে। আর যদি আমি এ ধারণা রাখি যে, এরপরে আরো একটি জীবন আছে, যেখানে আমাকে বর্তমান জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের হিসেব দিতে হবে এবং আমার এ জীবনের কৃতকর্মের ভিত্তিতেই সেখানে ভালো বা মন্দ পরিণাম ভোগ করতে হবে, তাহলে নিশ্চয়ই আমার নৈতিক আচরণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হবে। এর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক। মনে করুন, এক ব্যক্তি এ ধারণা নিয়ে ভ্রমণ করছে যে, তাকে এখান থেকে শুধু করাচী যেতে হবে। করাচী পৌছার পর তার ভ্রমণ শুধু চিরতরে সমাপ্তিই লাভ করবে না, বরং সেখানে সে পুলিশ, আদালত এবং জিজ্ঞাসাবাদকারী সকল শক্তির একেবারে নাগালের বাইরে চলে যাবে।

পক্ষান্তরে অপর এক ব্যক্তি মনে করে যে, এখান থেকে করাচী পর্যন্ত তার ভ্রমণ একটি মনজিল মাত্র। এরপর তাকে সমুদ্র পারের আর একটি দেশে যেতে হবে, যেখানকার বাদশাহ এ দেশেরও বাদশাহ। সে বাদশাহর দফতরে তার পাকিস্তানে থাকাকালীন যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের গোপন রেকর্ড বর্তমান রয়েছে। সেখানে সে স্বীয় কর্মের দৃষ্টিতে কিরূপ মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য, তা তার সেই রেকর্ড বিচার-বিশ্লেষণ করে স্থির করা হবে। এখন এ দু' ব্যক্তির কর্মনীতি কতোখানি পরস্পর বিরোধী হবে, আপনারা তা সহজেই আন্দাজ করতে পারেন। প্রথম ব্যক্তি এখান থেকে শুধু করাচী পর্যন্ত ভ্রমণের প্রস্তুতি করবে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রস্তুতি চালাবে পরবর্তী দীর্ঘ মনজিলগুলোর জন্যেও। প্রথম ব্যক্তি মনে করবে, লাভ ক্ষতি যা কিছু করাচী পৌছা পর্যন্তই তারপরে আর কিছু নেই। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ধারণা করবে, আসল লাভ ক্ষতি ভ্রমণের প্রথম পর্যায়ে নয়, বরং তা রয়েছে শেষ পর্যায়ে। প্রথম ব্যক্তি তার ক্রিয়াকলাপের কেবল সেসব ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, যা করাচী পর্যন্ত ভ্রমণে প্রকাশ পেতে পারে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি থাকবে সেসব ফলাফলের প্রতি, যা সমদ্রপারের সেই দেশটিতে গিয়ে প্রকাশ পাবে। স্পষ্টত এই দু' ব্যক্তির কর্মনীতির পার্থক্য তাদের ভ্রমণ সংক্রান্ত ধারণারই প্রত্যক্ষ ফল। ঠিক এরূপে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত ধারণা বিশ্বাস আমাদের নৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তার ধারাকে চূড়ান্ত রূপে নির্ণয় করে দেয়। বাস্তব কর্ম ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ করতে হলে আমরা এ জীবনকে প্রথম এবং সর্বশেষ

জীবন ভেবে কাজ করছি, না পরবর্তী কোন জীবন ও তার ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখছি—এ প্রশ্নের ওপরই সে পদক্ষেপের দিক নির্ণয় নির্ভর করে। প্রথম অবস্থায় আমাদের পদক্ষেপ হবে এক ধরনের, আর দ্বিতীয় অবস্থায় তা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

এর থেকে জানা গেলো যে, পারলৌকিক জীবনের প্রশ্নটি নিছক একটি দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন নয়, বরং এটি বাস্তব জীবনের প্রশ্ন। এমতাবস্থায় এ সম্পর্কে সন্দেহ ও দোদুল্যমান অবস্থায় থাকার কোনই অবকাশ নেই। সন্দিগ্ধ অবস্থায় অথবা জীবনে যে দৃষ্টিভঙ্গিই গ্রহণ করবো, শেষ পর্যন্ত তা অবিশ্বাসীরই দৃষ্টিভঙ্গি হবে। কাজেই যে কোন দিক দিয়েই বিচার করা যাক না কেন, মৃত্যুর পরে কোন জীবন আছে কিনা এ প্রশ্নের চূড়ান্ত মিমাংসা করতে আমরা বাধ্য। এ ব্যাপারে বিজ্ঞান আমাদের সাহায্য না করলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

এখন বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের জন্যে আমাদের কাছে কি কি উপকরণ আছে, তা-ই একটু বিচার করে দেখা যাক। আমাদের সামনে প্রথম উপকরণ হচ্ছে মানুষ আর দ্বিতীয় উপকরণ এ বিশ্বব্যবস্থা। আমরা মানুষকে এ বিশ্ব-ব্যবস্থার পটভূমিতে রেখে যাচাই করে দেখবো, মানুষ হিসেবে তার সমস্ত চাহিদা ও দাবি-দাওয়া কি এ ব্যবস্থাপনায় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, না কোন জিনিস অপূরণীয় থাকার ফলে তার জন্যে ভিন্নরূপ কোন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন? মানুষের দেহটির প্রতিই লক্ষ্য করে দেখুন—এটি বহু খনিজ দ্রব্য, লবণ, পানি এবং গ্যাসের সমষ্টি। এর পাশাপাশি বিশ্বজগতেও মাটি, পাথর, ধাতু, লবণ, গ্যাস, নদী এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস বর্তমান। এ জিনিসগুলোর নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করার জন্যে বিধানের প্রয়োজন। বিশ্বজগতের সর্বত্র তা ক্রিয়াশীল রয়েছে। সেই বিধান বাইরের পরিবেশে যেমন পাহাড়, নদী ও বাতাসকে নিজ নিজ কাজ সম্পাদনের সুযোগ দিচ্ছে, তেমনি মানব দেহও তার অধীনে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, মানুষের দেহ তার চারপাশের বস্তুনিচয় থেকে খাদ্য গ্রহণ করে বিকাশ বৃদ্ধি লাভ করছে। এ ধরনের নিয়ম বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ঘাস ইত্যাদি সৃষ্টি জগতেও বর্তমান এবং এখানেও বর্ধনশীল দেহধারীদের জন্যে প্রয়োজনীয় বিধানের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়ত, মানুষের দেহ একটি জীবন্ত সত্তা, যা নিজ ইচ্ছায়ই নড়াচড়া করে, নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করে, নিজের হেফাযতের দায়িত্ব নিজেই পালন করে এবং নিজের বংশ রক্ষার ব্যবস্থা নিজেই করে থাকে। সৃষ্টি জগতে

এ ধরনের আরো বহুবিধ জীবের অস্তিত্ব বর্তমান— জল স্থল ও বায়ুমণ্ডলে এরূপ অসংখ্য জীব-জন্তু লক্ষ্য করা যায়, যাদের গোটা জীবনের ওপর পরিব্যাপ্তি থাকার উপযোগী আইন-বিধানও এখানে পুরোপুরি ক্রিয়াশীল।

এ সবের ওপর মানুষের আর একটি সত্তা রয়েছে, যাকে আমরা নৈতিক সত্তা বলে অভিহিত করি। তার মধ্যে সৎকাজ ও দুষ্কৃতি করার অনুভূতি আছে। সৎকাজ ও দুষ্কৃতির পার্থক্য বোধ আছে। সৎকাজ ও দুষ্কৃতি করার শক্তি আছে। তার প্রকৃতি সৎকাজের ভালো ফল এবং দুষ্কৃতির মন্দ ফল প্রত্যাশা করে। যুলুম, ইনসাফ, সত্যবাদিতা, মিথ্যাচার, হক-নাহক, দয়াশীলতা, নিষ্ঠুরতা, কৃতজ্ঞতা, বদান্যতা, কৃপণতা, আমানতে খেয়ানত এবং এ ধরনের বিভিন্ন নৈতিক গুণের মধ্যে সে স্বভাবতই পার্থক্য করে থাকে। এ গুণসমূহ কার্যত তার জীবনে লক্ষ্য করা যায়। এগুলো কোন কাল্পনিক জিনিস নয়, বরং বাস্তবক্ষেত্রের মানবীয় সমাজ ও সভ্যতার ওপর এগুলো প্রভাবশীল হয়ে থাকে। কাজেই মানুষ স্বভাবগতভাবেই তার ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাকৃতিক ফলাফলের মতোই নৈতিক ফলা-ফল তীব্রভাবে প্রত্যাশা করে।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার প্রতি গভীরভাবে তাকিয়ে দেখুন এ ব্যবস্থাপনায় মানবীয় ক্রিয়াকর্মের নৈতিক ফলাফল কি পুরোপুরি প্রকাশ পেতে পারে ? আমি সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি, এখানে তার কোনই সম্ভাবনা নেই। কারণ অন্তত আমার জানামতে এখানে নৈতিক সত্তার অধিকারী অপর কোন জীবের অস্তিত্ব নেই। পরন্তু গোটা বিশ্বজগত প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে চালিত হচ্ছে। এর কোথাও নৈতিক বিধানকে ক্রিয়াশীল দেখা যায় না। এখানে রূপার ওজন এবং মূল্য দু-ই আছে, কিন্তু সত্যের ওজন বা মূল্য কোনটিই নেই। এখানে আমের বীজ থেকে হামেশা আম গাছই জন্মে ; কিন্তু সত্যের বীজ বপনকারীদের প্রতি কখনো পুষ্পবৃষ্টি আর কখনো (বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে) জুতা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। এখানে বস্তুগত উপাদানগুলোর জন্যে সুনির্দিষ্ট বিধান আছে, সেই বিধান অনুসারে হামেশা সুনির্দিষ্ট ফলাফল প্রকাশ পায়। কিন্তু নৈতিক উপাদানগুলোর জন্যে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই, সেগুলোর ক্রিয়াশীলতার ফলে হামেশা নির্দিষ্ট ফলাফলও প্রকাশ পায় না। প্রাকৃতিক বিধানের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যের ফলে এখানে কখনো নৈতিক ফলাফল প্রকাশই পেতে পারে না ; কখনো প্রকাশ পেলেও প্রাকৃতিক বিধান যতোটুকু অনুমতি দেয়, কেবল ততোটুকুই প্রকাশ পায়। বরং অনেক ক্ষেত্রে এরূপও দেখা যায় যে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কাজের একটি বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা থাকলেও প্রাকৃতিক বিধানের হস্তক্ষেপে ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ নিজেও তার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি বাঁধাধরা নিয়মে তার

ক্রিয়াকর্মের নৈতিক ফলাফল লাভের কিঞ্চিৎ প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা খুবই সীমিত এবং অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। একদিকে প্রাকৃতিক বিধান তাকে সীমিত ও ত্রুটিপূর্ণ করে রেখেছে, অপরদিকে মানুষের নিজস্ব দুর্বলতা এ ত্রুটিকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমি কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমার বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করতে চাই ; ধরুন এক ব্যক্তি যদি অন্য এক ব্যক্তির শত্রু হয় এবং তার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় তবে ঘরটি পুড়ে যাবে। এটা তার কাজের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ফল। এর নৈতিক ফল স্বরূপই সেই ব্যক্তির ততোখানি শাস্তি হওয়া উচিত, যতোখানি সে একটি পরিবারের ক্ষতি করেছে। কিন্তু এ ফল প্রকাশ পাওয়া কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে— যেমন অগ্নি সংযোগকারীর সন্ধান পাওয়া, তাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা, তার অপরাধ সাব্যস্ত হওয়া, আদালত কর্তৃক অগ্নিদগ্ধ পরিবার ও তার ভবিষ্যত বংশধরদের সঠিক ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা এবং ন্যায়পরতার সাথে অপরাধীকে ঠিক সেই পরিমাণ শাস্তিদান করা। এ শর্তগুলোর কো, একটি যদি পূর্ণ না হয়, তাহলে নৈতিক ফল হয় আদৌ প্রকাশ পাবে না, কিংবা তার খুব সামান্য অংশই প্রকাশিত হবে। আবার এমনো হতে পারে যে, নিজের শত্রুকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে সেই ব্যক্তি দুনিয়ায় পরম সুখে কালাতিপাত করতে থাকবে।

এর চেয়েও বড়ো রকমের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। কতিপয় ব্যক্তি নিজ জাতির ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে বসে এবং গোটা জাতি তাদের অঙ্গুলি সংকেতে চলতে থাকে। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে তারা লোকদের মধ্যে জাতিপূজার উৎকট মনোভাব এবং সাম্রাজ্যবাদী উন্মাদনার সঞ্চার করে। এভাবে তারা আশপাশের জাতিগুলোর সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসে, লক্ষ লক্ষ নিরীহ লোক হত্যা করে, দেশের পর দেশ ধ্বংস করে ফেলে কোটি কোটি মানুষকে অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপনে বাধ্য করে। তাদের এ কীর্তিকলাপ স্বভাবতই মানবেতিহাসে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে এবং সে প্রতিক্রিয়া পুরুষানুক্রমে —যুগের পর যুগ ধরে চলতে থাকবে। আপনি কি মনে করেন, এ কতিপয় ব্যক্তি যে মহা অপরাধ করেছে, তার যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত শাস্তি কখনো এ পার্থিব জীবনে পেতে পারে ? স্পষ্টতই বলা যায় তাদের দেহ থেকে যদি সমস্ত গোশত কেটে ফেলা হয়, কিংবা তাদেরকে জীবন্ত অবস্থায় জ্বালিয়ে দেয়া হয় অথবা মানুষের আয়ত্তাধীনে অপর কোন কঠিন শাস্তিও দেয়া হয়, তবু তারা কোটি কোটি মানুষ এবং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের যে পরিমাণ ক্ষতি সাধন করেছে, সে পরিমাণ শাস্তি তারা কখনও পেতে পারে না। কারণ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা যে প্রাকৃতিক বিধানের দ্বারা চালিত, তদনুসারে অপরাধ তুল্য শাস্তি পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়।

অনুরূপভাবে দুনিয়ার আদর্শ মহাপুরুষদের কথা বলা যেতে পারে। তাঁরা মানব জাতিকে সততা ও ন্যায়পরতা শিক্ষা দিয়েছেন এবং জীবন যাপনের জন্যে আলোকজ্জ্বল পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। তাঁদের অকৃপণ দানের ফলে অসংখ্য মানুষ পুরুষানুক্রমে—যুগের পর যুগ ধরে কল্যাণ লাভ করে আসছে এবং ভবিষ্যতে আরো কতকাল লাভ করবে, তার ইয়ত্তা নেই। এসব মহাপুরুষ কি এ দুনিয়ায় তাঁদের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল লাভ করতে পারবে? আপনি কি ধারণা করতে পারেন যে, বর্তমান প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে এক ব্যক্তি তার এমন কাজেরও প্রতিফল লাভ করতে পারে, যার প্রতিক্রিয়া তার মৃত্যুর পরও হাজার হাজার বছর ধরে অসংখ্য মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

আমি ওপরেই বলেছি যে, প্রথমত বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা যে বিধানের দ্বারা চালিত, তাতে মানবীয় ক্রিয়াকর্মের পূর্ণ নৈতিক ফল লাভ করার কোনই অবকাশ নেই। দ্বিতীয়ত এখানকার ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ যেসব কাজ করে থাকে, তার প্রতিক্রিয়া এতো সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী যে, তার পূর্ণ ফলাফল ভোগ করার জন্যে হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ বছর দীর্ঘ জীবনের প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে মানুষের পক্ষে এতো দীর্ঘ জীবন লাভ করা সম্ভবপর নয়। এর থেকে জানা গেলো যে, মানব সত্তায় মৃত্তিক, আঙ্গিক ও জৈবিক উপাদানগুলোর জন্যে বর্তমান প্রাকৃতিক জগত (Physical World) এবং তার প্রাকৃতিক বিধানগুলোই যথেষ্ট। কিন্তু তার নৈতিক উপাদানের জন্যে এ দুনিয়া একেবারেই অপর্যাপ্ত। তার জন্যে অন্য একটি বিশ্বব্যবস্থার প্রয়োজন, যেখানে নৈতিক বিধান হবে কর্তৃত্বশীল আইন (Governing Law) আর প্রাকৃতিক বিধান তার অধীনে থেকে শুধু সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। সেখানে জীবন সীমিত না হয়ে অসীম হবে এবং এখানে অপ্রকাশিত বা ভিন্ন রূপে প্রকাশিত সকল নৈতিক ফলাফলই সেখানে সঠিক ও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। সেখানে সোনা ও রূপার পরিবর্তে সৎকাজ ও সত্যতার ওজন ও মূল্য হবে। সেখানে আগুন কেবল তাকেই জ্বালাবে যে নৈতিক কারণে দগ্ধ হওয়ার উপযুক্ত। সেখানে সৎলোকেরা সুখ-শান্তি পাবে আর দুষ্কৃতিকারীরা দুঃখ-ভোগ করবে। বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রকৃতি স্বভাবতই এমনি একটি জগতব্যবস্থা দাবী করে।

এ ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে শুধু 'হওয়া উচিত' পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েই তার কাজ শেষ করে। এখন প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের কোন জগত আছে কিনা, এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান উভয়ই অসমর্থ। এ ব্যাপারে একমাত্র কুরআনই আমাদেরকে সাহায্য করে। তার ঘোষণা এই যে, তোমাদের বুদ্ধি ও প্রকৃতি যে জিনিসটি দাবী করে, মূলত হবেও ঠিক তা-ই। বর্তমান প্রাকৃতিক বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বব্যবস্থা

একদিন চূর্ণ করে ফেলা হবে এবং তারপর এক নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে আসমান, জমীন এবং তার মধ্যকার বস্তুনিচয় এক ভিন্ন রূপ ধারণ করবে। অতপর সৃষ্টির আদিকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় যারা এসেছে, তাদের সবাইকে আল্লাহ তায়ালা পুনর্জীবিত করবেন এবং এক সাথে সবাই তাঁর সামনে উপস্থিত হবে। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক জাতি এবং গোটা মানব গোষ্ঠীর কর্মের রেকর্ড নির্ভুল ও নিখুঁত অবস্থায় সুরক্ষিত থাকবে। এ দুনিয়ায় প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি কাজের যতখানি প্রতিক্রিয়া হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ সেখানে মওজুদ থাকবে। এ প্রতিক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মানব গোষ্ঠীই সাক্ষীর কাঠগড়ায় উপস্থিত থাকবে। যেসব অণু-পরমাণুর ওপর মানুষের কথা ও কাজের ছাপ পড়েছে, তারাও নিজ নিজ কাহিনী পেশ করবে। খোদ মানুষের হাত-পা, চোখ-কান, জিহ্বা এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদেরকে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছিলো তার সাক্ষ্যদান করবে। অতপর সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক এসব কার্যবিবরণীর ভিত্তিতে কে কতোটা পুরস্কার আর কতোটা শাস্তির উপযুক্ত পূর্ণ ন্যায়পরতার সাথে তা ঘোষণা করবেন। এ পুরস্কার বা শাস্তির পরিধি এতো ব্যাপকতর হবে যে, বর্তমান জগতের সীমিত মাপকাঠির ভিত্তিতে তা অনুধাবন করাও অসম্ভব। সেখানে সময় ও স্থানের মাপকাঠি ভিন্নরূপ এবং প্রাকৃতিক বিধানও অন্য রকম হবে। মানুষের যেসব সৎকাজের প্রতিক্রিয়া দুনিয়ায় হাজার হাজার বছর ধরে চলছে, সেখানে তার পুরোপুরি প্রতিফল লাভ করা যাবে। মৃত্যু, ব্যাধি, বার্ধক্য তার সুখ-শান্তিতে কিছুমাত্র ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তার যে দুষ্কৃতির প্রতিক্রিয়া দুনিয়ায় হাজার হাজার বছর ধরে অসংখ্য মানুষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তার পূর্ণ শাস্তিও ভোগ করতে হবে। মৃত্যু বা অজ্ঞানতা এসে সে শাস্তি থেকে তাকে বাঁচাতে পারবে না।

এমন একটি জীবন ও জগতকে যারা অসম্ভব মনে করে, তাদের মানসিক সংকীর্ণতার জন্যে আমার অনুকম্পা হয়। আমাদের বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা যদি বর্তমান প্রাকৃতিক বিধান সহ বিদ্যমান থাকতে পারে, তাহলে অন্য একটি বিশ্বব্যবস্থা অপর কোন প্রাকৃতিক বিধান সহ কেন বর্তমান থাকতে পারবে না। অবশ্য এরূপ জগতের সম্ভাবনা কোন বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করা চলে না। এর জন্যে ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যে বিশ্বাসের একান্তই প্রয়োজন।

সমাপ্ত